মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১ - ১৯০৭) ঃ তাঁর ইসলাম সেবা ও সমাজ চিন্তা

আলো আরজুমান বানু
রেজি ঃ ৫৪৮/১৯৯৬-'৯৭

Dhaka University Library
400411

400411

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারী ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

DR. MOHAMMAD IBRAHIM
B.A. (Hons), LL.B., M.A. (D.U.)
M.Phil., & Ph.D. (Aligarh, U.P., India)
Professor
DEPARTMENT OF ISLAMIC HISTORY & CULTURE
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Ph. : 9661920-59, PABX-4371
E-mail : is hist@du.bangla.net.

DATE : ....

প্রত্যয়ন পত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, 'মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭)ঃ তাঁর ইসলাম সেবা ও সমাজ চিন্তা' শীর্ষক ' অভিসন্দর্ভটি গবেষক আলো আরজুমান বানুর মৌলিক রচনা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম. ফিল. ডিগ্রী অর্জনের আবশ্যিক শর্তাবলীর আংশিক পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য এটি প্রণীত হয়েছে। আমি এই অভিসন্দর্ভের প্রস্তুতি প্রক্রিয়া পূর্বাপর তদারক করেছি এবং এখন এটি কর্তৃপক্ষ সমীপে জমাদান করার অনুমতি দিলাম।

অভিসন্দর্ভটি এখন পরীক্ষকবৃন্দের বিবেচনার জন্য প্রেরণের আবশ্যকীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ জ্ঞাপন করছি।

১৮.০১.২০০২ ইংরেজী

(ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম)
প্রোফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
তত্ত্বাবধায়ক

400411

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মহান স্রষ্টার যাঁর অশেষ রহমতে আমার এই অভিসন্দর্ভ রচনা সম্ভব হয়েছে। আমার এই অভিসন্দর্ভ রচনায় সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করেছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম। গবেষণার বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে গবেষণাকর্ম সম্পাদনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, মূল্যবান উপদেশ, ব্যক্তিগত পুস্তাকাদি ব্যাবহারের সুযোগদান এবং তদুপরি যে ভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন -তার তুলনা বিরল। তাঁর এই সহানুভূতি ও স্নেহঋন শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই শেষ হওয়ার নয়।

400411

আমার এম. ফিল. অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও আর যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা এবং উপদেশ পেয়েছি- তাঁরা হলেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. হাবিবা খাতুন, প্রফেসর এ.কে.এম.ইদ্রিস আলী, প্রফেসর মুসা আনসারী, প্রফেসর মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, জনাব মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, বাংলা বিভাগের প্রফেসর আবুল কাশেম ফজলুল হক। তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা। প্রসঙ্গক্রমে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার কোর্স শিক্ষক মরহুম প্রফেসর পারেশ ইসলাম সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমানকে। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আমার বাবা জনাব মোহাম্মদ আলী -যাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া, আমার মা মাহমুদা মমতাজ রহমানী -বাস্তবের কঠোর মানুষ এবং আমার মামা, অধ্যাপক নাজমুল হক রহমানী - আমার অনুপ্রেরণা স্থল, তাঁদের সবার সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বোরহান -আমার ছোট ভাই যার সাহায্য আমাকে উৎসাহিত করেছে। তাছাড়া খোরশেদ ভাই, আসাদভাই, লতা, কান্তা, শান্তা ও সালমার উৎসাহ ও সহযোগিতা আমাকে সাহস যুগিয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ।

এ গবেষণা কর্মের সূচনা পর্বে বন্ধু নাসির, আসাদুজ্জামান খান মজলিশ ও জাহিদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সহকারী লাইব্রেরিয়ান ময়েজ ভাই দুলর্ভ পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন। তাঁর এ সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। বাংলা একাডেমীর গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোবারক হোসেন, এবং প্রকাশনা বিভাগের কর্মকর্তা জনাব আবু সুফিয়ান একাডেমীর গ্রন্থগার ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁদের প্রতিও রইল কৃতজ্ঞতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার ও সহকারী প্রক্টর (কলা অনুষদ) জনাব মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান -এর সাহায্য ব্যতীত আমার এই অভিসন্দর্ভ রচনা হত দুরূহ্ ও কষ্টসাধ্য। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাত্রা এমনই যে, কৃতজ্ঞতা শব্দটি সেখানে আমার অনুভূতির প্রকাশের নিতান্তই অনুপযুক্ত। অথচ এর বিকল্প শব্দও আমার জানা নাই।

'ছামিন' আমাদের একমাত্র সন্তান। অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য অনেক সময়ই মার্তৃ-স্নেহ থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। ওর জন্য শুভ কামনা।

এ সুযোগে বিভাগীয় প্রধান সহকারী কবির ভাইয়ের সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সবশেষে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সতর্কতার সাথে অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য ব্যবসায় গবেষণা ব্যুরোর জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের জনাব মোঃ ছরোয়ার হোসেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশ শতকের সূচনাপর্বে বাঙালী মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের অধঃপতন ও অবক্ষয় রোধে যে সব ক্ষনজন্মা ব্যক্তিবর্গ সক্রিয়, আন্তরিক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭) ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব। বাংলার মুসলিম জাগরণের উন্মেষপর্বে তাঁর কর্মকান্ডের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।উল্লেখ্য যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র আর্বিভাবকাল ছিল বাঙালী মুসলমানদের ধমীয়, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক অধঃপতনের যুগ। বৃটিশ উপনিবেশ, দেশের পরাধীনতা, সর্বোপরি জাতীয় জীবনের গ্লানি নানাভাবে বাঙালী মুসলমানদের পরিবদ্ধ করে। বৃটিশদের আগ্রাসী তৎপরতায় বাংলা তথা উপমহাদেশের মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী সংস্কৃতি নানাভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। ইংরেজদের বিভেদ নীতির চক্রান্তে নিস্পেষিত হয়ে মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। অশিক্ষার অন্ধকার ও নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ ধ্বংসের দ্বারদেশে উপনীত হয়।বাংলার মুসলমানদের এরূপ বিপর্যয়কালে এখানে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম সমাজের অশিক্ষা, দারিদ্র ও অসহায়ত্বের সুযোগে তাঁরা মুসলমানদের ধর্মন্তরীতকরণের চেষ্টা করে।

বাঙালী মুসলিম সমাজের এমনি এক যুগসন্ধিক্ষনে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্র আর্বিভাব। তিনি ছিলেন একাধারে একজন ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক। ইসলাম ধর্মের, প্রচার এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ও এর মর্যাদা সংরক্ষণ এবং মুসলিম সমাজের কল্যান কামনা ইত্যাদি ছিল তাঁর জীবনব্রত। এ ব্রত সাধনে তাঁকে এক প্রবল প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হয়। এজন্য তিনি নিমিত্ত হিসাবে বাংলার গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দরে ধর্মীয় ও সামাজিক সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করেন। প্রতিপক্ষের সাথে বাহাস বা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সাংগঠনিক উদ্যোগ-আয়োজনে অংশ নেন এবং সর্বোপরি সাহিত্য চর্চা তথা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও সাময়িকপত্র আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ জন্মগতভাবেই ছিলেন বিপুল মেধা সম্পন্ন। তাঁর শাণিত বুদ্ধি, অকাট্য যুক্তি, বাগ্মীতার ওজস্বিতা, প্রচারনার ব্যাপকতা, লেখনীর তীক্ষ্নতায় খ্রীষ্টান শক্তিসহ তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিপক্ষ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তাঁদের কাছে তিনি আতঙ্কে পরিণত হন। অন্যদিকে সমকালীন মুসলিম সমাজে তিনি গৃহীত হন 'ত্রাণকর্তা' 'হিতৈষী বন্ধু' এবং জাগরনের অগ্রদূত হিসাবে। কেননা তাঁর কর্ম প্রচেষ্টাই সে সময় বাংলায় প্রবল পরাক্রান্ত খ্রীষ্টানপাদ্রীদের অপতৎপরতার হাত থেকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজকে রক্ষা করে। প্রায় বিধ্বস্ত হতাশাগ্রস্থ মুসলিম সমাজ নব-প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়; নবজীবন লাভ করে।

সমকালে সমগ্র বাংলা এমনকি আসাম ও কুচবিহারে মুন্সীর কর্মকান্ড ও চিন্তাধারা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এমন একজন কৃতি ও অসাধারণ কর্মী-পুরুষ উত্তরকালে বিশেষকরে বর্তমান সময়ে প্রায় বিস্মৃত একটি নামে পরিণত হয়েছেন। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর কর্মকান্ড এমনকি পরিচিতি অজ্ঞাত। এর কারণ তাঁর সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার অভাব। তাঁর নামে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন এবং কিছু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামকরণ করা হলেও বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌছে দেবার মত তেমন কোন বই-পুস্তক রচিত হয়নি। কোন পাঠ্যপুস্তকেও তাঁর জীবনী স্থান পায়নি। সাম্প্রতিক কালে তাঁর উপর কিছু বই পুস্তক রচিত হলেও এ বিষয়ে কোন মৌলিক গবেষণা কর্ম হয়নি। এমতাবস্থায় আমি বাংলায় ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজ জীবনের ক্রান্তিকালে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনকারী এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনাদর্শ ও দীপ্তিময় কর্মসাধনার বস্তুনিষ্ঠ ও গবেষণা ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রয়াসে আগ্রহী হই।

'মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭)ঃ তাঁর ইসলাম সেবা ও সমাজ চিন্তা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনায় মূখ্য উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মুন্সীর উপর রচিত জীবনী গ্রন্থসমূহ। উল্লেখ্য যে, মুন্সীর মৃত্যুর পর কিছু সময়ের ব্যবধানে তাঁর দুটি জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছিল। এর একটি রচনা করেন মুন্সীর প্রধানতম সহচর মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন (মেহের চরিত , কলিকাতা, ১৩১৫) এবং অন্যটি আছিরউদ্দীন প্রধানের রচনা। (মেহেরউল্লাহর জীবনী, জলপাইগুড়ি,১৯০৯) তৃতীয় আরেকটি জীবনালেখ্য রচিত হয় বেশ কিছুকাল পরে (১৯৩৪)। 'কর্ম্মবীর মুন্শী মেহেরুল্লাহ্' শিরোনামের এ গ্রন্থটির রচয়িতা শেখ হবিবর রহমান। শেষোক্ত বইটির অনেক খানি বিষয়বস্তু 'মেহের-

Dhaka University Institutional Repository

চরিত' থেকে নেওয়া। বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনায় বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়েছে 'কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌' 'মেহের-চরিত' 'মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী', (শেখ জমিরুদ্দীন) ইত্যাদি গ্রন্থের। অনেক চেষ্টা করেও আছিরউদ্দীন প্রধান রচিত জীবনীগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

মুহম্মদ আবু তালিব রচিত 'মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ঃ দেশ, কাল, সমাজ 'মুস্তাফা নূরউল ইসলাম রচিত 'মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌' এবং মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী প্রণীত 'মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌' প্রভৃতি গ্রন্থাদিও উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারা ও জীবনদর্শন বিশ্লেষণে তাঁর নিজের রচনা সমূহের উপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

মুন্সীর বক্তৃতাসমূহের পূর্নাঙ্গ লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। অথচ এগুলো তাঁর মূল্যায়নে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ন। এক্ষেত্রে বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনায় বিভিন্ন লেখকের বর্ণিত বিচ্ছিন্ন বিবরণী সমূহ বিচার বিশেষণ করে প্রাসঙ্গিকক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া মুন্সীর উপর প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রচনা ও সাময়িক এবং দৈনিক পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ নিবন্ধাদিও ব্যবহার করা হয়েছে।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ সম্পর্কে জানার জন্য আমরা যশোহর এ তাঁর নিজের এলাকায় গিয়েছি। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলে গবেষণা কর্মের সহায়ক নতুন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ	মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র পরিচয়	১ - ১৪
	১.১ প্রাথমিক জীবন, শৈশব ও শিক্ষা-দীক্ষা	১
	১.২ কর্ম জীবন, পেশা ও মৃত্যু	৫
দ্বিতীয়অধ্যায় ঃ	মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র উত্থানের পটভূমি	১৫-৩২
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারা	৩৩-৫২
	৩.১ ইসলামের শাশ্বত বিধানের প্রতি আনুগত্য	৩৩
	৩.২ খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রচারক মন্ডলীর কার্যক্রম ও মুন্সীর বিদ্রোহী সত্বা	৩৫
	৩.৩ হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির কবলে মুসলিম সমাজ ও মুন্সীর প্রতিক্রিয়া	৪৪
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন	৫৩-১০৪
	৪.১ সাংগঠনিক উদ্যোগ	
	৩.২ ইসলাম প্রচার কার্যক্রম	৭০
	ক) ধর্ম সভায় বক্তৃতা প্রদান	৭০
	খ) বিধর্মীদের সাথে তর্ক-যুদ্ধ	৮৪
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সাহিত্য সাধনা ও এর মূলদর্শন	১০৫-১৭০
	৫.১ মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র রচনার প্রকৃত সংখ্যা	১০৭
	৫.২ মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র রচিত পুস্তক-পুস্তিকার পরিচিতি, বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ন	১১৪
	৫.৩ সাময়িক পত্র ও সাহিত্য সেবীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান	১৪৯
	৫.৪ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা	

Dhaka University Institutional Repository

			পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারার সমকালীন প্রতিক্রিয়া	১৭০-১৮৩
		৬.১ অনুকুল সাড়া ও এর ব্যাপকতা	১৭০
		৬.২ প্রতিরোধ প্রয়াস	১৭৭
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	উপসংহার	১৮৪-১৮৯
পরিশিষ্ট – ১	ঃ	মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র বংশ তালিকা	১৯০
পরিশিষ্ট – ২	ঃ	মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনপঞ্জী	১৯২
পরিশিষ্ট – ৩	ঃ	মেহেরুল্লাহ্‌র হস্তাক্ষরের নমুনা ও চিত্রে মেহেরুল্লাহ্‌র স্মৃতি	১৯৬
পরিশিষ্ট – ৪	ঃ	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী	২০৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর পরিচয়

১.১ প্রাথমিক জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা

যশোর জেলার অর্ন্তগত কালিগঞ্জ থানার বড়বাজারের নিকটবর্তী ঘোপ একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এ গ্রামের মাতুলালয়ে ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ (১৮৬১ খৃষ্টব্দ ২৬শে ডিসেম্বর) সোমবার দিবাগত রাতে মুন্সী মোহম্মদ মেহেরুল্লাহর[১] জন্ম।[২] তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ওয়ারেসউদ্দীন। কোথাও তাঁকে ওয়ারেস আলী নামেও অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর মাতার নাম সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এমনকি মোহাম্মদ মোহসেন কর্তৃক লিখিত আত্মজীবনী পশ্চাতের পথ এর পান্ডুলিপিতেও এর উল্লেখ নেই। তিনি পিতামাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তবে তাঁর বোনের সংখ্যা ছিল তিন।

মেহেরুল্লাহর পিতা ওয়ারেসউদ্দীন ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ পরহেজগার ব্যক্তি। মোহাম্মদ মোহসেনের ভাষায়, ওয়ারেস আলী ছিলেন ধর্মভীরু। তাঁর শারিরীক শক্তি ও সাহস ছিল অতুলনীয়। তিনি ভ্রমনবিলাসী স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তবে তার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না।[৩] মেহেরুল্লাহর পূর্বপূরুষগণ সম্ভবত পাঠান বংশদ্ভুত ছিলেন। মেহেরুল্লাহর জীবনীকার শেখ জমিরুদ্দীন মেহেরুল্লাহর পূর্বপুরুষ মনুখাঁ কে পাঠান বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] মোহাম্মদ মোহসেনের আত্মজীবনীতে অবশ্য পাঠান বংশদ্ভুত হওয়ার কথাটি উল্লেখ নেই। যদিও তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের পরিচিতি প্রসঙ্গে আত্মজীবনী গ্রন্থের পান্ডুলিপিতে একাধিক বংশ তালিকা প্রদান করেছেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

এসব বংশ তালিকায় উল্লেখিত মুনায়েম খাঁ ওরফে মনুখাঁ সম্ভবত প্রথম ছাতিয়ানতলা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এ গ্রামটি যশোর ঝিনাইদা প্রাচীন রেলরাস্তার পাশে চুড়ামনকাঠি নামক রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান সরকার এর নামকরণ করেন মেহেরুল্লানগর।[৫] বর্তমানে

Dhaka University Institutional Repository

এটি এ নামেই পরিচিত। পূর্বে এ গ্রামটি চুঁচড়া রাজ এস্টেটের অর্ন্তভূক্ত ছিল। শেখ জমিরুদ্দীনের বিবরণ অনুযায়ী,

> "মুন্শী সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, এখন যে স্থানে ছাতিয়ানতলা নামক পল্লী বর্তমান পূর্বে উহা জনশূণ্য ছিল। একটি ছাতিয়ান বৃক্ষ ব্যতীত তথায় আর কিছুই নয়ন গোচর হইত না। মুন্শী সাহেবের পূর্বপুরুষ খাঁ উপাধি ধারী কোন পাঠান সর্ব্বপ্রথমে গৃহ নির্মাণ করিয়া এই স্থানে বসবাস করেন। ক্রমে ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে হইতে উহা একটি গন্ডগ্রামে পরিনত হইয়াছে।"[৬]

গ্রামটির প্রথম বাসিন্দা মনুখাঁর আদি নিবাস কোথায় ছিল তা জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে, মোঘল আমলের শেষ দিকে তিনি বগেয়া নামক স্থান হতে এসে ছাতিয়ানতলা গ্রামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে বগেয়া কোথায় সে সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। ধারণা করা হয় যে, এটি পশ্চিম দেশস্থ কোন শহর বা জনপদের নামের অপভ্রংশ।[৭] মনুখাঁর বংশধরেরা তরফদার, সর্দ্দার, দফাদার ও বিশ্বাস এ চারটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোহাম্মদ মোহসেন উল্লেখিত বংশ তালিকা মতে, মেহেরুল্লাহ্‌র পিতা ওয়ারেস উদ্দীন ছিলেন দফাদার বংশের।

মেহেরুল্লাহর শৈশব জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে শেখ হাবিবর রহমান ও শেখ জমিরুদ্দীনের প্রদত্ত বিবরণী মতে, বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল প্রবল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তিনি জীবনে উচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি। পাঁচ বছর বয়সে হিন্দু পাঠশালায় ভর্তির মাধ্যমে তার বাংলা লেখাপড়ার সূত্রপাত হয়। বলা প্রয়োজন যে, সে সময় মুসলমানদের ছেলে মেয়ের জন্য কোন বিশেষ বিদ্যালয় না থাকায় ওয়ারেসউদ্দীন তাঁর পুত্রকে হিন্দু পাঠশালায় ভর্তি করেন। মেহেরুল্লাহ্‌ ছিলেন প্রখর মেধা ও ধী-শক্তির অধিকারী। ফলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করতে সক্ষম হন। পাঠশালায় তাঁর তৃতীয় পাঠ্যপুস্তক ছিল 'বোধদয়'। উল্লেখ্য যে, বোধদয় ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত একটি সাহিত্য পুস্তক। এটি পাঠশালায় নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল।[৮] পুত্রের এ আশাতীত কৃতিত্বে তাঁর পিতা অতিশয় আনন্দিত হন। তবে মেহেরুল্লাহর পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের মতে, দুটি কারণে মেহেরুল্লাহর

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন বাধাগ্রস্থ হয় (ক) দারিদ্র বা আর্থিক অনটন। (খ) পিতার আকস্মিক মৃত্যু। বোধদয় পাঠ কালেই তাঁর পিতার মুত্যু হয়।

পিতা ওয়ারেস উদ্দীন মৃত্যুর পর মেহেরুল্লাহর বিধবা মা নাবালক পুত্র-কন্যাদের নিয়ে নিতান্তই অর্থকষ্টে নিপতিত হন। তবে তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিদ্যানুরাগিনী আর্দশ মহিলা। মায়ের প্রভাব পুত্রকে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর মহাজনের ঋণ ও সংসারের অভাব অনটন সত্ত্বেও তিনি পুত্রের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে মেহেরুল্লাহ্ তাঁর মায়ের এ প্রয়াসের কথা উল্লেখ করে বলেছেন - " আমি আমার মায়ের যত্ন ও চেষ্টাতে যাহা কিছু শিখিয়াছি।"[৯] আর্থিকভাবে স্বচ্ছল মামাদের কাছ থেকেও এ ব্যাপারে তিনি সহায়তা পেয়েছিলেন।

অর্থাভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বাধাগ্রস্থ হলেও মায়ের প্রেরণা ও উৎসাহ এবং নিজের জ্ঞান - তৃষ্ণার দুর্দ্দম তাড়না মেহেরুল্লাহকে পুণরায় বিদ্যার্জনে আগ্রহী করে। তাঁর বয়স যখন ১৩/১৪ বছর তখন তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং প্রায় ছয় বছর পর গৃহে অবস্হান করেন। তাঁর জীবনের এ পর্বটি ভাষা শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে ব্যয়িত হয়। এ সময় তিনি প্রথমে কয়ালখালীর মৌলভী মোহসাবউদ্দীন এবং পরে করচিয়ার মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের সহচার্যে থেকে আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষা শিখেন। তাঁর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলে তিনি উপরোক্ত তিনটি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী ও নানা ঘটনা থেকে এ ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু ভাষা শিক্ষাই নয় ফরাসী কাব্য সাহিত্যের সাথেও এ সময়ে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ স্হাপিত হয়েছিল। পূর্বোক্ত শিক্ষকদ্বয়ের তত্বাবধানে মেহেরুল্লাহ্ বিশ্ববরণ্য কবি শেখ সাদীর 'পান্দনামা' ও 'গুলিস্তা' - বুস্তার উপর পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। শেখ হবিবর রহমানের বর্ননামতে, শেখ সাদীর 'পান্দেনাম' ও 'গুলিস্তা'- 'বুস্তার' মেহেরুল্লাহ্ জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি বক্তৃতার সময় প্রায়ই এ সমস্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে শ্রোতামন্ডলীকে মুগ্ধ করতেন।[১০] উল্লেখ্য যে, প্রবাস জীবনে মেহেরুল্লাহর আরবী ভাষাচর্চার মাধ্যমে গভীরভাবে কোরআন শরীফ অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন ইসলাম প্রচার ও ধর্ম-সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন তখন কিশোর জীবনের এ শিক্ষা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উর্দু ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন, মেহেরুল্লাহর জীবনের গতিপথকে বিশেষভাবে প্রসারিত করে। কেননা এর ফলে উর্দুভাষায় রচিত ইসলাম ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। এ যোগাযোগ তাঁর মানস পরিপুষ্টিতে যথেষ্ট পরিমাণ সহায়তা করে। শেখ হবিবর রহমানের ভাষায়,"ইসলামী জাতীয়তাপূর্ণ উর্দু সাহিত্য তাঁহাকে নতুন প্রাণে, নতুন শক্তিতে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিল।"[১১]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ অল্প বয়সেই কর্মজীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। পরিবারের অভাব অনটন তাঁকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্মজীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য করে। তবে রূঢ় সংসার বাস্তবতার কারণে জীবিকা উপাজর্নের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও মেহেরুল্লাহ্ শিক্ষার্জন ও জ্ঞানচর্চা থেকে নিজেকে বিরত রাখেননি। খোজারহাটে দর্জীর দোকানে শিক্ষানবিশীকালে তিনি জনৈক তাজ মাহমূদের কাছে অবসর সময়ে মনোযোগ সহকারে উর্দু ও ফারসী সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করতেন। খড়কীতে কাজ করার সময় তিনি বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা সাহিত্যচর্চায় বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর বাংলা ভাষার ভিত্তি মজবুত হয়।

কর্মপোলক্ষ্যে মেহেরুল্লাহ্ একবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন। মেহেরুল্লাহর জীবনীকারদের ভাষ্য মতে, দার্জিলিং-এ অবস্থানকালে তিনি মহীসুর থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মনসুরে মোহাম্মদীর' গ্রাহক হয়েছিলেন। ইতোমধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে রচিত কয়েকখানি উর্দু পুস্তকও তিনি সংগ্রহ করেন। উর্দুতে রচিত 'তোহফাতুল মুকতাদি' গ্রন্থ পাঠ করে বিদেশী ধর্মসমূহের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে মেহেরুল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত হন। ইসলাম সম্পর্কে সোলায়মান ওয়ার্সীর লেখা 'কেন আমি পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম' এবং 'প্রকৃত সত্য কোথায়' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ তাঁর জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে। এতদ্ব্যতীত তিনি বেদ, গীতা, উপনিষদ, ত্রিপিটক, বাইবেল ইত্যাদি গ্রন্থ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পাঠ করেন।

এইভাবে বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করার ফলে একদিকে যেমন ইসলামের সত্যতা, সৌন্দর্য ও আর্দশ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা এবং বিশ্বাস তাঁর অন্তরাশ্রয়ী হয়, অপরদিকে তেমনি তিনি উপলব্ধি করেন যে, অন্যান্য ধর্মসমূহ যুক্তিহীন, সে সকল ধর্মের ভিত্তি দুর্বল।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষকরে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার তাঁর মনে প্রতিকুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে শেখ হবিবর রহমানের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য

> "এই সমস্ত পুস্তক ও পত্রিকা পাঠে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়গগণ হইতে ইসলাম সম্বন্ধে সন্দেহের সমস্ত কুহেলিকা অরুনোদয়ে তিমির-পটলের মত বিদূরিত হইয়া গেল; নূতন স্বর্গীয় আলোকে তাঁহার অন্তর জগত আলোকিত হইয়া উঠিল। ইসলামের নূতন তেজে, নূতন শক্তিতে দিন দিন পূর্ণ হইয়া মেহেরুল্লাহ্ জন সমাজে দীপ্ত মিহিরের ন্যায়ই প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। পরশমনির মঙ্গল স্পর্শে লৌহ স্বর্নে পরিণত হইল, ইসলামের দীপ্ত প্রভাবে সেই দর্জী মেহেরুল্লাহ্ বঙ্গবিখ্যাত বগ্মীকুলতিলক, অদ্বিতীয় সমাজ সংস্কারক মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্য় পরিণত হইলেন।"[১২]

১.২ কর্মজীবন, পেশা ও মৃত্যুঃ

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র ছাত্রজীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আর্থিক অনটন ও পিতার অকাল মৃত্যুজনিত কারণে বোধদয়-এর মাধ্যমেই মেহেরুল্লাহ্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্ত হয়। অবশ্য পরে মাতা ও মামাদের উৎসাহে তিনি সমকালীন মুসলিম ঐতিহ্য অনুসারে পবিত্র কোরআন শরীফ, আরবী, ফার্সী ও উর্দূভাষা এবং সামান্য ফারসী পুঁথিপত্র পড়ার সুযোগ পান। এর পরই দারিদ্রের চাপে ও জীবন জীবিকার তাগিদে নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। তখন তাঁর বয়েস ছিল উনিশ বা বিশ। মেহেরুল্লাহ্র প্রথম কর্মস্থল ছিল যশোর জেলাবোর্ড। ১৮৮১ সালে এখানে তিনি সামান্য করণিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। অবশ্য তাঁর পক্ষে এ চাকুরিটি বেশীদিন বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। তিনি ছিলেন বৈশিষ্ট্যগতভাবে স্বাধীনচেতা। তাই কর্মক্ষেত্রে নিয়মের বাধ্যবাধকতা ছিল তাঁর কাছে একেবারেই অসহনীয়। এজন্য তিনি স্বেচ্ছায় চাকুরীতে ইস্তফা দেন।

সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে মেহেরুল্লাহ্ স্বাধীন দর্জী পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সে সময় দর্জী পেশা ছিল বাঙালী মুসলমানদের একচেটিয়া কাজ। মেহেরুল্লাহ্ তাঁর আত্মীয় জনৈক আজগর মিঞার পরামর্শে খোজারহাটে যান এবং সেখানে একজন দর্জীর নবীশ হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর তিনি পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে খড়কীগ্রামের নানোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

দর্জী জাঁহা বখ্শ মির্জার কাছে উন্নত সেলাইয়ের কাজ শিখেন। জাঁহা বখ্শ ছিলেন জনৈক ইংরেজ সাহেব কর্মচারীর পারিবারিক দর্জী। এখানে কাজ করার সূত্রে মেহেরুল্লাহ্ স্থানীয় ইংরেজ মহলেও বিশেষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। কিছু দিনের মধ্যে তিনি এক সাহেব বাড়ীতে দর্জী নিযুক্ত হন এবং পাঁচ/ছয় বছর সেখানে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। দর্জী পেশায় মেহেরুল্লাহ্ অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অল্প দিনের মধ্যে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যন্ত তাঁর গ্রাহকে পরিণত হয়। জনৈক ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর প্রতি এমনই আকৃষ্ট হন যে, তিনি যশোর থেকে বদলী হয়ে দার্জিলিং যাবার সময় মেহেরুল্লাহ্কে তাঁর সাথে সেখানে গিয়ে দোকান খোলার জন্য বলেন। তিনি এতে সম্মত হন এবং দার্জিলিং গিয়ে দোকান খোলেন। কিন্তু তিনি সেখানে বেশী দিন থাকতে পারেননি। দার্জিলিং এর আবহাওয়া তাঁর শরীরের অনুকুল না হওয়ায় তিনি যশোরে ফিরে পূনরায় দর্জীর কাজ শুরু করেন।

মেহেরুল্লাহ্ যখন যশোরে দর্জীর দোকান খোলেন সেই সময় যশোর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। মিশনারীরা বুকলেট, লিফলেট প্রচার ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে সরলমনা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেবার চেষ্টা চালায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও তাদের কূটজালে আবদ্ধ হয়। দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। তরুন মেহেরুল্লাহ্র মনেও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে দুর্বলতা জন্মে। শেখ জমিরুদ্দীন লিখেছেন, "পাদ্রী আনন্দবাবুর প্রচার শুনিয়া বাইবেল ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে তাঁহার অবিশ্বাস ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা জন্মে।"[১৩] মেহেরুল্লাহ্ নিজেও বলেছেন যে, সমকালীন পাদ্রী আনন্দবাবু ও তাঁর শিষ্যদের সম্মোহনী বক্তৃতার দ্বারা তিনি এক সময় মোহিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য একরকম প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। শুধুমাত্র অবগাহিত হওয়া বাকী ছিল।[১৪] ঠিক এ সময় হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ রচিত 'খ্রীষ্টান ধর্মের অসারতা' এবং বাবু ইশানচন্দ্র ওরফে মৌলভী এহসানউল্লাহ রচিত 'ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর খবর আছে' শীর্ষক দুটি পুস্তিকা তাঁর জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দেয়। পুস্তক দুটি পাঠে মিশনারী সমাজের ধর্ম গ্রহণ দূরে থাক, তিনি মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচার ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কূটিল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ইসলাম ধর্মকে সুদৃঢ়করনে মেহেরুল্লাহ্ ত্রিবিদ কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেন। এগুলো হলো ক) বক্তৃতা এবং ওয়াজ নসিহত খ) লেখনী গ) সাংগঠনিক তৎপরতা। পরবর্তী অধ্যায় সমুহে এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মেহেরুল্লাহ্ মিশনারীদের বিরুদ্ধে প্রথম বক্তৃতা শুরু করেন তাঁর দোকানের সামনে দাড়টানা মোড়ে দাড়িয়ে। এতে তিনি আশাতীত সাফল্য লাভ করেন। দ্রুত তিনি মানুষের কাছে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ বাগ্মী মেহেরুল্লাহ্ এবং ইসলাম প্রচারক মেহেরুল্লাহ্ নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। ক্রমান্বয়ে জনঢলে পূর্ণ হতে থাকে তাঁর বক্তৃতার আসর।[১৫] শুধু দাড়টানা আর যশোর শহরেই নয় এরপর তিনি সারাদেশের গ্রামে গঞ্জে সভা করতে থাকেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৪ ও ২৫শে বৈশাখ রংপুরে দরাজগঞ্জে একইদিনে তিনটি সভা করে জ্বরে আক্তান্ত হয়ে পড়েন। ২৮শে বৈশাখে নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ২৪শে জ্যৈষ্ঠ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন মেহেরুল্লাহ্র রোগাক্রান্ত হওয়া এবং তার মৃত্যুর ঘটনা করুণ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়,

> "তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ আমি তাঁকে দেখিবার জন্য ছাতিয়ানতলায় গমন করি। যাইয়া দেখি তাঁহার সে শরীর আর নাই; কেবল অস্থিমাত্র শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমি নিকটে আচ্ছালাম আলায়কোম করিলাম। ইহার উত্তরে তিনি অলায়কুম আসালাম কহিলেন। পরে আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ডাক্তার কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া আমিও আর কোন কথা বলিলাম না। পরে আমি তাঁহার জন্য কলিকাতায় মসুলিম ডাক্তার আনিতে গমন করি। কিন্ত ডাক্তার কি করিবেন? রোগের ঔষধ আছে, কিন্তু মৃত্যুর যে ঔষধ নাই। মুন্শী সাহেব গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা ১টার সময় স্বীয় পরিবার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।"[১৬]

আবু তালিব তাঁর মৃত্যুর তারিখ হিসেবে ২৬শে জ্যৈষ্ঠ/৭জুন তারিখে উল্লেখ করেছেন।[১৭] আবু তালিবের গ্রন্থে পরিশিষ্টে উল্লেখিত 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার শোকবাণীতে ২৬শে জ্যৈষ্ঠ উল্লেখ আছে। সম্ভবত এটি মুদ্রণ প্রমাদ।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুকালে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সারাদেশে একটি প্রবল শোকোচ্ছ্বাস বয়ে যায়। শেখ হবিবর রহমান অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় এর বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়,

> "তৎকালে মুসলমান সমাজে প্রচলিত মিহির ও সুধাকর, সোলতান, ইসলাম প্রচারক, ইত্যাদি সমস্ত সংবাদ ও শোকগাঁথায়পূর্ণ থাকিত। বাঙলার এমন কোন মুসলমান লেখক ও কবি ছিলেন না, যিনি মুনশী সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক, গভীর শোকাচ্ছাসপূর্ণ প্রবন্ধ বা কবিতা লিখেন নাই। বাঙালার এমন কোন পল্লী ছিল না যাহা মুনশী সাহেবের মৃত্যুতে শোকাচ্ছাসে আকুল হইয়া উঠে নাই। মুসলিম বঙ্গের সেই দারুণ দুর্দ্দিনে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া যে শোকের তুমুল ঝড় বহিয়া গিয়াছিল এমন কোন মোসলেম হৃদয় ছিল না যে, তাহার সহিত নিজের তপ্ত হৃদয়ের হতাশার দীর্ঘশ্বাস মিশায় নাই।"[১৮]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'শোকোচ্ছ্বাস' এবং হবিবর রহমান, 'নিরব সমাধি' নামে যে শোক কবিতা রচনা করেছিলেন তাও হবিবর রহমানের গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে।[১৯] তাছাড়া মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর কবি শেখ ফজলল করিম তোমার স্মৃতি শিরোনামে একটি কবিতা লেখেন। সোলতান পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটির এক স্থানে বলা হয়েছে –

> "অদৃষ্টের উপহাসে কোহিনূর মনি
> খোয়াইনু মোরা। কিন্তু আশা আছে প্রাণে
> আসিবে সেদিন, যেদিন তোমার স্মৃতি
> লক্ষ কোহিনূর হতে শ্রেষ্ঠ ভাবি মনে
> রক্ষিবে মোসলেমকুল বক্ষের মাঝারে।"[২০]

উপরোল্লিখিত পত্রিকাসমূহের মন্তব্য, বিবরণ ও শোক কবিতাসমূহ পাঠ করলে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র তিরোধানে বাংলায় প্রবাহিত শোকোচ্ছ্বাস সম্পর্কে শেখ হবিবর রহমানের আবেগপূর্ণ বর্ণনার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া এসব মন্তব্য, প্রতিবেদন ও কবিতাসমূহ থেকে মেহেরুল্লাহ্‌র ব্যক্তিত্ব ও তৎকালীন বাংলার সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তার গুরুত্ব সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ একজন আর্দশ মুসলমান ছিলেন। মিহির ও সুধাকার পত্রিকার শোকবার্তায় তাঁকে পরমধার্মিক, দয়ালু, অমায়িক, জনহিতৈষী, ও স্বজাতিবৎসল মহাত্মা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এসব কারণে তাঁকে জীবনের শেষ দিনগুলিতে নিদারুন অর্থকষ্টে কাটাতে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জন করেছিলেন কিন্তু সে সম্পদ তিনি নিজস্বার্থে ব্যয় না করে দেশের বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের কাজে ব্যয় করেছেন। শেখ জমির উদ্দিন লিখেছেন - "মুন্সী সাহেব শত সহস্র টাকা উপার্জন করিয়াছেন কিন্ত নিজের পরিবারবর্গের জন্য তিনি কিছু রাখিয়া যান নাই। অথচ তিনি অপব্যয় করেন নাই। তিনি পীড়িত অবস্থায় অর্থকষ্টে পতিত হইয়াছিলেন।"[২১]

এই অর্থকষ্ট নিয়েই তিনি পরলোকের পথে পাড়ি জমান। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধমাতা, দুই স্ত্রী[২২] এবং তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রেখে যান। তাঁর পুত্র কন্যারা সকলেই ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক। তাঁর প্রথম পুত্র মোহাম্মদ মনসুরের বয়স ছিল ১৫ বছর (জন্ম ১২৯৯/১৮৯২)। দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ মোহসেনের বয়স ১১ বছর(জন্ম ১৩০২/১৮৯৫)এবং তৃতীয় পুত্র মেহাম্মদ মোখলেসের ৩বছর ৮মাস (জন্ম ২৬, আশ্বিন, ১৩১০/১৯০৩)। সালেহা খাতুন, আমিনা ও হাফিজাও ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

মেহেরুল্লাহ্র অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবার নিতান্ত-ই অর্থকষ্টে পড়ে। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। শেখ জমিরউদ্দিনের বর্ণনায় এর একটি চিত্র পাওয়া যায়। মেহেরুল্লাহ্র পরিবার পরিজনকে এ দুর্যোগ হতে রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তিনি লিখেছেন,

> "হে পরম করুণাময় খোদাতায়লা, তুমি ইচ্ছাময় যাহা তোমার ইচ্ছা করতে পার। দয়া করিয়া মুন্শী সাহেবের আত্মাকে তোমার নিকট স্থান দাও। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র কন্যা ও মাতাকে তোমার হস্তে সর্ম্পন করিতেছি কৃপা করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। তাহাদের অভাব মোচন কর।"[২৩]

বঙ্গীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে তিনি লিখেছেন,

> "হে বঙ্গীয় মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ। যিনি পবিত্র ইসলামধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য সর্বদা চিন্তা করিতেন, সেই মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য তোমরা কোন

Dhaka University Institutional Repository

বন্দোবস্ত করিবে না? হে মুন্‌শী সাহেব কর্তৃক উপকৃত মহোদয়গণ তোমরা তাঁহার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার পুত্র কন্যার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর।"[২৪]

মেহেরুল্লাহ্‌র কনিষ্ট পুত্র মুন্‌শী মোখলেসুর রহমানও এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে তাদের পরিবারের আর্থিক দুরবস্হার কথা স্বীকার করেছেন।

বাঙালী মুসলমি সমাজ মেহেরুল্লাহ্‌র পরিবারের প্রতি কৃপা দৃষ্টি দিয়েছিলেন এর কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি মুন্সীর ভক্ত কতিপয় হিন্দু লোকও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। উাহরণস্বরূপ চুড়ামনকাটির অভিলাস চন্দ্র ঘোষের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির বদান্যতায় মেহেরুল্লাহ্‌র এতিম পুত্রদের পড়ার কিছুটা সুযোগ হয়েছিল। অবশ্য জীবিতকালে তিনি পুত্রদের পড়াশুনার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। এলক্ষ্যে তিনি গৃহশিক্ষকের ব্যবস্হা করেছিলেন যাদের মধ্যে মনোহর-পুর M.E. স্কুলের হেডমাষ্টার জনাব নাছিরউদ্দীন চাকলাদার, স্কুলের সেকেন্ড শিক্ষক এছমাইল এবং ছেরাজুল ইসলাম অন্যতম।[২৫] তদুপরি মোহাম্মদ মোহসেন যখন 'এতিমের আবেদন' নামে একটি আবেদনপত্র পত্রিকায় দেন তখন অনেকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে মুন্‌শী মোখলেসুর রহমান তাঁর সাক্ষাৎকারে রাজশাহীর জনাব আনোয়ার আলী ও বীরভূমের জনাব নবুয়ত আলীর আর্থিক সাহায্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[২৬]

মেহেরুল্লাহ্‌র প্রথম পুত্র মোহাম্মদ মনসুরের পড়াশুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বরিশালের এ্যাডভোকেট খান বাহাদুর হেমায়েতউদ্দীন। কিন্তু মনসুরের পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা সম্ভব হয়নি। তিনি পরবর্তীতে গ্রামে পারিবারিক বিষয়সম্পত্তি তদারক করতেন। মাত্র ২৮ বছর বয়সে কয়েকজন নাবালক পুত্র-কন্যা রেখে ১২২৮ সালে ৪ঠা ভাদ্র মৃত্যুবরণ করেন। মোহাম্মদ মোহসেন ১৯২০ সালে ডিষ্টিংশনসহ বি.এ. পাশ করেন। ১৯২২ সালে সাব ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকুরি লাভ করেন। সরকারী চাকুরিতে তিনি সর্ব্বসাধারণের ও সরকাররে বিশেষ প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন বলে শেখ হবিবর রহমান উল্লেখ করেছেন। মোহাম্মদ মোহসেন ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। এদের মধ্যে আবু এহসান নামক এক পুত্র মাত্র চার বছর বয়সে ১৩৩৬ সালের ২৫শে শ্রাবন মারা যায়। মেহেরুল্লাহ্‌র

Dhaka University Institutional Repository

জীবনীকার শেখ হবিবর রহমান এ অকাল প্রয়াত শিশুটির মধ্যে মেহেরুল্লাহ্‌র অনেক গুণের সমাবেশ ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়,

> "এই অল্প বয়স্ক শিশুটির ভিতর এক অসাধারণ শক্তি লক্ষ্যিত হইয়াছিল। মুনশী সাহেবের অনেকগুলি গুণের সমাবেশ অতি আশ্চর্যভাবে এই সুন্দর শিশুর জীবনে প্রকটিত হইয়াছিল। এই কুসুম কোরকমল সুন্দর শিশুটি বাঁচিয়া থাকিলে সে যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।"[২৭]

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ীর সন্নিকটে গড়ের মাঠে আবু এহসানের সমাধি আছে। তার নামানুসারে এটি 'আবু মঞ্জিল' নামে পরিচিত।

মেহেরুল্লাহ্‌র কনিষ্টপুত্র মোখলেছুর রহমান যশোর জেলা স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। অবশ্য তাঁর পড়াশুনা শুরু হয় মনোহরপুর এম. ই. স্কুলে। মোখলেসুর রহমানের দেয়া তথ্য মতে, তাঁকে স্কুলে ভর্তি করেন মনোহরপুরের স্কুলের শিক্ষক গোলাম বিশ্বাস। তিনি মোখলেসুর রহমানকে খুব স্নেহ করতেন। গোলাম বিশ্বাসের তদারকীতে তিনি মনোহরপুর স্কুলে থেকে M.E. পাশ করেন। এ সময় বড় ভাই মোহাম্মদ মনসুরের আকস্মিক মৃত্যুতে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। পরে মেজোভাই মোহাম্মদ মোহসেনের চাকুরি লাভের পর পুনরায় তিনি স্কুলে ভর্তি হন। যশোর জেলা স্কুল থেকে তিনি মেট্রিক পাশ করেন। পারিবারিক কারণে তাঁর পক্ষে পড়াশুনা করা সম্ভব হয়নি। পরে তিনি নিজ বাড়ীতে অবস্থান করে সংসার দেখাশুন করেন। তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর পুত্ররা সুশিক্ষিত এবং প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল সরকারী পদে চাকুরি করছেন।

মেহেরুল্লাহ্‌র পুত্রদের কেউ পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী হতে পারেননি। মোখলেসুর রহমান তাঁর সাক্ষাৎকারে এ কথাটি অকপটে স্বীকার করেছেন। অবশ্য মেহেরুল্লাহ্‌র দ্বিতীয় পুত্র মোহামদ মোহসেন সরকারী চাকুরিতে যেমন সুনাম অর্জন করেছিলেন, তেমনি দেশের কল্যাণার্থে নানাবিধ কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে শেখ হবিবর রহমান উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রচুর অর্থও ব্যয় করতেন। তিনি 'পশ্চাতের পথ' শিরোনামে একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। অবশ্য সেটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে এ গ্রন্থের পান্ডুলিপিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

মেহেরুল্লাহ্‌র কনিষ্ঠপুত্র মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান পরিবেশ নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। এতে মুসলমান সমাজে বাসা বাঁধা কুসংস্কার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[২৮] অবশ্য এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়নি। মোখলেসুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র মকবুলার রহমান পেশাগত জীবনে একজন পশু চিকিৎসক। 'লাভজনক হাঁস-মুরগীর চাষ' শিরোণামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত সাঁঝের তারা উপন্যাসটি পান্ডুলিপি আকারেই রয়েছে।[২৯]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ পরিচিতি প্রসঙ্গত আলোচনার উপসংহারে একথা বলা যায় যে, বাঙালী মুসলিম সমাজের এক ক্রান্তিকালে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র জন্ম। সাধারণ পরিবারে সাধারণ পরিবেশে তাঁর জন্ম ও বেড়ে উঠা। শৈশবেই তাঁকে নানা প্রতিকুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে। তবে কোন প্রতিকুলতাই সংগ্রামী কর্মবীরের জীবন সাধনাকে বাধাগ্রস্থ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন স্ব-শিক্ষিত। ব্রত সাধনায় নিষ্ঠাবান।

তথ্য-সূত্র

১. কোন মানুষের নামের বানানে যথেচ্ছার কাম্য বা সংগত নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নাম যেভাবে লিখেন বা লিখেছেন সেভাবে লেখা একটা আর্দশ রেওয়াজ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র নামের বানান নিয়ে রয়েছে বিভ্রাট ও বিভ্রান্তি। মেহেরুল্লাহ্‌র নিজের রচিত পুস্তকে ব্যবহৃত বানান, তাঁর জীবনী নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ, এবং তাঁর উপর লেখা প্রখ্যাত ভাষাবিদ, পন্ডিতদের রচনায় ব্যবহৃত নামের বানান এ বিভ্রাট ও বিভ্রান্তির কারণ। সম্প্রতি প্রথমে বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ডি.এফ. আহমদ (দৈনিক সংগ্রাম ২০জুন, ১৯৯৭) এবং পরে নাসির হেলাল (দৈনিক সংগ্রাম ২০জুন, ১৯৯৭) মুন্সীর নামের সঠিক বানান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। ডি.এফ. আহমদ সমস্যাটির উল্লেখ করলেও এর সমাধান তাঁর লেখায় নেই। এব্যাপারে নাসির হেলাল সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁর মতে, নামের সঠিক বানান "মুন্সী মহম্মদ মেহের উল্লা"। তিনি এ বানানের উৎস হিসাবে ১৩ আষাঢ় ১৩০৯ সালে লেখা একটি ক্ষুদ্র চিঠির নীচে মুন্সীর স্পষ্ট স্বাক্ষর এবং তাঁর প্রথম পুত্র মনসুর আহমদের স্বহস্তে লিখিত তাঁদের বংশ তালিকার কথা উল্লেখ করেছেন। (অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্টে বংশ তালিকাটি সংযুক্ত) আমাদের কাছে নাসির হেলাল উল্লেখিত উৎস ছাড়াও মুন্সীর পাঠানো একটি মানি অর্ডারের কার্ড আছে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এতে মেহেরুল্লাহ্‌র স্বহস্তে প্রেরকের নাম লেখা আছে "মহম্মদ মেহের উল্লা।" এসব তথ্য প্রমাণের আলোকে আমরা তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

নামের সঠিক বানান হিসাবে "মুন্সী মহম্মদ মেহের উল্লা" কে গ্রহণ করতে পারি। তবে এ অভিসন্দর্ভে তাঁর নামের বানান "মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্" হিসাবে লেখা হয়েছে। কারণ এম.ফিল রেজিস্ট্রেশনে এরূপ বানানই গৃহিত হয়েছে। তবে পরবর্তীতে সঠিক বানানই অনুসরণ করা হবে।

২. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, মেহের-চরিত, কলিকাতা, ১৩১৫, পৃঃ১।

৩. মোহাম্মদ মোহসেন, পশ্চাতের পথ, (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত।

৪. শেখ জমিরুদ্দীন, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ডাঃ গোলাম মুয়ায্যাম (সাম্পাঃ), ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ১।

৫. ১৯৪৯ সনে যশোরের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ যশোর দর্শনা লাইনে চুড়ামন কাটি স্টেশনের নামকরণ "মেহেরুল্লাহ্ নগর" করা দাবী জানায়। ২৮শে মে ১৯৪৯ সালে চুড়ামনকাটি ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ ডিস্ট্রিক বোর্ডের কাছে এরূপ নামকরণের সুপারিশ করার ব্যাপারের ঐক্যমতে পৌছায়। এনায়েতপুরে অনুষ্ঠিত ধর্ম সভায়ও অনুরূপ দাবী জানানো হয়। তাছাড়া 'দৈনিক আজাদ' 'যশোর গেজেট' এবং 'শরীয়তে ইসলাম' ইত্যাদি পত্রিকা এদাবী জানানো হয়। জনমতের প্রতি লক্ষ্য রেখে যশোর জেলা বোর্ড ১৯৪৯ সনের ২৫শে জুন চুড়ামনকাটি রেললাইনের নাম 'মেহেরুল্লাহ্ নগর' করণের ব্যাপারে সরকারের কাছে সুপারিশের সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁদের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৭ অক্টো: ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উপ-সচীব মি.এম.এ.জলীল প্রেরিত ১৪৪/c সংখ্যক পত্রে পূর্ব বঙ্গ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলীকে নামকরণের সিদ্ধান্ত জানান। বিস্তারিত দ্রঃ মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, ঢাকা ১৯৮৩, পৃঃপৃঃ ৩১-৩৪।

৬. শেখ জমিরুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃঃ১।

৭. মোহাম্মদ মোহসেন, পূর্বোক্ত।

৮. শেখ হবিবর রহমান, কর্ম্মবীর মুন্শী মেহেরুল্লাহ্,কলিকাতা, ১৯৩৪, পৃঃ ১৫।

৯. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২।

১০. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

১১. ঐ, পৃঃ ১৭।

১২. ঐ, পৃঃ ২০।

১৩. শেখ জমিরুদ্দীন, মেহের-চরিত, পৃঃ ৩২।

১৪. উদ্ধৃতি, মুহাম্মদ আবূ তালিব, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ঃ দেশ কাল সমাজ, ঢাকা, ১৯৮৩,পৃঃ ২৬।

১৫. মোশাররফ হোসেন খান, প্রদীপ্ত এক সূর্য, প্রেক্ষণ, মেহেরুল্লাহ্‌ স্মরণ সংখ্যা, খোন্দকার আবদুল মোমেন (সম্পাঃ), ঢাকা, ১৮৮৬,পৃঃ ১১৯।

১৬. শেখ জমিরুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃঃ৮।

১৭. মুহম্মদ আবূ তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ৪।

১৮. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃপৃঃ ১১৮।

১৯. ঐ, পৃঃপৃঃ, ১৪৮-১৫২।

২০. ঐ পূর্বাভাষ দ্রঃ।

২১. শেখ জমিরুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।

২২. মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ ১৮৮০ সালে প্রথম বিয়ে করেন চান্দুটিয়ার মুন্‌শী আজিম উদ্দীনের কন্যাকে। পরবর্তীকালে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম-পরিচয় কিছুই জানা সম্ভব হয়নি।

২৩. শেখ জমিরুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।

২৪. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।

২৫. মোহাম্মদ মোহসেন, পূর্বোক্ত।

২৬. দ্রঃ মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র পুত্র মুন্‌শী মোখলেসুর রহমানের সাক্ষাৎকার, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০।

২৮. প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৯।

২৯. ঐ, পৃঃ ২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুন্সী মেহেরুল্লাহর উত্থানের পটভূমি

যুগমানস ও যুগজিজ্ঞাসাঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ, সমাজবিন্যাস ও উপনিবেশিক ভেদ-নীতির প্রভাবঃ মুসলিম প্রতিবাদী রাজনীতির ধারাক্রম বিশ্লেষণ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব মীর কাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর (মুঘল) সম্রাট ২য় শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়।[১] কোম্পানী কর্মচারীদের অবাধ শোষণ বন্ধ করতে গিয়ে মীর কাশিম রাজ্যচুত হন। এরপর পর্যায়ক্রমে মীর জাফর আলী খান (১৭৬৫ খ্রীঃ), নজমুদ্দৌলা (১৭৬৫-১৭৬৬ খ্রীঃ) সাইফুদ্দৌলা (১৭৬৫-১৭৭০ খ্রীঃ), এবং মুবারকদ্দৌলা (১৭৭০ -১৭৯৩ খ্রীঃ) বাংলার নবাব নাজিমের পদ অলংকৃত করেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ তারা সবাই ছিলেন ঠুটো জগন্নাথ। আসল ক্ষমতা চলে যায় কোম্পানীর গর্ভনরের হাতে। কোম্পানীর বার্ষিক বৃত্তিভোগী নবাবের কোম্পানীর অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করার অধিকার ছিল না। নবাব রাজকোষের কোন অর্থব্যয়, এমনকি রাজ্যের কর্মচারীদের পদোন্নতি বা পদচ্যুতির বিষয়েও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন না।[২]

বস্তুতঃ ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারায়। ক্রমান্বয়ে তাদের অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতা বিধ্বস্ত হয় এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিপর্যয় নেমে আসে। তাদের সামাজিক জীবন পতিত হয় ধ্বংসের মুখে।[৩] উল্লেখ্য যে, রাজশক্তি হিসেবে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই। অবশ্য বাংলায় তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে। তারপর পাঁচ শতাব্দীর অধিক সময় ধরে তারা এদেশ শাসন করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকায় সম্প্রদায়গতভাবে তারা ছিল সবচেয়ে সুবিধাভোগী। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টারের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়-

Dhaka University Institutional Repository

"বাস্তব সত্য হল এই যে, এদেশের শাসন কর্তৃত্ব যখন আমাদের হাতে আসে তখন মুসলমানরাই ছিল উচ্চতর জাতি; এবং শুধুমাত্র মনোবল ও বাহুবলের বেলাতেই উচ্চতর নয়, এমনকি রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনায় দক্ষতা এবং সরকার পরিচালনায় বাস্তব জ্ঞানের দিক থেকেও তারা ছিল উন্নতর জাতি।"[৪]

কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলার মুসলমানদের আর্থিক সমৃদ্ধির বিষয়টিও হান্টার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে অভাবগ্রস্থ লোকের সন্ধান পাওয়া দুরূহ ছিল। বাংলার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানের দরিদ্র হয়ে পড়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার।[৫] কিন্তু কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। একদা সমৃদ্ধ মুসলিম সম্প্রদায় পরিণত হয় অধিকার বঞ্চিত একটি হত-দরিদ্র শ্রেণীতে। কিন্তু কেন?

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে বৃটিশদের জয়লাভ এবং এদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন ভিন্ন।[৬] হিন্দুরা বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানায়। তাদের ভাষায় 'স্বেচ্চাচারী মুসলিম শাসন' হতে উদ্ধার করায় বৃটিশদেরকে মুক্তি দাতা হিসাবে অভিনন্দিত করে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি সীমাহীন বৈরী মনোভাব প্রদর্শন করে। তাদের কাছে ইংরেজরা ছিল ঘৃন্যতম শত্রু। কারণ তারাই মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নসাৎ করেছে। বৃটিশ শাসননীতিতে এরূপ মনোভাবের প্রভাব পড়ে। বৃটিশরাজ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের অক্ষম ও অসমর্থ করে তুলবার জন্য সু-পরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করে। অন্যদিকে হিন্দুদের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে তাদের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করতে শুরু করে। উল্লেখ্য যে, বৃটিশদের মনে আশংকা ছিল মুসলমানরা তাদের হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে যে কোন সময় বৃটিশ বিরোধী তৎপরতা চালাতে পারে। এজন্য তাদের হীনবীর্য করা বানীয়। বৃটিশ রাজের মুসলিম বিদ্বেষী এবং হিন্দুপ্রীতির এরূপ নীতির প্রকাশ্য স্বীকৃতি মেলে Lord Allenborough-এর একটি উক্তিতে। ১৮৪৩ সালে তিনি লিখেন,

"এক দশমাংশের বৈরীতা সম্বন্ধে যখন আমরা ধীর নিশ্চিত, তখন নয় দশমাংশের আনুগত্যের সমর্থন আদায় না করাটা হতো অবিজ্ঞ-জনোচিত কাজ। এ ধ্রুব সত্যের প্রতি আমি উদাসীন

Dhaka University Institutional Repository

থাকতে পারি না যে, এই জাতি (মুসলমান) মূলতঃই আমাদের প্রতি বৈরী এবং তাই হিন্দুদের সঙ্গে মিত্রতা পাতানোই আমাদের প্রকৃত নীতি হতে পারে।"[৭]

বৃটিশ রাজের এ নীতির ফলে একদা যে মুসলমানরা ছিল শাসকগোষ্ঠী এবং যারা শাসক শ্রেণীর সর্বময় ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করত তারা এখন পরিণত হয় অবহেলিত নিষ্পেষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে। অন্যদিকে রাজানুগ্রহে হিন্দুরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাক কোম্পানী শাসনামলে বাংলায় মুসলমানরা ছিল সবচেয়ে সুবিধাভোগী শ্রেণী। তবে প্রশ্ন থেকে যায় সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানই কি সমান সুবিধাভোগী ছিল? এরূপ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বস্তুতঃ বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলার মুসলমান সমাজ প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা- উচ্চ অভিজাত শ্রেণী-'আশরাফ' এবং নিম্ন শ্রেণী বা 'আতরাফ'।[৮] সংখ্যাল্প লোকের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল উচ্চ শ্রেণী। অথচ সারাদেশে ছিল তাঁদেরই প্রতিপত্তি। তাঁরাই ছিল শাসক, প্রশাসক, জমিদার, মুক্তচাষী এবং বিদ্বান।[৯] বাংলার মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্টরাই ছিল নিম্ন শ্রেণীভুক্ত। পেশাগতভাবে তারা ছিল সাধারণতঃ তাঁতী, দিনমজুর, গেরস্থ ও সরকারী ছোট চাকুরিধারী। তাছাড়া যোদ্ধা ও পুলিশ হিসাবেও তাদের নিয়োগ করা হতো। রাজন্যবর্গের গৃহপরিচার বা পাইক বরকন্দাজ হিসাবে তাদের কেউ কেউ কাজ করত।[১০] বাংলার মুসলমান সমাজের এ উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন ছিল? অনেকে এ দুশ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ককে পিতৃতান্ত্রিক ও সম্পূরক বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১১] উচ্চ শ্রেণী তাঁদের আশ্রয়াধীন নিম্ন শ্রেণীর ভ্রাতৃগোষ্ঠীকে লালন করতেন এবং ছত্রছায়া দিতেন।

পলাশীর যুদ্ধ বাংলার সব কিছুকেই বদলে দেয়। যুদ্ধের পর বদলে যায় বাংলার প্রশাসন, বদলে যায় বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা। এ পরিবর্তন হয় প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুতগতিতে। বাংলার মুসলমানরা হারাতে থাকে তাদের ক্ষমতা, মর্যাদা, অবস্থা ও ভূমিকা। জেমস ওয়াইজের (James Wise) এর মতে, এদেশের মুসলমান জনসাধারণ রাখালহীন মেষপালকের মত হয়ে পড়ে।[১২] ১৮৮২ সালে সৈয়দ আমীর আলী Nineteenth Century নামক পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বাংলার অভিজাত রাজন্য পরিবারগুলোর দুঃখজনক অবক্ষয় ও বিলোপের করুণ কাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

নিখুঁভাবে বর্ণনা করেছেন। W.W. Hunter উল্লেখ করেছেন, মুসলিম শাসনামলে তিনটি পৃথক সূত্র হতে অভিজাত মুসলিম পরিবারে অর্থাগম হত - সামরিক অধিনায়কত্ব, রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগীয় অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতা। এগুলো ছিল তাদের বিরাট অবস্থার আইনানুগ সূত্র। এ ছাড়াও ছিল দরবারের চাকুরী এবং ভাগ্যোন্নতির আরো শত রকমের অজনাসুত্র।[১৩]

প্রাক-পলাশী যুগে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা তাদের শাশ্বত ঐতিহ্য অনুসারে সামরিক পেশা গ্রহণ করে আসছিল। বিজেতা হিসেবে স্বভাবতই সরকারী প্রশাসনের উপরও ছিল তাঁদের একচেটিয়া অধিকার। হয়ত কখনো কোন বিত্তবান হিন্দু এবং কদাচিৎ কোন হিন্দু সেনাধক্ষ্য প্রশাসনের উপরিস্তরে ঠাঁই পেয়েছেন। তবে হান্টার এগুলোকে ব্যতিএক্রম ও বিরল ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন।[১৪] তাঁর ভাষ্য মতে,"তারা হিন্দুদের অধস্তন পদে নিয়োগ করেছে, কিন্ত সমস্ত উচ্চতর পদগুলো নিজেদের দখলে রেখেছে।"[১৫]

পলাশী যুদ্ধের পর সরকার কাঠামো বদলে যায়। রূপান্তরের পর্বে প্রথমেই ভেঙ্গে দেওয়া হয় মুসলিম সেনাবাহিনী। সেখানে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার সম্পূর্নরূপে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে সরকারের এ নীতির পক্ষে অনেকেই সাফাই গান।[১৬] সে যাই হোক, সরকারের এ নীতির ফলে কেবল উল্লেখযোগ্য মুসলমান সামরিক অফিসারই ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। অধিকন্তু হাজার হাজার সাধারণ সৈনিকও চাকুরি হারিয়ে অর্থ-সংকটে নিপতিত হয়। সামরিক বাহিনীর চাকুরির ন্যায় বেসামরিক চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের সাথেও চরম বৈরী আচরণ করা হয়। এক শতাব্দী পূর্বে সরকারী প্রশাসনে মুসলমানদের যেখানে একচেটিয়া অধিকার ছিল, সেখানে প্রবেশের দ্বারও তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল উচ্চতর সরকারী পদেই নয় সাধারণ চাকুরির ক্ষেত্রেও মুসলমানদের নিয়োগ প্রায় সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যায়। একদা যে হিন্দুরা চাকুরি লাভে মুসলমানদের কৃপা প্রার্থী ছিল, তারাই এখন প্রশাসনের সর্বত্রই প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করে।কিন্তু কেন? মুসলমানদের চাইতে হিন্দুরা কি অধিকতর যোগ্য? অথবা ব্যাপারটি এই যে, বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে মুসলমানদের এত বেশী সুযোগ রয়েছে যে, তারা সরকারী চাকুরি গ্রহণে অনিচ্ছুক এবং তাই তারা চাকুরির জায়গাটি হিন্দুদের এখতিয়ারে ছেড়ে দিয়েছে? হান্টার বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

> "হিন্দুরা নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর মেধার অধিকারী, কিন্তু সরকারী কর্মক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার জন্য যে রকম সার্বজনীন ও অন্যান্য মেধা থাকা দরকার বর্তমানে তা তাদের নেই এবং অতীত ইতিহাসও এ কথার পরিপন্থী।" [১৭]

তিনি রাজনৈতিক সংগঠন ও সরকার পরিচালনায় মুসলমানদের দক্ষতা ও বাস্তব জ্ঞানের উচ্চ প্রশংসা করে বলেছেন যে, এতদ্‌সত্ত্বেও মুসলমানদের জন্য সরকারী চাকুরি এবং বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে।[১৮]

সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের ব্যাপারে মুসলমানরা প্রধানতঃ সরকারের বৈরী আচরণের শিকার হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ফারসী পত্রিকা দূরবীণের একটি নিবন্ধের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। নিবন্ধে বলা হয়েছে,

> "উচ্চস্তরের বা নিম্নস্তরের সমস্ত চাকুরি মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। সরকার সকল শ্রেণীর প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য, তথাপি এমন সময় এসেছে যখন মুসলমানদের নাম আর সরকারী চকরিজীবীদের তালিকায় প্রকাশিত হচ্ছে না। কেবল তারাই চাকুরির জায়গায় অপাংক্তেয় সাব্যস্ত হয়েছে।" [১৯]

সরকারী চাকুরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে হিন্দুদের ছাড়া অন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে না বলে উল্লেখ থাকত। এ তথ্যও নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলমানদের নিয়োগের ব্যাপারে সরকার যদি কোন বিধি নিষেধ আরোপ নাও করতেন তথাপি ঐ সময় হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগীতায় মুসলমানদের সাফল্যের সম্ভাবনাও ছিল খুব কম। কেননা এ সময় অফিস আদালতে সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজীর প্রচলন হয়েছিল। এ পদক্ষেপ চাকুরিতে মুসলমানদের আরো পশ্চাদপদ করে তুলে। উল্লেখ্য যে, মুসলিম আমলে বিশেষ করে নবাবী শাসনামলে প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা দেয়া হত পাঠশালায়, আর সংস্কৃতের পাঠ দেয়া হত চতুস্পাঠীতে।[২০] মুসলমানরা পাঠশালায় বাংলা শিখতে যেত, তবে ধর্মীয় কারণে মক্তবে যাওয়ার ব্যাপারেই তাদের ঝোঁক ছিল বেশী।[২১] সরকারী চাকুরি লাভের সুবিধার্থে হিন্দু-মুসলিম সকলেই ফারসী ভাষা শিখতেন। বলা আবশ্যক যে, ব্যবহারিক প্রয়োজনে ফারসী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব থাকলেও শাস্ত্রালোচনায় আরবী ও সংস্কৃতের প্রাধান্য ছিল।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে কোম্পানী এদেশীয়দের শিক্ষার কোন দায়িত্ব নেয়নি। ১৮১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বলতে গেলে এখানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল খ্রীষ্টান মিশনারীরা। ফলে তাদের পরিচালিত শিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব।[২৩] ১৮১৩ সালের সনদ আইনে কোম্পানী সরকার এদেশীয় শিক্ষার দায়িত্ব নেয়। তবে তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানরা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা হিন্দুদের শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে পারলেও তা মুসলমানদেরকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সাধারণভাবে বলা হয় যে, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি ঘৃণাবশতঃ মুসলমানরা ইংরেজ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে বিরত থাকে। W.W. Hunter এর মতে, ইংরেজ প্রবর্তিত জন শিক্ষা ছিল মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাদের চাহিদার সাথে সামাঞ্জস্যহীন এবং তাদের ধর্মের কাছে ঘৃনার্হ।[২৪] তাঁর মতে, তিনটি কারণে এ শিক্ষা মুসলমানদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়নি। প্রথমতঃ বাংলা ভাষায় হিন্দু শিক্ষকদের মাধ্যমে পাঠদান। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের জীবনের সম্মানজনক স্থান অধিকার ও ধর্মীয় কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা শিক্ষার সুযোগের অভাব এবং তৃতীয়তঃ মুসলমান ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগের অভাব।[২৫]

হান্টারের উর্পযুক্ত বক্তব্যের সারবত্তা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমানদের পাশ্চাত্য তথা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে এসব কারণের বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। আর তাহলো তাদের আর্থিক সঙ্গতির অভাব। ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা ছিল ব্যয় সাপেক্ষ। বাংলার মুসলমানদের পক্ষে তখন এরূপ ব্যয়বহুল শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব ছিল না।[২৬]

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলার মুসলমানরা কোম্পানী সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। তদুপরি তাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাটিও এ সময় মুখ থুবড়ে পড়ে। আর এজন্য দায়ী ছিল কোম্পানী সরকার কর্তৃক গৃহীত 'রাজস্ব পূণঃপ্রবর্তন প্রথা' বা 'Resumption Policy.' ভারতের ঐতিহ্য অনুযায়ী এখানকার মুসলিম নৃপতিগণ জনগণের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি বরাদ্ধ দিতেন। কোম্পানী সরকার লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের উদ্দেশ্যে Resumption Policy প্রণয়ন করলে লাখেরাজ সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা মরণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। এ ব্যবস্থার নানা গড়িমসির কারণে মুসলমানদের মধ্যে যে শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তারাও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।[২৭]

মুসলমানদের সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস এবং নতুন শিক্ষা গ্রহণে তাদের ব্যর্থতা ইত্যাদি মুসলমানদের পশ্চাদপদ অবস্থায় ফেলে দেয়। সরকারী চাকুরি লাভেও তারা ব্যর্থ হয় এবং পরিণত হয় অভাবগ্রস্থ জাতিতে।

মুসলিম শাসনামলে অভিজাত মুসলমানদের সৌভাগ্য গড়ার দ্বিতীয় উপায় ছিল রাজস্ব আদায়। এ ব্যাপারে তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে কয়েক বছর মুসলমান অফিসারদের স্বপদে বহাল রাখা হয়।[২৮] কিন্তু ১৭৭২ সাল থেকে তারা নতুন ভূমি ব্যবস্থা নীতি গ্রহণ শুরু করে এবং ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। নতুন ব্যবস্থায় একদিকে যেমন পুরাতন জমিদাররা তাদের জমিদারী হারায়, তেমনি উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজস্ব অফিসারগণ চাকুরি হারায়। মুসলমান অফিসারদের স্থলে প্রতি জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করা হয়। ফলে মুসলমান অভিজাতরা ভূমি রাজস্বব্যবস্থার সাথে তাদের সাবেক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মিঃ জেমস ও কিনীলি এর ভাষ্য মতে,

> "যে সব হিন্দু কর আদায়কারী ঐ সময় পর্যন্ত নিম্নপদের চাকুরিতে নিযুক্ত ছিল, নতুন ব্যবস্থার বদৌলতে তারা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হয়। নতুন ব্যবস্থা তাদেরকে জমির উপর মালিকানার অধিকার এবং সম্পদ আহরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। অথচ মুসলমানরা নিজেদের শাসনামলে এই সুযোগ সুবিধাগুলিই একচেটিয়াভাবে ভোগ করেছে।"[২৯]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কয়েক বছরের মধ্যে সরকর কর্তৃক রাজস্ব পুনঃপ্রবর্তন প্রথা Resumption Proceedings প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদের সৌভাগ্য রবি চিরতরে অস্তমিত হয়ে যায়। স্মরণাতীতকাল থেকে ভারতবর্ষের দেশীয় নৃপাতিরা জন শিক্ষা পরিচালনা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তির বরাদ্দ দিতেন। কোম্পানী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বৈধ কাগজপত্র যাচাই করার উদ্যোগ নেয়। এ ব্যবস্থার ফলে হিন্দু মুসলিম উভয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের ক্ষতির পরিমাণই ছিল বেশী। কেননা বিজেতা জাতি হিসেবে মুসলমানরা লাখেরাজ সম্পত্তি বরাদ্দের

দলিলাদি সংরক্ষণে বরাবরই উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে। তদুপরি বন্যা ও কীটদৃষ্ট হয়েও অনেকের দলিলপত্রাদি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই সরকারের দাবী অনুযায়ী প্রয়োজনের সময় তারা এসব দলিল পত্রাদি প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার তাদের লাখেরাজ অধিকার বাতিল করে এতে রাজস্ব ধার্য করেন। এর ফলে শত শত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় বলে হান্টার মন্তব্য করেন।[৩০] এছাড়া এ ব্যবস্থার ফলে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার ও ধ্বংস সাধিত হয়।

এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে অভিজাত মুসলমানরা আইন আদালতের চাকুরি হতেও বঞ্চিত হন। অথচ একসময় গোটা বিচার ব্যবস্থার উপর তাদের ছিল একচেটিয়া কর্তৃত্ব। ইংরেজ সরকার কর্তৃক আদালতে ফারসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রচলন এবং ধর্ম নিরপেক্ষ আইন-কানুন প্রয়োগ ইত্যাদির ফলে মুসলমানরা এখানকার চাকুরি থেকেও বিতাড়িত হয়।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় কেবল যে অভিজাত মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্থ হল তাই নয়, মুসলমান সমাজের নিচের জনশ্রেণীও এর কুফল থেকে রেহাই পায়নি। বাংলার নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের প্রধান আয়ের সূত্র ছিল কৃষি ও বস্ত্রবয়ন। এ দুটি জীবিকা অত্যাশ্চর্যভাবে একই লোকের জীবনে এসে বিমিশ্রিত হয়ে ওঠে। এক মওসুমে যে হাত লাঙ্গল চালাত, অন্য মওসুমে সে হাতই বস্ত্রবয়ন করত। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রপণ্যের বিপুল আমদানী বাংলার বস্ত্রবয়ন শিল্প ও স্বার্থ ধ্বংস হয়ে পড়ে। এর ফলে বহু লোক কর্মচ্যুত হয়।[৩১] সনাতন পেশা হারানোর পর এসব লোকের সামনে নতুন কর্ম সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত না থাকায় তারা কৃষি কাজের দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু কোম্পানীর নতুন ভূমি ব্যবস্থায় সেখানেও তারা চরম নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। আর এভাবেই দুঃখ, দারিদ্র ও বঞ্চনা মুসলমানদের তাড়া করে ফিরতে থাকে।

ইসলাম ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর সম্পৃক্ত এবং একইসুত্রে গ্রথিত। এগুলোর কোন একস্তরের অবক্ষয় অন্যগুলোকেও জড়াগ্রস্থ করে তোলে। বাংলায় মুসলমানরা রাজনৈতিক প্রাধান্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যতদিন বজায় রাখতে পেরেছিল, ততদিন তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহও ছিল অনেকটা নির্বিঘ্ন। কিন্তু পলাশী-উত্তর যুগে এক্ষেত্রে তাদের অবক্ষয় বিশেষভাবে নজরে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। মুসলিম সমাজ প্রতিবেশী ধর্ম সম্প্রদায়সমূহের অনৈসলামিক রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের চরম অবক্ষয় দেখে অনেকেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। এ প্রসঙ্গে হাজী শরীয়তউল্লাহ ও মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর কথা স্মরণ করতে পারি। হাজী শরীয়তউল্লাহ ১৮১৮ সালে মক্কা থেকে দেশে ফিরে মুসলমানদের দুরাবস্থা দর্শনে মর্মাহত হন এবং বলেন যে, বাংলায় ইসলামের বৃক্ষকে তিনি ঈমানের অভাবে মৃতপ্রায় দেখতে পান।[৩২]

জৌনপুরের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ১৮৩৬ সালে বাংলায় আসেন। এখানকার মুসলমানদের অবস্থা দেখে তিনি মন্তব্য করেন যে, ইংরেজ আমলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়লেও কোথাও বাংলার মত এত করুণ ও শোচনীয় রূপ ধারণ করেনি।[৩৩] বাংলার মুসলিম সমাজের উর্পযুক্ত দুরাবস্থার প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করা হয়। হাজী শরীয়তউল্লাহ ও মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী বাংলায় ইসলাম প্রচারের অপরিহার্যতা স্বীকার করেন।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তুর্কী ও পাঠান প্রভাবে বাংলার মুসলিম অধিবাসীদের প্রায় সকলেই ছিলেন সুন্নী। নবাব সরকার যুগে শিয়া প্রশাসকগণ ঐতিহ্যবাহী প্রতিপত্তিশালী সুন্নী মুসলমানদের পাশ কাটিয়ে বহিরাগত শিয়া ও অবাঙালী বিশেষতঃ মাড়োয়ারী বণিক গোষ্ঠীর হিন্দুদের সাহায্যে প্রশাসন পরিচালনার নীতি গ্রহণ করলে বাঙালী সুন্নী মুসলমানরা সক্রিয় রাজনীতিতে থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বাংলার অবক্ষয়প্রাপ্ত ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ মুসলিম সমাজে আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবি শ্রেণী ব্যর্থ হয়। তাই মুসলিম উচ্চ শিক্ষিত স্তর হতে নেতৃত্বের উন্মেষ না হওয়ায় সমাজের নিম্নস্তরের জনগণ এ শূন্যতা পূরণ করে এবং তাদের জীবনবোধের ভিত্তিতে নেতৃত্ব গড়ে উঠে।[৩৪] হাজী শরীয়তউল্লাহ ছিলেন এ শ্রেণীর সার্থক প্রতিনিধি।

বাংলার ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। তিনি অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান। তাঁর জন্ম ফরিদপুর জেলায়। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন শরীয়তউল্লাহর জীবন কাটে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। বাঙালী মুসলিম সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও

Dhaka University Institutional Repository

স্পর্শকারতার বিপুল বিস্তার ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তাঁকে ব্যথিত করে। গ্রাম-গঞ্জে জনসাধারণের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন-মানের উন্নয়ন ও দুঃখ দুর্দশা মোচনের মহান আর্দশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। 'ফরায়েজী আন্দোলন' নামে পরিচিত তাঁর সংস্কার আন্দোলনের কালসীমা ছিল ১৮১৮ সালে থেকে ১৮৪০ সাল এবং এর ভৌগলিক প্রভাবের পরিধি ছিল বাংলা ও আসাম।[৩৫]

বস্তুত ফরায়েজী আন্দোলন ছিল প্রকারান্তরে আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের কিঞ্চিত ব্যতিক্রমধর্মী একটি শাখা। এ আন্দোলন শিরক, বিদআত ও আয়াস আড়ম্বর থেকে মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবনকে মুক্ত করে একক আল্লাহ্‌র ইবাদত বা আরাধনার দিকে মানুষকে আমন্ত্রণ জানায় এবং কর্তব্য সাধনে বাস্তবতার নিরিখে পবিত্র কোরআন ও রসুলের (সাঃ) সুন্নাহ্‌র অনুশাসন বর্হিভূত, পরবর্তীকালের আবিস্কৃত আচার ব্যবহার অথবা অন্যান্য ধর্ম ও জীবন-নীতির দ্বারা প্রভাবিত রছম রেওয়াজ পরিহার করে ফরজ বা অবশ্যকরণীয় কর্তব্যগুলো প্রথমে সমাধা করার প্রয়োজনীয়তার দিকে মানুষের দৃষ্টি আর্কষন করে।[৩৬] ফরায়েজীদের মতে, ফরজ কাজ বাদ দিয়ে উপকারহীন ইসলাম বির্গহিত এবং ধর্মের নামে নব আবিস্কৃত রছম রেওয়াজে ব্যাপৃত হওয়া বিদআত এবং পাপের উৎস। এসব উদ্‌যাপন করা অনুচিত। ফরজ অর্থাৎ প্রথম কাজ প্রথমে করা এ ছিল তাদের মূল শ্লোগান। এ জন্যই এদের বলা হত ফরায়েজী।[৩৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী হিন্দু ও বৌদ্ধদের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাবে বাঙালী মুসলিম সমাজে উচ্চ-নীচ জাতিভেদ ও বর্ণভেদের ন্যায় কিছুটা ভেদনীতির প্রচলন হয়েছিল। হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশকারী এসব ইসলাম বিরোধী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর বরাবর জোর দেন এবং সর্বপ্রকার ভেদনীতি দুর করে শ্রমের মর্যাদা ভিত্তিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তিনি জমিদার ও জোতদারদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করারও চেষ্টা করেন। ফলে তাঁরা তাঁর প্রতি ক্ষুদ্ধ হন।

ফারায়েজী মতবাদ সকল মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিছু সংখ্যক প্রাচীনপন্থী অদূরদর্শী মোল্লা, মৌলভী, পীর এবং কায়েমী স্বার্থবাদী মুসলমান তাকে বাধা দেয়। ১৮৩১ সালে রাম নগরের

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন-পন্থীদের অনুরোধে বিক্ষুব্ধ জমিদাররা সরকারের সহায়তায় ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মন্দির আক্রমণ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে তাদের সেখান থেকে বহিস্কার করেন।[৩৮] এ ঘটনার পর শরীয়তুল্লাহ সর্তকতা অবলম্বন করেন এবং ফরিদপুর বরিশাল, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর ও কুমিল্লা অঞ্চলে মুসলিম জনসাধারণকে ফারায়েজী আর্দশে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক সাফল্যও অর্জন করেন। এসব অঞ্চলে বহুসংখ্যক মুসলমান সক্রিয়ভাবে ফারায়েজী আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৮৪০ সালে শরীয়তউল্লাহ ইন্তেকাল করলে তাঁর পুত্র মুহসিন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) তাঁর স্হলাভিসিক্ত হন। দুদু মিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলনে সামাজিক-অর্থনৈতিক ধারা প্রাধান্য অর্জন করে। দুদু মিয়া ছিলেন রাজনীতি সচেতন। তিনি তাঁর পিতার মধ্যম পন্থা পরিহার করেন। বাংলার কৃষক জনতাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর সূচিত হকের লড়াই ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্হার পুনরুজ্জীবন, স্বেচ্ছাসেবক ফারায়েজী লাঠিয়াল বাহিনী ও ফারায়েজী ভ্রাতৃসংগঠন প্রতিষ্ঠা, অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের গ্রাত্রদাহের কারণ হয়ে ওঠে। বিভিন্নস্হানে দুদুমিয়ার অনুসারীদের নীলকুঠি আক্রমণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নীল কুঠিয়াল ও জমিদাররা সম্মিলিতভাবে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেন। এতে তাঁকে বেশ কিছুদিন কারাভোগ করতে হয়।[৩৯]

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার দুদুমিয়াকে গ্রেপ্তার করে আলীপুর জেলে আবদ্ধ রাখে। ১৮৬২ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করে ঢাকার ১৩৭ নং বংশালে বসতি স্হাপন করেন এবং একই সালে পরলোক গমন করেন। দুদুমিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নয়া মিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু তাঁর উত্তরসুরী সয়ীদ উদ্দিনের সময় হতে আন্দোলনের গতি মন্থরতা লাভ করে এবং তাঁর পুত্র বাদশা মিয়ার সময় এর কর্ম চাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে আসে।[৪০]

বাংলায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলন হচ্ছে 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া'। এ আন্দোলনের প্রবক্তা সৈয়দ আহমদ বেরলভী। তিনি ১৮১৮ সালে দিল্লীতে এ আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভীর পুত্র শাহ আবদুল আজিজের অনুপ্রেরণা ছিল এই আন্দোলনের শক্তির প্রধান উৎস। এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ধর্মীয়-সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার আন্দোলন হিসাবে। তবে অচিরেই এটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে। বৃটিশ ভারতীয় প্রশাসন ও ইউরোপীয় লেখকগণ একে ভারতীয় 'ওয়াহাবী' আন্দোলন নামে অভিহিত করে। রক্ষণশীল ওলেমাদের একাংশও একে ওয়াহাবী বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদ শহীদ নিজে তাঁর আন্দোলনের নামকরণ করেন তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদিপন্থা।[৪১] বস্তুত আরবের ওয়াহাবী মতবাদের সাথে সৈয়দ আহমদের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং তিনি সংস্কার আন্দোলন শুরু করার পূর্বে আরবের মুওয়াহ্হিদুনদের সংস্পর্শেও আসেন নাই।

বাংলায় তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রথম স্তর ছিল সৈয়দ আহমদের বাংলায় আগমনকে কেন্দ্র করে। ১৮২১ সালে তিনি কলকাতায় আসলে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে একটি অভাবনীয় ও বিস্ময়কর ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে।

বাংলায় তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া দ্বিতীয় প্রবাহের সূচনা করেন মীর নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খ্রী)। সৈয়দ আহমদ শহীদ মক্কায় অবস্থানকালে তিতুমীর তাঁর সান্নিধ্যে আসেন ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমদের সাথে সম্ভবত তিনি সীমান্ত প্রদেশে যান। ১৮২৭ সালে বাংলায় ফিরে এসে তিনি তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার বিস্তৃত অঞ্চলে এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে।[৪২] উল্লেখ্য যে, তিতুমীরের নেতৃত্বে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলন থেকে ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে রূপ নেয়।

তিতুমীর বাংলার মুসলমানদের একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করতে, স্থানীয় অনৈসলামিক রীতি, প্রথা, অভ্যাস, আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার পরিহার করতে আহবান জানান। এমন কি কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিহীন উপায়ে ফাতেহা, ওরস, মিলাদ ও মহরম উদ্‌যাপন ইত্যাদি থেকেও বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করেন। কেননা তাঁর মতে, এগুলো বিদ্‌আত এবং তা পরিহার করা আবশ্যক।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

তিতুমীরের উর্পযুক্ত প্রচারণা ও এগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ ও তৎপরতা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের পরিপন্থী হওয়ায় তিতুমীরের অনুসারীদের সাথে ফরায়েজীদের মতই প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরোধ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। তিতুমীরের সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রজাদের সাথে ক্রমবর্ধমান একাত্মতায় উদ্বিগ্ন জমিদার শ্রেণী মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে রক্ষণশীলদের সাথে সংস্কারপন্থীদের বিরোধকে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। তাঁরা রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদের সহায়তার নামে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের নানাভাবে নাজেহাল করতে থাকে। চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও রানাঘাট এলাকায় সাতজন বৃহৎ জমিদার একজোট হয় এবং তিতুমীরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতা, শান্তিভঙ্গ, মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, হিন্দু ধর্মাস্থানের পবিত্রতাহানি, তদুপরি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির অজুহাতে কলকাতার হিন্দু পত্র-পত্রিকায় এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এক দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণা শুরু করে।[৪৪] স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ায় নীলকররাও তাঁর বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠে এবং তাঁর দলকে ধর্মীয় নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী (Religious Bandit) নামে অখ্যায়িত করে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয়।

জোটবদ্ধ হিন্দু জমিদারের চক্রান্ত ও হয়রানী এবং ইংরেজ প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বে অতিষ্ঠ হয়ে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। ১৮৩১ সালে অক্টোবর মাসে নারিকেল বেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা তৈরী করে তারা প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁরা হিন্দু জমিদার, পুলিশ ও ব্রিটিশ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পরাজিত হয়। ১৮৩১ সালে ১৯শে নভেম্বর মেজর স্কট হার্ডিং ও ক্যাপ্টেন সাদারল্যান্ডের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে ৫০জন অনুসারীসহ তিতুমীর শাহাদত বরণ করেন। তাঁর বহু অনুসারীকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। সৈয়দ আহমদ বেরলভীও একই বছর বালাকোটে শাহাদৎ বরণ করেন।

সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও তিতুমীরের মর্মান্তিক শাহাদৎ বরণে তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলন বড় রকমের হোচঁট খায়। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর প্রধান খলিফা পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলীকে নেতা নির্বাচন করেন। তিনি জিহাদী আন্দোলনের পাশাপাশি 'আমল বিল হাদীস' বা হাদীসের ভিত্তিতে কর্মসাধন মতবাদের আলোকে কঠোর বিশুদ্ধবাদী 'আহল-ই-

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস' আন্দোলনের গোঁড়াপত্তন করেন। বেলায়েত আলীর নির্দেশে মাওলানা এনায়েত আলী ১৮৩২ সালে বাংলায় আসেন। তাঁর নিজের এবং সহযোগী মাওলানা এনায়েত আলীর বিরামহীন প্রচারণা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার উত্তর-পশ্চিম জেলাসমূহে আহল-ই- হাদীস আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।[৪৫] উল্লেখ্য যে, আহল-ই- হাদীস পন্থীগণ কোন মাযহারের অনুসরণ না করায় বিরুদ্ধবাদীগণ তাদেরকে 'লা মাযহাবী' বলেও আখ্যায়িত করে।

ফরায়েজী আন্দোলন ও তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া সংগ্রাম মুসলিম সমাজের অবক্ষয়রোধের প্রচেষ্টায় যাত্রা শুরু করলেও গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশুদ্ধ ইসলামের সামাজিক পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে এবং বিশেষ করে গণমানুষের নীতিগত অধিকার সংরক্ষণ এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসন বিরোধী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। এতদুভয় আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং মুসলিম সমাজে নব চেতনার জন্ম দেয়। অবশ্য এর একটি নেতিবাচক দিকও লক্ষ্যনীয়, যা হল মুসলিম সমাজে মতভেদ সৃষ্টি। বস্তুতঃ রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থীদের পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ ইসলামকে বিকৃত করার মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজকে খন্ড-বিখন্ড করে।

উপরে বর্ণিত অবস্থায় ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ভারতীয় সিপাহীরা অংশ গ্রহণ করলেও ইংরেজ সরকার মনে করে এজন্য প্রধানতঃ মুসলমানরাই দায়ী। মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে সিপাহীদের শিখন্ডী হিসাবে ব্যবহারে এরূপ ধারণা বদ্ধমুল হয়। এজন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিশোধে মেতে উঠে। মোঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নিঃশেষ করা হয়। মুসলমান অভিজাত বংশগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। বঙ্গ-ভারতের মুসলিম সমাজ দারুণ বির্পযয়ের মুখে পড়ে।[৪৬] এ সময় এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। তাদের সর্বগ্রাসী প্রচারণায় বাংলার নিরীহ, অজ্ঞ, দরিদ্র-মুসলমান পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে।

উর্পযুক্ত পরিস্থিতিতে বাঙলার মুসলিম সমাজে এক নতুন নেতৃত্বের আর্বিভাব হয়। এই নেতৃত্বের উৎসস্থল নগরবাসী ইংরেজী-শিক্ষিত অভিজাত ও পেশাজীবী শ্রেণী। এই শ্রেণীর পুরোধা-পথিকৃত

Dhaka University Institutional Repository

হলেন নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ। এঁরা স্ব-সম্প্রদায়ের উন্নয়নে শিক্ষা বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন। এজন্য তাঁরা ইতিপূর্বে সূচিত মুসলমানদের ইংরেজ বিরোধী জিহাদী আন্দোলনের বিরোধীতা করেন এবং তা পরিহার করে সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি অবলম্বনের পরামর্শ দেন। মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী(রহ)সহ কিছু মুসলিম নেতা এ ব্যাপারে তাঁদের সমর্থন দেন। উল্লেখ্য যে, কেরামত আলী জৌনপুরী(রহ) ধর্মমতের দিক দিয়ে অনেকটা তরিকায়ে মুহাম্মদীর কাছাকাছি ছিলেন। অর্থাৎ মুসলমান সমাজকে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পূণর্গঠনে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে ব্রিটিশ ভারতকে 'দারুল হরব' ঘোষণা এবং তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার তিনি বিরোধীতা করেন। তাঁর মতে, এসব কাজ ন্যায় বিরুদ্ধ এবং ধর্মদ্রোহীতার সামিল।[৪৭]

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, নওয়াব আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। আবদুল লতিফের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেকটা রক্ষণশীল। বাঙালী মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনে উদগ্রীব হলেও তিনি পশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি ধর্মীয় বির্তক এড়িয়ে চলতেন। মুসলমি সমাজের কুসংস্কার দূর করার ব্যাপারেও তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না, বরং এর সাথে তাঁর আপোষ প্রয়াস লক্ষ্যনীয়। পক্ষান্তরে সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন চিন্তা ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রগামী। ধর্মীয় সংস্কারক হিসাবে তিনি কোন ভূমিকা পালন করতে চাননি। তাঁর প্রধান অনুরাগ ছিল রাজনীতির দিকে। অবশ্য তিনি উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদের মত ইসলামকে উনিশ শতকী ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার আলোকে মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করেছেন। বলা প্রয়োজন যে, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর মর্তাদর্শ উচ্চ শ্রেণীর অভিজাত মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও বাংলার মুসলিম গণমানুষের উপর এর তাৎক্ষনিক প্রভাব ছিল না বলেই চলে। সার্বিকভাবে মুসলিম সমাজের অজ্ঞতা ও অনগ্রসরতার কারণে মুসলিম সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনা ও কার্যক্রমের আলো ব্যাপক মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ দূরে থাক, মিশনারীদের আক্রমণের মুখে ঈমান-আকিদা রক্ষা করতেই তারা হিমশিম খায়।

উনিশ শতকের বাঙালী সাধারণ মুসলিম সমাজের এরূপ পটভূমিতে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর আর্বিভাব। বাঙালী মুসলিম সমাজের ঈমান-আকিদা রক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত নতুন নেতৃত্ব যখন উদাসীন, সনাতনী আলেম সমাজও যখন নিস্পৃহ, তখনি তিনি তাঁর পূর্বসূরী হাজী শরীয়উল্লাহ ও তিতুমীরের ন্যায় ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। নতুন নেতৃত্বের ন্যায় তিনি মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমেও ব্রতী হন। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে মুন্সী মেহেরুল্লাহর ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে সবিস্তার বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

তথ্য-সূত্র

১. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১ ৩য় খন্ড, সম্পাঃ সিরাজুল ইসলাম, বাংলা সংস্করণ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৩৬,।

২. মোজাহারুল ইসলাম; আমি স্মৃতি-আমি ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ১২৮।

৩. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৬।

৪. ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, (অনুঃ এম, আনিসুজ্জামান) খোশরোজ কিতাবমহল, ঢাকা, পৃঃ ১৪৯।

৫. পূর্বোক্ত পৃঃ ১৩৭।

৬. R.C Majumder (ed), The History and Culture of the Indian People, British Paramountcy and Indian Renaissance Part II, p. 995.

৭. মোজাম্মেল হক, বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ১৮৫৭-১৯৪৭, ঢাকা, ১৮৭৬ পৃঃ ১৩৭।

৮. এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিকব ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ

৯. মোজাম্মেল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪১।

১০. ঐ পৃঃ ১৪১।

১১. ঐ পৃঃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

১২. James wise, Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London, 1884, p.2.

১৩. ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৮।

১৪. ঐ পৃঃ ১৩৮।

১৫. ঐ পৃঃ ১৩১।

১৬. ঐ পৃঃ ১৪৪।

১৭. ঐ পৃঃ ১৪১।

১৮. ঐ পৃঃ ১৪৯।

১৯. দুরবীন, জুলাই ১৮৬৯, দ্রঃ হান্টার, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৫৩।

২০. Kalikankar Datta, Alivardi and his Times, Calcutta,1939, p.p.266-267.

২১. A.R. Malick, The British Policy and the Muslim of Bengal, Dhaka, 1966, p.

২২. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ২২।

২৩. Thompson and Garatt, p. 244.

২৪. ঐ, পৃঃ ১৫৯।

২৫. ঐ, পৃঃ ১৯৩।

২৬. হান্টার, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৬৩।

২৭. হান্টার, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৬৩।

২৮. ঐ, পৃঃ ১৪১।

২৯. উদ্ধৃতি, হান্টার, ঐ, পৃঃ ১৪২।

৩০. ঐ, পৃঃ ১৬৩।

৩১. মোজাম্মেল হক, পুর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৩।

৩২. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৬।

৩৩. Muin-ud-din Ahmed Khan, History of the Faraidi Movement, Dhaka, 1984, p. 150.

৩৪. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, মুসলিম ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলন, বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, সম্পাঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও অন্যান্য, ঢাকা ১৯৮৬, পৃঃ ১৩৩।

৩৬. ঐ, পৃঃ ১৩২।

৩৭. ঐ, পৃঃ ১৩২।

৩৮. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, মুসলিম ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৪৫।

৩৯. মোজাম্মেল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১।

৪০. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৮।

৪১. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩০।

৪২. মঈনুদ্দীন আহমেদ খান, মুসলিম ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৮।

৪৩. ঐ, পৃঃ ২৫০।

৪৪. ঐ, পৃঃ ২৫০।

৪৫. ঐ, পৃঃ ২৫৬।

৪৬. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পলাশী থেকে পাকিস্তান, পৃঃ ৬২।

৪৭. আ.ফ. সালাউদ্দিন আহমদ, উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা ও কর্মকান্ড, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, ১ম খন্ড, সম্পাদনা- সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারা

৩ঃ১ ইসলামের শাশ্বত বিধানের প্রতি আনুগত্য

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইসলাম ধর্ম ও এর বিধি ব্যবস্থার প্রতি তাঁর আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল অবিচল। অবশ্য প্রথম জীবনে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন ও সংশয় দেখা দিয়েছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কুহেলিকাপূর্ন, কূটতর্কজাল সমাচ্ছান্ন বক্তৃতাশুনে, বাইবেল ও খ্রীষ্টান ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করে ইসলামের ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় জাগে এবং ক্রমে তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এমন কি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন বলেও মনিস্থর করে ফেলেন।[১] কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন। ফলে তাঁর ঈমান রক্ষা পেল। ধর্মের কূট প্রশ্নের মিমাংসায় মুন্‌শীর সত্যানুসন্ধিৎসু মন যখন নিতান্ত ব্যাকুল, তখন সৌভাগ্যক্রমে ক্রমে 'খৃষ্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' 'ইঞ্জিলে হয়রত মোহাম্মদের খবর আছে' এই দুটি পুস্তক পাঠের সুযোগ হয়। ফলে তাঁর মনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ধর্মন্তর গ্রহণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। তাছাড়া মহীশুর থেকে প্রকাশিত 'মনসুরে মোহাম্মদী' নামক পত্রিকা এবং[৮]তোহফাতুল মোকতাদি'সহ কতিপয় ধর্ম ও ধর্মতত্ব বিষয়ক পুস্তক পাঠ করার ফলে একদিকে যেমন খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মের দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অযৌক্তিকতা সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করেন, অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের সত্যতা, সৌন্দর্য ও আর্দশ সম্পর্কে ধারণা এবং বিশ্বাস তাঁর অন্তরাশ্রয়ী হয়। শেখ হবিবর রহমানের ভাষায়,"এই সমস্ত পুস্তক ও পত্রিকা পাঠে ক্রমশঃ তাহার হৃদয়-গমন হইতে ইসলাম

> সম্বন্ধে সন্দেহের সমস্ত কুহেলিকা অরুনোদয়ে তিমির পটলের মত বিদূরিত হইয়া গেল; নতুন স্বর্গীয় আলোকে তাঁহার অন্তর-জগত আলোকিত হইয়া উঠিল। ইসলামের নতুন তেজে, নতুন শক্তিতে দিন দিন পূর্ণ হইয়া মেহেরুল্লাহ্‌ জনসমাজে দীপ্ত মিহেরের ন্যায়ই প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সম্পর্কে সংশয়মুক্ত হওয়ার পর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ নিষ্ঠাবান খাঁটি মুসলমানে পরিণত হন। তিনি শরীয়তের অবশ্য প্রতিপাল্য বিধানসমূহ যেমন-নামাজ রোজা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পালন করতেন। তাঁর মতে,শরীয়তের হুকুম আহকাম ভক্তির সাথে প্রতিপালন না করলেও একজন মুসলমান ঈমানদার থাকে বটে, কিন্তু তাঁর ঈমান নাকেছ বা দুর্বল হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন,

> "যেমন কোন মানুষের অন্যান্য শক্তি বা তাকাত না থাকিলেও যতক্ষন তাহার দেহে জ্ঞান বর্তমান থাকে, ততক্ষণ মুর্দা বলা যায় না। সেই প্রকার বন্দার দেহে যে পর্যন্ত খোদা রাসুলের পাকা বিশ্বাস বর্তমান থাকিবে ও শরিয়তের পরে শাবা-শোবা পয়দা না হইবে, সে পর্যন্ত কাফের নহে, কিন্তু শ্রবণ, দর্শন,উত্থান,শক্তি রহিত ব্যক্তির কেবল প্রাণ থাকিলে যেমন তাহা দ্বারা কোন কার্যই সম্পূর্ন করিতে পারে না শুধুই তাকে একটি অকর্মণ্য জেন্দা মানুষ বলা যায় মাত্র; বাস্তবিক নামাজ, রোজা, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি এবাদত বন্দেগী বিহীন ইমানদার বা মুসলমানের দশাও সেইরূপ।"[৩]

একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ আল্লাহর আরাধনাকে মানব জীবনের আবশ্যকীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তবে তাঁর মতে, মানব সমাজের হিত সাধনার বিষয়টি উপেক্ষা করার অবকাশ নেই।[৪] মেহেরুল্লাহ্ মনে করতেন, দ্বীন ও দুনিয়ার সমবেত কল্যান সাধনের নামই ইসলাম। দ্বীন-দুনিয়া থেকে পৃথক নয়। দ্বীনদার হতে হলে, প্রকৃত ধার্মিক হতে হলে দুনিয়ার মধ্য দিয়ে কর্মকৌশলের মাধ্যমে সংসারের মধ্য দিয়েই হতে হবে। পরিবার প্রতিপালন সংসারের সর্ববিধ উন্নতিসাধন, ইসলামেরই অঙ্গ।তবে এর শর্ত এই যে, কর্ম সাধনার মধ্যে আল্লাহ্কে ভুললে চলবে না। মেহেরুল্লাহ্ তাঁর বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে তৎকালীন মুসলিম সমাজকে এ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন।[৫] সমকালীন মৌলভী-মৌলানাদের সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তা ধারার পার্থক্য এখানেই। তাঁর ধর্মভাবনা ও চর্চার ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, তা একটি প্রয়োজনীয় শক্ত সামাজিক ভিত্তি খুঁজে নিতে পেরেছিল। তাই তাঁর জীবন বোধ, ধর্ম-ধারণা ও সামাজিক হিত কামনা একই বিন্দুতে এসে মিশে ছিল। তাসাউউফ বা ইসলামের অধ্যাত্ম সাধনার গৌরবময় পথ অবলম্বন করা ছিল মুন্সীরএকটি আন্তরিক আগ্রহের বিষয়। বিখ্যাত ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবু বকর (রহঃ) নিকট মুরিদ হয়ে এ বিদ্যা অর্জনের সংকল্প করেন। অবশ্য অকাল মৃত্যুজনিত কারণে তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ইসলামের একনিষ্ঠ সাধক হলেও কখনই পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। উপযাচক হয়ে ধর্ম-কলহে লিপ্ত হওয়াও তাঁর স্বভাব ছিল না। তিনি ইসলাম ধর্মের সত্যতা, সৌন্দর্য ও আর্দশ প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্রতী ছিলেন। এজন্য প্রয়োজনবোধে অন্য ধর্মের অসারতা সম্পর্কে বক্তব্য বা লেখনী ধারণ করলেও এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্নতা ছিল না। আর ইসলামতো শুধু মুসলমানের ধর্ম নয়। এটা বিশ্বমানবের ধর্ম-বিশ্বধর্ম। এ ধর্ম ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গীর শিক্ষা দেয় না। দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিতে শেখায় সবখানে। বস্তুত প্রকৃত ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, তা কখনই সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা দেয় না। মুন্সী মেহেরুল্লাহ তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন।[৭] এ কারণেই সম্ভবত তাঁর অধিকাংশ সভাতে বহু শিক্ষিত হিন্দুব্যক্তির সমাগম হত। পরধর্ম বিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্নতা থাকলে শিক্ষিত হিন্দুদের মন জয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

৩ঃ২ খ্রীষ্টিয় ধর্মপ্রচারক মন্ডলীর কার্যক্রম ও মেহেরুল্লাহ্র বিদ্রোহী সত্বা

দক্ষিণ এশিয়ায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রথম উদ্যোগ নেয় পর্তুগীজরা। বাংলাকে বলা হত ভারত বর্ষের রাজনীতি অর্থনীতি এবং বৌদ্ধিক উন্নয়নের স্নায়ূকেন্দ্র। এ বাংলায় পর্তুগীজ ধর্ম প্রচারক পাদ্রীদের কর্মকান্ডের সূত্রপাত ষোড়শ শতকে। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত এই পাদ্রীরা সতের শতকে এখানে রীতিমতো কয়েকটি ধর্মপ্রচার কেন্দ্র গড়ে তুলে ছিলেন। ঢাকা ছিল এর মধ্যে অন্যতম।[৮] আঠারো শতকের শেষ দিকে ইউরোপীয়ওনব্য প্রটেষ্ট্যান্ট বাদী ইভেঞ্জেলিক মুভমেন্টের' (New Protastant Evangelic Movement) পর খ্রীষ্টানদের সংগঠিত মিশনারী তৎপরতার সূচনা হয়।

বাংলায় প্রটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পুরোধা উইলিয়াম কেরী। যদিও তাঁর পূর্বে দুই একজন মিশনারী ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় এসেছিলেন।[৯] তথাপি বাংলায় প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম প্রচারের সূচনাকাল ধরা হয় কেরীর বাংলায় আগমন বছরকে। ১৭৯৩ সালে কেরী তাঁর সহযোগী জন থমাসকে নিয়ে ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন। অবশ্য মিশনারী বলে কোম্পানী সরকার তাঁকে সেখানে নামতে দেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বাংলায় কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক বছর কর্তৃপক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

এখানে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেয়নি। যদিও ১৬৯৮ সালে কোম্পানীকে সনদ প্রদানের সময় তাদের নিয়ন্ত্রাধীন অঞ্চলে খ্রীষ্টান প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্ম প্রচারের শর্তারোপ করা হয়েছিল। তথাপি গণঅসন্তোষের ভয় এবং তাদের শাসন ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকায় প্রথম যুগে কোম্পানী সরকার বাংলায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রতি সরাসরি বিরূপতা প্রকাশ করে। এমনকি কোম্পানী এলাকায় কোন মিশনারীকে বসতি স্থাপনের অনুমতিদানে পর্যন্ত অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এমতাবস্থায় উইলিয়াম কেরী যখন কলকাতায় আসেন তখন কোম্পানী সরকার তাঁকে কলাকাতায় বসতি স্থাপন করতে দেয়নি। বাধ্য হয়ে তিনি কলাকাতা থেকে ১৪ মাইল দুরে ড্যানিশ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে আশ্রয় নেন। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে আরো ৪ টি ব্যাপটিষ্ট পরিবার এবং জশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড নামে দুজন পাদ্রী কেরী এবং থমাস এর সঙ্গে যোগ দিলে বাংলায় প্রনালী সিদ্ধভাবে মিশনারী কার্যক্রম শুরু হয়।[১০]

১৮১৩ সালের সনদ আইনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তার নীতি পরিবর্তন করে। এই আইনে কোম্পানী সরকার এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্ররভার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও কোম্পানী এলাকায় বসতি স্থাপন সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।[১১] এর ফলে বাংলায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার কার্য ব্যাপক গতিবেগ লাভ করে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা, চার্লস গ্রান্টের (কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মবর্ত) ফরমুলা অনুযায়ী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্য যে, এসব স্কুল থেকে বাংলার হিন্দু সমাজে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়।

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারেও এ মিশনারীরা অগ্রনী ভূমিকা রাখে। 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (Female Juvenile Society), 'সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেসনস্ ইন ক্যালকাটা এ্যান্ড ইটস ভিসিনিটি' (Society for Native Female Education's in Calcutta and its vicinity), Ladies Society, Calcutta Ladies Association for Native Female Education' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কলকাতা ও এর আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় বহু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এসব প্রতিষ্ঠানকে অর্থানুকুল্য প্রদান করতো 'Calcutta Baptist Mission' 'Church Missionary Society' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, এসব স্কুলের পাঠাসূচীতে খ্রীষ্টতত্বের পাঠ-পঠন

Dhaka University Institutional Repository

আবিশ্যিক ছিল। শিক্ষার ছদ্মাবরণে ধর্মপ্রচারের এহেন হীন প্রচেষ্টার কারণে এসব স্কুলে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের পাঠানো হত না। এদেশীয় সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এদেশের ভাষা আয়ত্ব করেন। তারা বাংলা উর্দু, ফারসী ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষা শিখে এবং এসব ভাষায় খ্রীষ্টধর্মের মহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বইপত্র সাময়িকী ও সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকে। আনিসুজ্জামান বলেছেন "এদেশের ভাষাকে এরা যত সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্ম ও বিশ্বাসকে এরা ঠিক ততখানি ঘৃনা করতেন।"[১২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম দিকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা হিন্দু অধ্যুষিত কলাকাতা ও এর পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে কেন্দ্রীভূত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এ অঞ্চলে মিশনের সংখ্যা ছিল ৭১ টি। এর মধ্যে 'Baptist Missionary Society' 'Protestant Missionary Society' 'London Missionary Society' 'Free Church of Scottland' 'St Fall Catholic' ছিল অন্যতম। কেবল কলকাতাতেই মিশন সংখ্যা ছিল ৩০।[১৩]

প্রাথমিক অবস্থায় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের প্রাধান্য দেওয়ার কারণ কি? এ সম্পর্কে মোহাম্মদ শাহ লিখেছেন,

> " খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকরা মনে করতেন যে, ধর্মান্তরের ক্ষেত্র হিসেবে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু সমাজ ই বেশী উপযোগী। কারণ, অতীতে হিন্দু সমাজ থেকে বহু লোক ভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাই খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের তৎপরতা হিন্দু এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, ফলে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে হিন্দুরাই ছিল বেশী । মুসলমান এলাকায় তাদের কর্মতৎপরতা ছিল আগ্রহবর্জিত, সীমিত আকারের এবং বিলম্বিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি কম আগ্রহী ছিল বলে ইংরেজী শিক্ষার জন্য মিশনারীদের শরণাপন্ন হতেও মুসলমানরা তেমন আগ্রহী ছিল না।"[১৪]

উনিশ শতকের মধ্যভাগ হতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা হিন্দুদের পাশাপাশি ক্রমশঃ মুসলমানদেরকে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। মুসলিম অধ্যুষিত মফস্বল এলাকায় বিশেষত নদীয়া, যশোর, খুলনা, মেহেরপুর ও মালদহে খ্রীষ্টান মিশনারী তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময় খ্রীষ্টান মিশনারীরা রীতিমত দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে নানারূপ নতুন নতুন কৌশলের আশ্রয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত হয়। তারা বক্তৃতা ও বইপত্র রচনার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে সচেতন আক্রমন চালায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খ্রীষ্টান পাদ্রীরা ছিলেন ইংরেজী ভাষায় সুপন্ডিত। তবে প্রচারকার্যের সুবিধার্থে আরবী, ফার্সী ভাষায়ও দখল প্রতিষ্ঠা করেন। তারা ইসলামী ধর্মশাস্ত্র, কোরআন, হাদীস, তফসীর, এলামে রেজাল ইত্যাদিতে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর তারা এ অগাধ পান্ডিত্য ও প্রতিভা ইসলামের ক্ষতিসাধনে নিয়োজিত করে। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অপকৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন,

> "এই শ্রেণীর পাদ্রীগণ ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক কোরআন শরীফের তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত করিয়াছেন। ইসলাম দর্শন, মিজানুল হক, তালিমে মোহাম্মদী, ইসলাম দর্পন, হকিকল ইমান এবং এই শ্রেণীর প্রাণ জুড়ানো বহু ইসলামী নামের আবরণে নানা কেতাব প্রচার করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে ইহারা তীব্র হলাহল উদ্গীরণ করিয়া থাকেন। "মোসলেম ওয়ালড্" (Muslim world) নামক একখানী সুপরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রিকা এই উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইয়া থাকে।"[১৫]

শুধু মাত্র ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তফসীর এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থই নয়, উনিশ শতকে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোপাত্মক কিছু গ্রন্থও রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'Prophet's Testimony of Christ' 'Mohammadan Ceromonies' 'Reasons for not being a Mussalman' বা মুসলমান ধর্মের অপ্রামাণ্য কথন ইত্যাদি। আরবী, ফারসী শব্দ বহুল মিশ্র ভাষা মুসলমান সমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা তাই মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য মিশ্র ভাষায়ও কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এর নমুনা পাওয়া যায় ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায়। এতে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।[১৬] অবশ্য মুসলিম সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়া পুস্তিকাটি প্রত্যাহার ও প্রকাশকগণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। ১৮৮৪ সালে পাদ্রী জি. এইচ. রাউস 'ফোরকান' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে পবিত্র

Dhaka University Institutional Repository

কোরআনকে আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্মগ্রন্থ নয় বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। পাদ্রী জে 'মাহম্মদের জীবন চরিত' নামে সাধু ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থটিতে মুসলমানদের পবিত্র মক্কা নগরীকে হিন্দুদের কাশীর সাথে তুলনা এবং ভিক্ষুকদের স্বর্গ বলে আখ্যায়িত করা হয়। মুহাম্মদ (সাঃ) কে মৃগীরোগী এবং বহু নারীর প্রতি আসক্ত সংসার সুখান্বেষী একজন পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৭] উল্লেখ্য যে, মিশনারীরা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অশালীন কুৎসা ও নিন্দায় পরিপূর্ণ উপরোক্ত গ্রন্থদিসহ আরো অনেক পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রাদি বিনামূল্যে সর্বত্র ছড়াতে থাকে।

খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের অন্যতম মাধ্যম ছিল বক্তৃতা। শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পাদ্রীরা বাংলার হাট-বাজার ও বন্দরে মধুর কণ্ঠে বক্তৃতা করে অজ্ঞ নিরীহ মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও যীশুর জয়গান করতেন। তারা কোরান শরীফের কুট অর্থ করে, মিথ্যা ও 'মৌজু' হাদিস এবং মিথ্যা তফসিরগুলি প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতেন।[১৮] তাদেরকে খ্রীষ্টধর্মের আলোকের দিকে আহবান করতেন। পাদ্রীরা প্রচার করতেন যে, পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এ তিনজনই ঈশ্বর, একে তিন তিনে এক, যীশুকে বিশ্বাস করলেই একেবারে বিনা হিসাবে স্বর্গে যাওয়া যাবে। শেখ হবিবর রহমান লিখেছন,

> "এই সমস্ত ত্রিত্ববাদের হেয়ালী লোকে যতটা বুঝুক আর না বুঝুক বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়া এবং যীশুকে বিশ্বাস করিলেই একেবারে বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাওয়া যাইবে-এই প্রলোভনে ও নানা কারণে বহু লোক খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিত।"[১৯]

শেখ হবিবর রহমানের মতে, ধর্মান্তকরণের উপরোল্লিখিত নানা কারণের' মধ্যে দারিদ্র ও অশিক্ষা ছিল অন্যতম। ধর্ম প্রচারার্থে খ্রীষ্টান মিশনারীরা বহু অর্থ ব্যয় করতেন। উচ্চ বেতনে পাদ্রী ও প্রচারক নিয়োগ করা হত ও ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার একটি প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, ধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারীরা জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করত।[২০] তারা মিশন কেন্দ্রের সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, অনাথ-আশ্রম এবং সেবাশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। এসব সৎকার্যের পশ্চাতেও তাদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের গোপন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। বস্তুতঃ মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত উপরোক্ত

প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনামূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা ও সেবা প্রাপ্ত কৃতজ্ঞ নিরীহ হিন্দু মুসলমানকে তারা নানা কৌশলে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতেন।

বাংলায় নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাকের ফলে প্রায়ই বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ মহামারী দেখা যেত। 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার বিবরণী মতে,

> " দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে সেই অঞ্চলে আড্ডা করিয়া গরিব লোক দিগকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করে। এই উপায়ে নদীয়া, যশোহর জেলার বহু সংখ্যক নিরক্ষর গরিব মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। নদীয়া কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামের প্রায় সমস্ত চাষী প্রজাই ঈসায়ীদ্বীন কবুল করিয়াছে। "[২১]

মেহেরপুর অঞ্চলে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের পুরো সুযোগও খ্রীষ্টান মিশনারীরা গ্রহণ করেছিল বলে জানা যায়। বস্তুতঃ কেবল বাচাঁর তাগিদেই সে সময় অনেক নিঃস্ব দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান ধর্মান্তরিত হয়। পারলৌকিক ত্রাণের চাইতে ইহলৌকিক অস্তিত্ব রক্ষার গরজেই তারা পিতৃধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। সমকালীন কবি মুনশী মনিরুদ্দীন আহমদ এর বিবরণীতেও এরূপ সাক্ষ্য মেলে। তাঁর ভাষায়

"নদীয়া জেলায় আজি বেরাদরগণ।
যত খেরেস্তান লোগ কর দরশন।।
বাপদাদা তাহাদের আকালের বারে।
পেটের দায়েতে মজে যিশুর মন্তরে।।
দেলজান হইতে তারা যিশু না ভজিল।
আফসোসে আখের সবে পরান তেজিল।।"[২২]

১৯১২ সালে প্রকাশিত 'আঞ্জুমানে এত্তেফাক এসলাম' নদীয়ার ৬ষ্ঠ বার্ষিক প্রতিবেদনে পূর্বোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, মূলতঃ খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার কৌশল, সাহায্য সহযোগীতা ও সেবামুলক কাজের জন্যই বাংলার পশ্চাদপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীর একাংশ পিতৃ পুরুষের ধর্মত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলম ধর্ম ও মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রবল আক্রমণ ও খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের হীন অপচেষ্টা প্রতিরোধ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক বাঙলী সমাজে তখন বলেত গেলে কেউ ছিলেন না। খ্রীষ্টান মিশনারীদের আক্রমন থেকে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে রক্ষার জন্য রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সচেষ্ট হয়েছিলেন। তবে প্রাদ্রীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবর্তীণ হয়েছিলেন সনাতন হিন্দু সমাজের মুখপাত্ররা। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পাদ্রী হেস্টির এবং কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের তর্কযুদ্ধ এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনীসভা' কলকাতার'সনাতন ধর্ম রক্ষিনী সভা' এবং নবগোপালের'হিন্দু মেলা' ছিল এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন সাংগঠনিক আয়োজন।[২৩]

দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য যে, প্রথমদিকে খ্রষ্টান মিশনারীদের কর্মকান্ড প্রতিরোধে মুসলমানদের মধ্যে তেমন উদ্যোগ-আয়োজন দেখা যায় না। আনিসুজ্জামান বলেছেন, "মিশনারীদের কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করার মত লোক সে সময় বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ছিল না।"[২৪] বাংলায় অসংখ্য নায়েবে নবী, আলেম উলামা ছিলেন বটে কিন্তু খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যক্রম প্রতিহত করা বা তাদের সাথে শাস্ত্রীয় এবং জ্ঞাগর্ভ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার যোগ্যতা এসব আলেমদের ছিল না। ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ মতে, একজন হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান বা নাস্তিক যদি ইহাদিগকে তর্কযুদ্ধে আহবান করেন তা হইলে বিষম বিপদ। ইহারা দুই এক কথায়-ই "লা-জওয়াব" হইয়া পড়েন।"[২৫]

খ্রীষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা প্রতিহতকরণ কিংবা বিধর্মীদের নিকট ধর্ম প্রচার দুরে থাক, স্ব-সম্প্রদায়ের অজ্ঞ, অশিক্ষিত সাধারণ লোকদের 'ধর্ম পিপাসা' নিবৃত্ত করার যোগ্যতাও এসব আলেম উলেমাদের ছিল না বলে সমকালীন তথ্য প্রমাণ থেকে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বাংলার আলেম সমাজ বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। তারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করতেন। এদের সম্পর্কে মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ বলেছেন

> "মাতৃভাষা বাংলা লেখাপড়ায় তাঁদের এত ঘৃনা যে, তাহারা তাহা মুখে উচ্চারণ করাই অপমানজনক মনে করেন। এই অদূরদর্শিতার পরিণাম ফল কি সর্বনাশ তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। যে দেশের বায়ু, জল, অন্ন, ফল মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত খাইয়া তাহাদের শরীর পরিপুষ্ট সে দেশের ভাষার

Dhaka University Institutional Repository

> প্রতি অনাদর করিয়া তাহারা যে কীদৃশ সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছে, তাহা ভাবিলেও প্রাণে এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"[২৬]

বাংলা ভাষায় বুৎপত্তি না থাকায় তৎকালীন বাংলার আলেম সমাজ সাধারণত উর্দু ভাষায় ওয়াজ নসিহত করতেন। আলেম উলেমাদের আরবী ফারসী প্রভাবিত উর্দু ভাষা গ্রাম্য অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকের বোধগম্য না হওয়ায় এর কার্যকারিতা ছিল নিতান্তই সামান্য।'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার ভাষ্য মতে,

> "যাহাদের লইয়া বিশাল মুসলমান সমাজ গঠিত, যাহারা সমাজের অস্থি-পাঞ্জর, সমাজের সাড়ে পনের আনা লোক যে সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত, সেই শ্রেণীর লোই যদি ধর্ম্ম প্রচারক মৌলভী সাহেবদিগের মর্মকথা ভালরূপে বুঝিতে না পারিল, তবে আর সে ধর্ম্ম প্রচারকের দ্বারা সমাজের কি হিত সাধন হইবে,----ইংরেজী বা বাঙালা ভাষাভিজ্ঞ ও ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষার্থী শিক্ষিত লোকদিগকে যুক্তিমুলক দুইটা কথা বুঝাইবার ক্ষমতা মৌলভী সাহেবদিগের নাই।"[২৭]

উপরে বর্ণিত বাংলার তৎকালীন আলেম উলেমাদের অযোগ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা ও নিস্পৃহতার ফলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের মহাদম্ভ, ইসলামের বিরুদ্ধে আস্ফালন ও আক্রমণের মুখে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ভীত বিহবল ও কিকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়ে। পাদ্রীরূপ ভীষণ আগ্রাসী শার্দ্দুল সন্দর্শনে নিরীহ সাধারণ মুসলমান সমাজ আত্মরক্ষার্থে সভয়ে গৃহকোনে আত্মগোপন করে। বাংলায় ইসলাম তথা মুসলিম সমাজের এরূপ সংকটময় মুর্হতে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ মহাবীরের ন্যায় 'যুদ্ধংদেহী' রবে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মোকাবেলায় অগ্রসর হন। গ্রাম্য স্বল্প শিক্ষিত যুবক মেহেরুল্লাহ্ অসাধারণ জ্ঞানী বিদ্বান পাদ্রীগন পরিচালিত খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে সম্মুখ সমরে অবর্তীন হন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের তৎপরতায় মোকাবিলায় মুন্সী মেহেররুল্লাহ্ও তাদের অনুরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি পাদ্রীদের বক্তৃতাসভায় কিছু কিছু প্রতিবাদ করতেন। তারপর হাটে হাটে তাঁদের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ শুরু করেন। নানাস্থানে প্রাদ্রীদের সাথে তাঁর তর্ক-বাহাস চলতে থাকে। এতে তিনি তাদের যুক্তি তর্কের অসারতা প্রতিপন্ন করে ইসলামের বিজয় নিশান উর্ধ্বে তুলে ধরেন। ইসলামের দীপ্ত প্রভাবে উজ্জীবিত দর্জ্জী মেহেরুল্লাহ্ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের পরাজিত করে ইসলামের মহিমা প্রচার এবং আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) এর মহান গৌরব ঘোষণা করেন। হত বিহবল কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুসলিম সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

পাদ্রীদের বিরুদ্ধে তরুণ মেহেরুল্লাহ্‌র বাদ প্রতিবাদ ও সু-যুক্তিপূর্ন উত্তর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। উল্লেখ্য যে, প্রচারক জীবনের প্রথম পর্যায়ে মুন্সীর ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন মুন্‌শী মোহাম্মদ কাসেম ও মুন্‌শী গোলাম রব্বানী।[২৮]

কেবলমাত্র বক্তৃতা বা তর্ক - বাহাস নয়, খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যকে পূর্ন সফলতা দেবার জন্য মেহেরুল্লাহ্‌ খ্রীষ্টন ধর্মের বিরুদ্ধে পুস্তক রচনায়ও প্রবৃত্ত হন। বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তকের মাধ্যমে পাদ্রীদের সাথে তাঁর তুমুল সংগ্রাম পরিচালিত হয়। এই সংগ্রামে অনেকেই তাঁর হাতে পরাজিত হন। তন্মধ্যে একজন বিখ্যাত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক পাদ্রী শেখ জমিরুদ্দীন পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুন্‌শীর প্রেরণায় তাঁর সহযোগী হিসেবে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌'র মৃত্যুর পরও তিনি খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রচারিত ইসলাম বিদ্বেষী পুস্তক সমূহের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেন।

আমাদের আলোচ্য সময়ে কালি কলমের এবং প্রচারের যুদ্ধই ছিল মুসলমানদের প্রকৃত জেহাদ। ইসলাম ধর্মের পবিত্র অঙ্গে বিধর্মী খ্রীষ্টান মিশনারীদের নির্মম আক্রমণ সত্বেও তৎকালীন মুসলিম সমাজ বিশেষ করে আলেম-উলামাগণ তা প্রতিহত করতে সম্পূর্ন উদাসীন ছিলেন। অথচ বিধর্মীদের প্রচারণা ও সাহিত্যের বিষাক্ত প্রভাবের মুখে ইসলাম ও মুসলমান সমাজের অস্তিত্ব রক্ষায় পূর্বোক্ত জেহাদে অংশগ্রহণ করা ছিল তাদের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তারা এতে ব্যর্থ হন। এতে ইসলাম তথা বাংলার মুসলিম সমাজ নিদারুন সংকটে পতিত হয়। জাতির এ দুর্দিনে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ এগিয়ে আসেন। ইসলাম তথা মুসলিম সমাজের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জেহাদ পরিচালনা করে ইসলামের চির পবিত্র গৌরবোন্নত বিজয় পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেন। দারিদ্র নিস্পেষিত অভাব জর্জরিত হতবিহবল বাংলার মুসলমানদের মনে আবার নতুন সাহস, নতুন তেজ, নতুন উন্মাদনার সঞ্চার করেন। তবে দুভার্গ্যজনক হল যে, মুন্‌শীর লোকান্তরের পর তাঁর পরিচালিত জিহাদে নেতৃত্ব দেবার মত সুযোগ্য নেতা না থাকায় তাঁর সাফল্যের ধারা ভীষণভাবে বাধাগ্রস্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩. হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতির কবলে মুসলিম সমাজ ও মেহেরুল্লাহ্‌র প্রতিক্রিয়া

উনবিংশ শতাব্দী বিশেষ করে এর শেষপাদ ছিল বাঙালী মুসলমান সমাজের জন্য এক বিশেষ ক্রান্তিকাল। এ সময় অজ্ঞ, দরিদ্র মুসলিম সমাজ নানা ধরনের কুপ্রথা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক রীতি নীতির দ্বারা তারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পন্ডিতদের মতে, এর কারণ শত শত বছর ধরে ক্রমবর্ধমান হারে হিন্দু-বৌদ্ধদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, বিয়ের মাধ্যমে হিন্দু-বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিতকরণ[২৯] এবং হিন্দুদের সঙ্গে শত শত বছরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য।[৩০] অবশ্য বলে রাখা প্রয়োজন যে, উপরোক্ত কারণে বাঙালী মুসলমান সমাজ হিন্দু প্রভাবে প্রভাবিত হলেও তা তাদের ধর্মের মুলনীতি ও বিশ্বাসকে বিনষ্ট করতে পারেনি। তবে এটাও সত্য যে, ইসলামে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর সম্পৃক্ত এবং একই সূত্রে গ্রথিত। এসবের যে কোন এক স্তরে অবক্ষয় অন্যগুলোকেও জড়াগ্রস্থ করে তোলে। বাঙালী মুসলমানদের ক্ষেত্রেও এ সত্যের চরম প্রকাশ লক্ষ্যনীয়।

পূনশ্চঃ উল্লেখ্য যে, বাংলার মুসলমান বিশেষ করে গ্রামীন নিম্ন পেশাজীবি মুসলমানরা হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়। এর ফলে তারা সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের পুরনো ঐতিহ্য বহুলাংশে আকঁড়ে ধরে থাকে। হিন্দুদের মত হস্তরেখা বিশারদদের (নাজুমি) প্রতি আস্থা জ্ঞাপন , মনস্কামনা পুরনের জন্য হিন্দু মৃতদের চিতা ভস্ম ব্যবহার, উৎসবে আতশবাজী পুড়ানো, হিন্দু নাম গ্রহণ, কবরে চেরাগ, বাতি বা পুস্পার্ঘ অর্পণ ও সিজদা প্রদানের মত আচার অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের প্রচলন মুসলিম সমাজে দেখা যায়। ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ মতে,

> "বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানগন পৌত্তলিকতামূলক কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ---- মুসলমানগণ নমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া, নানা প্রকার হিন্দু দেব-দেবীর পূজা অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মনসা পূজা, শীতলাপূজা, ষষ্ঠী পূজা, সত্যপীরের পূজা, কালীর নামে পাঁঠা উৎসর্গ এ সমস্ত কার্য্য মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিশেষরূপে বদ্ধমুল হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্ব্যতীত পীরপূজা, দরগাপূজা, দরগাঘরে নানাবিধ বেদাতী কার্য্য, মহরমের সময় তাজিয়াদারী, জারিগান, গাজীর গীত ইত্যাদি শত শত প্রকার ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। বিবাহ, খৎনা ও স্ত্রীলোকের প্রথম রজস্বলা উপলক্ষ্যে জঘন্য আমোদ প্রমোদ, বাদ্য বাজনা প্রভৃতির বিশেষরূপ অনুষ্ঠান হইত।"[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আকরম খাঁর বিবরণীতেও বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়া কলাপের সর্বস্তরে হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতির প্রভাবের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। তাঁর ভাষায়,

> ''ইহার (হিন্দু প্রভাবের) অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে জলদেবতা বরুণ - পীর বদরে, গৌরচন্দ্র চৈতন্য-গোরাচান্দ পীরে, ওলাই চন্ডী ওলা বিবিতে, সত্য নারায়ণ- সত্য পীরে,, লক্ষ্মী দেবী মা বরকতে রুপান্তরিত হন। তদুপরি এ সমস্ত রূপান্তরিত দেবতা পীর ছাড়াও বহু পীরের কল্পিত কবর, বহু কল্পিত পীরের কবর এবং কোন কোন কবরের সহিত সম্পর্ক রহিত বহু কল্পিত পীর ও মসলমানদের নিকট হইতে পূজা, উৎসর্গএ সিন্নি ও মোমবাতি ইত্যাদি লাভ করিতে থাকেন। অনেক খানকাহ্ ও দরগাহ্ এখানে মুসলমানদের সুখ সমৃদ্ধি এবং বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপলক্ষ্যেরূপে দীর্ঘকাল তাহাদের আল্লাহ্র স্থল দখল করিয়া থাকে এবং আংশিকভাবে অদ্যাবধি সেই স্থান তাহারা দখল করিয়া আছে।''[৩২]

জেমস ওয়াইজের বর্ণনানুসারে সন্তান জন্মকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজের ন্যায় বাঙালী মুসলমান সমাজে নানারূপ আচার পালিত হত। এর মধ্যে রয়েছে চাট্রি তথা প্রসুতির গৃহে অবিরত বাতি জ্বালিয়ে রাখার প্রথা। গ্রীষ্ম কালে ৬ দিন এবং শীতকালে ২১ দিন প্রসুতির গ্রহের দরজায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত। ভূত-প্রেতের আগমন প্রতিহত করাই ছিল গৃহাভ্যন্তরে অবিরত বাতি জ্বালিয়ে রাখার উদ্দেশ্য।[৩৩] সপ্তাহের বিশেষ দিন যেমন বুধ বা বৃহস্পতিবার শিশুর জন্মের জন্য অশুভ বলে বিবেচনা করা হত।

বাংলা সাহিত্য চর্চায় মুসলিম পথিকৃত কবি সাহিত্যিকদের রচনাতেও হিন্দু প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যনীয়। যেমন- মুন্শী শেখ আব্দুর রহিম প্রণীত 'গাজী-কালু-চম্পাবতী' কাব্যে হিন্দু দেবী দূর্গাকে মুসলমান গাজীর মাসী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'জেব্‌ল মূলক শামারুক' কাব্যে হিন্দু দেব-দেবীদের মুসলমান পীরদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কখনো কখনো হিন্দু দেব-দেবীদের আল্লাহ ও নবীর সমমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।[৩৪]

বাউল সঙ্গীত বাংলায় বেশ জনপ্রিয়। সেকালে মুসলমান বাউলদের সঙ্গীত ও রচনায় হিন্দু দেব-দেবীর প্রশস্তি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। তারা হিন্দু দেবী নিরঞ্জনের প্রশংসা করেই তাদের কাব্যের মুখবন্ধ রচনা

Dhaka University Institutional Repository

করছেন। পীর ও মুসলমানদের পবিত্র নগরী মক্কা মদীনার প্রশংসা করতে গিয়ে তারা প্রায়শঃই কাশী, বৃন্দাবন ও হিমালয়ের প্রশস্তি গেয়েছেন। তাদের কেউ কেউ জগন্নাথ, নারায়ন, পদ্মা ও সীতার বন্দনাও রচনা করেছেন।[৩৫]

পারিপার্শ্বিকর্তার প্রভাব এড়ানো খুব কঠিন। এ দেশের হিন্দু সমাজের পাশে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশকারী একটি অন্যতম রীতি হচ্ছে বিধবা বিবাহ বর্জন। বিধবা বিবাহ মহানবী (সাঃ) একটি বড় সুন্নত এবং ক্ষেত্র বিশেষে এটি ওয়াজিব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উনিশ শতকের বাঙালী মুসলিম সমাজে হিন্দুদের অনুকরণে বহুক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ বর্জনের রীতি গৃহীত হয়েছিল। হিন্দুদের বর্ণ প্রথার ন্যায় মুসলিম সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলনও পরিলক্ষিত হয়।[৩৬] উল্লেখ্য যে, যতদিন বাংলায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক অগ্রগতি অব্যাহত ছিল, ততদিন মুসলিম সমাজে প্রতিবেশী ধর্ম সম্প্রদায় সমূহের (বিশেষ করে হিন্দুদের) অনৈসলামিক রীতিনীতি ও আচার আচরণের অনুপ্রবেশ বিশেষভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু পলাশীত্তোর যুগে যখন বাংলায় ইসলামের অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হয় এবং মুসলমানগণ চর্তুদিক থেকে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তখন তারা এ দুরাবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আপন সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করে। ফলে বাঙালী মুসলিম সমাজে ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার আন্দোলেনের সূত্রপাত হয়।

বাঙালী মুসলিম সমাজে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন হাজী শরীয়তউল্লাহ। উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে তিনি বাঙালী মুসলিম সমাজকে তাদের উপরোক্ত ইসলাম ও নৈতিকতা বিরোধী শিরক ও বেদাত পরিহার করে ইসলামের অবশ্য করণীয় (ফরজ) কাজ পালনের আহবান জানান। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তা'ফরায়েযী' আন্দোলন নামে পরিচিত। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারী দুদু মিয়া এ আন্দোলনকে আরো বেগবান করেন। ফরায়েজী আন্দোলন ছাড়াও বাংলায় মুসলিম ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন' (ওয়াহাবী আন্দোলন নামে সমাধিক পরিচিত)। ভারত বর্ষে এ আন্দোলনের প্রবক্তা সৈয়দ আহমদ বেরলভী। তাঁর স্বনামখ্যাত শিষ্য মীর নিসার আলী তিতুমীর। তিতুমীর তাঁর গুরু সৈয়দ আহমদের মত বিশুদ্ধপন্থী ছিলেন। তিনিও ধর্ম এবং সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। তিনি বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায়কে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করার এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করার আহবান জানান। একই সাথে মুসলিম সমাজে প্রচলিত স্থানীয় অনৈসলামিক রীতি, প্রথা, অভ্যাস, আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত পীরভক্তি, সুফী-দরবেশদের মাজার-দরগাহর মানত এং কবরে সিজ্‌দা করা এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশের মাধ্যম হিসেবে গন্য করা ইত্যাদির তীব্র বিরোধীতা করেন। তিনি এসব শিরকী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান।[৩৭]

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ ছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ ও তিতুমীরের যর্থাথ উত্তরসূরী। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে তৎকালীন বাঙালী মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতি তাঁকে পীড়িত ও বিক্ষুব্ধ করে। তিনি ধর্মালোচনা ও লেখনীর মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক রীতি নীতির কবল থেকে মুসলমি সমাজকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। মুসলিম সমাজে হিন্দুরীতি নীতির প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে মেহেরুল্লাহ্‌ লিখেছেন, "আমাদের দেশে সর্দার, জোয়াদ্দার, মৃধা বিশ্বাস, দফাদার, খাঁ, খন্দকার, মৃধা, চাকলাদার এবং মিঞা খেতাবী বহুতর মুসলমান এখনো হিন্দুয়ানীকে ভদ্র এবং মোসলমানীকে অভদ্রতাজনক বলে বিশ্বাস করেন।"[৩৮] মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ মুসলমান সমাজের এরূপ মনোবৃত্তির তীব্রনিন্দা করেছেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনৈসলামিক রীতি-নীতি যেমন-পুজা উৎসবে যোগদান, চৈত্র সংক্রান্তি পালন, দেব-দেবীর নামে মানত, শীতলা দেবী, ওলা বিবির আরাধনা, পীর পূজা, বাউল সঙ্গীতের ন্যায় বিভিন্ন গানবাদ্য চর্চা ইত্যাদির প্রচন্ড বিরোধীতা করেন। তিনি এসব গর্হিত শিরক ও বেদ্‌আতি কাজ হতে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান।'মেহেরুল এছলাম' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, " হে মোসলমানগন ! সামান্য বিপদে পড়িয়া সেই দয়াময় আল্লাহতায়ালাকে ছাড়িয়া কদাছ কোন পীর অলী দেবতার পূজা করিও না।"[৩৯] তিনি পীর,অলী

Dhaka University Institutional Repository

ও দেবতা পূজার ন্যায় শিরক এবং অন্যান্য বিদআতী কর্মকান্ডের বিবরণীর সাথে সাথে এসবের করুণ পরিণতি সম্পর্কে ও মুসলিম সমাজকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন।[৪০]

মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহের অপ্রচলনের বিরুদ্ধেও মুন্‌শী সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার ''গ্রন্থের উপক্রমনিকায় এরূপ ধর্ম বিরোধী নীতি অনুসরণের জন্য তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছেন। 'মেহেরুল্লাহ্ এছলাম' গ্রন্থেও তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত এ কুরেওয়াজের মুলোৎপাঠনের জন্য সকলের প্রতি সোচ্চার আহবান জানিয়েছেন। তিনি মহানবীর একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন,

'জওয়ান আওরত আর বেওয়া যেই পাও।
ইদ্দত পুরিলে তায় শ্রীঘ্র নেকা দাও।।'[৪১]

তিনি যবুতী ও বিধবাদের অবিবাহিত রাখার বিষময় সামাজিক কুফলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেশের বিবেচক মহাত্মাদের প্রতি এরূপ কু-প্রথা দূর করতে এগিয়ে আসারও আহবান জানিয়েছেন। মুন্‌শী তাঁর বক্তৃতানুষ্ঠানেও বিধবা বিবাহের সপক্ষে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন। শেখ হবিবর রহমানের তথ্য মতে, ''তাঁর বক্তৃতা শুনে অনেক বিধবার পূনর্বিবাহ দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ফাঁকা কৌলিন্যোর অসার মোহ ঝেড়ে ফেলে দিতেও কুন্ঠাবোধ করেন নাই।''[৪২]

বর্তমান কালের ন্যায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ সমসাময়িককালেও এদেশের অনেক তথাকথিত মুসলমান হিন্দু সন্নাসীদের আর্দশে ফকির দরবেশ সেজে সমাজে নানা রকম অনাচার সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল চরিত্রভ্রষ্ট, কপট ও ভন্ড। এরা নামাজ রোজাসহ শরীয়তের অবশ্য প্রতিপালনীয় কার্যসমূহের কিছুই করত না। এদের অনেকেই এমনি অধঃপতিত ছিল যে, পাপালিক, অঘোরপন্থী ইত্যাদি হিন্দু সন্নাসীদের অনুকরণে তারা নানা গর্হিত কাজেও দ্বিধাবোধ করত না। এ শ্রেণীর ফকিরগণ সাধারণতঃ 'ন্যাড়ার ফকি'র' নামে পরিচিত ছিল। এসব ফকি'রদের প্রচারনায় মোহাবিষ্ট হয়ে হাজার হাজার লোক বিপদগামী হয়ে পড়েছিল। ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

''সাধু জমাতভুক্ত লোকগুলি নমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ন বিরুদ্ধাচারী। ইহারা নমাজ, রোজা প্রভৃতি কার্য্যকে বাহুল্য মনে করে, এবং লোকগিদকে ঐরূপে বিপথে লইবার চেষ্ঠা করে।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখিতেছি এই "ফকীর মতাবলম্বী" লোকগুলি পবিত্র ধর্ম্মের জ্যোতিঃ দিন দিনই বিনষ্ট করিতেছি।"[৪৩]

ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় অন্যত্র এদেরকে ইসলাম ধর্মের বড় শত্রু বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, বিধর্মীগণ ইসলামের যে ক্ষতি করতে না পারে তারা এর চেয়ে শতগুন বেশী ক্ষতি করেছে।[৪৪]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এরূপ কপট ন্যাড়ার ফকীরদের তীব্র বিরোধীতা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় তাদের ভন্ডমীর চিত্র তুলে ধরে সরলমনা মুসলমানদের এদের সঙ্গ ত্যাগের আহবান জানান। তিনি 'মেহেরুল এছলাম' গ্রন্থে ন্যাড়ার ফকিরদের কর্মকান্ড ও পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। মুন্শীর বক্তৃতা ও লেখনীর ফলে মুসলিম সমাজ যেমন এরূপ তথাকথিত ফকির-দরবেশদের আনুগত্য ত্যাগ করে, তেমনি শত শত উচ্ছশৃঙ্খল ন্যাড়ার ফকির তাঁর নিকট তওবা করে গোমরাহী ত্যাগ ও খাঁটি চরিত্রবান মুসলমানে পরিণত হয়েছিল।[৪৫]

গান-বাজনা ও গাইন-বাউলদের বিরুদ্ধেও মুন্সী মেহেরুল্লাহ্'র প্রতিবাদী অবস্থান লক্ষ্যনীয়। 'মেহেরুল এছলাম' গ্রন্থে এক বড়মিঞার নকল' নামক কবিতায় তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত গান-বাজনার নিন্দাবাদ করেছেন। এবং এসব যে পারলৌকিক জীবনে কোন কাজে আসবে না তা স্মরণ করিয়া দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গাইন বাউলদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন- "হে গাইনগন। তোমরা নিজেও ডুবিলে, পরকেও ডুবাইলে। তোমাদের নিজের গান মৃত্যুকালে কোন কাজে আসবে না।"[৪৬]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের বাঙালী মুসলিম সমাজে প্রতিবেশী হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক রীতির যে কুপ্রভাব পড়ে ছিল, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এ ব্যাপারে সোচ্ছার ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতা ও লেখনির মাধ্যমে মুসলিম সমাজ হতে এসব কু প্রভাব দূর করে সামাজিক পূনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

তথ্য-সূত্র

১. মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন, মেহের চরিত, গাড়া ভোব,নদীয়া, ১৩১৫, পৃঃ পৃঃ ৪২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

২. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কর্ম্মবীর মুন্সী মেহেরউল্লা, কলিকাতা, ১৯৩৪, পৃঃ ২০।

৩. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, মেহেরুল এছলাম, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ রচনাবলী, ১ম খন্ড, নাসির হেলাল (সম্পাদিত), ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ১৭৩।

৪. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্,মানব জীবনের কর্তব্য, মেহেরুল্লাহ্ রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪১।

৫. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩।

৬. ঐ, পৃঃ পৃঃ ১১২-১১৩।

৭. নাসরিন মুস্তাফা, জাতির ধ্রুব নক্ষত্র, প্রেক্ষণ, মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ স্মরণ সংখ্যা, সম্পাঃ খন্দকার আবদুল মোমেন , ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ১৯৬।

৮. Sushi Kumar De, A History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, Calcutta, 1919, Chapter II. দ্রঃ আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরুদ্দীন, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৭, পৃঃ ৭৭।

৯. J. W. Kaye, Christianity in India, London, 1859, p.p. 87-95.

১০. Muhammad Mohar Ali, The Bengali Reaction To Christian Missionary Activities, 1833-1857. Chittagong, 1965, p. 2, সুখময় সেনগুপ্ত, বঙ্গদেশ ইংরেজী শিক্ষাঃ বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা, কলিকাতা ১৯৮৫, পৃঃ ১২।

১১. J.N.Farquhar, Modern Religious Movements in India, London, 1924, p.p. 8-9

১২. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯।

১৩. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ পৃঃ ৫৬-৫৭।

১৪. মোহাম্মদ শাহ্, বাঙালী জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, ২য় খন্ড, সম্পাঃ সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৭২৮।

১৫. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ প্রঃ ২৯-৩০।

১৬. Muhammad Mohar Ali, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২।

১৮. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।

১৯. ঐ, পৃঃ ২৭।

২০. ইসলাম প্রচারক, সূচনা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৮, উদ্ধৃতি, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ইসলাম প্রচারক, সাহিত্য পত্রিকা, গ্রীস্ম সংখ্যা, ১৩৭৬, পৃঃ ৩১।

২১. ইসলাম প্রচারক, সূচনা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১২৯৮।

২২. মুন্‌শী মনিরুদ্দীন আহমদ, আখলাকে জমিরিয়া ও রদ্দে নাছারা, কলিকাতা, ১৩০৮, পৃঃ ২।

২৩. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১।

২৪. ঐ, পৃঃ ৮০।

২৫. ইসলাম প্রচারক, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১২৯৮।

২৬. উদ্ধৃতি, মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৯।

২৭. ইসলাম প্রচারক, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১২৯৮।

২৮. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭।

২৯. মুঈনুদ্দীন আহমেদ খান, মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪৪।

৩০. মোহাম্মদ শাহ্, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১৪।

৩১. ইসলাম প্রচারক, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১২৯৯।

৩২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ৮৫।

৩৩. উদ্ধৃতি, Dr. Muin-ud-din Ahmad Khan, History of the Faraidi Movement, Dhaka, 1984, p. 101।

৩৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩।

৩৫. ঐ, পৃঃ ৮৫।

৩৬. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. ঐ, পৃঃ ২৫০।

৩৮. মুন্সী মেহেরুল্লাহ্, মেহেরুল এছলাম, পাদটীকা, রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩৮।

৩৯. ঐ, পৃঃ ২১৭।

৪০. ঐ, পৃঃ পৃঃ ১৭৭-৭৯।

৪১. ঐ, পৃঃ ২৫৫।

৪২. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭।

৪৩. ইসলাম প্রচারক, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন, ১২৯৮।

৪৪. ইসলাম প্রচারক , সূচনা সম্পাদকীয়, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১২৯৮।

৪৫. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ পৃঃ ৪৭-৯৯, ১০০।

৪৬. মুন্সী মেহেরুল্লাহ্, মেহেরুল এছলাম, রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন তৎকালীন বাংলার অন্যতম প্রধান ধর্ম প্রচারক, সমাজ সেবক ও সংস্কারক। বলা বাহুল্য যে, ধর্মীয় চেতনাকেন্দ্র করেই মুন্সীর জীবন আবর্তিত হয়েছে। তবে তাঁর ধর্ম ভাবনা ও চর্চার কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ছিল। বস্তুত তিনি নিছক পারলৌকিকপরিত্রানের আশায় ধর্ম চর্চা করেননি। ধর্ম শাস্ত্র তাঁর কাছে নিস্প্রান পুঁথি ছিলনা। তিনি ধর্ম চর্চাকে গভীর অর্থে জীবন চর্চার সাথে মেলাতে চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁর ধর্ম ধারনা, জীবন বোধ ও সমাজ হিতকামনা একই কেন্দ্র বিন্দুতে এসে মিশে ছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, স্বচ্ছ ও সাবলীল ধর্ম জীবন অনুশীলনের জন্য ধর্মীয় ও সামাজিক অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করা একান্ত আবশাক। এ উপলব্দী থেকেই ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। আর এ আন্দলনকে ফলপ্রসু করার জন্য তিনি সাংগঠনিক উদ্যোগ, বক্তৃতা ও লেখনীকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন।

৪.১ঃ সাংগঠনিক উদ্যোগ

ধর্ম প্রচার এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে অবতীর্ন হয়ে মুন্সী মেহেরুল্লাহ অনুধাবন করেন যে, শুধু খ্রীষ্টানপাদ্রীদের বক্তৃতার জবাবে বক্তৃতা, বা সাধারণ ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে স্থায়ী ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন খ্রীষ্টানদের অনুরূপ মিশন বা সমিতি স্থাপন করে সংগঠিত উপায়ে কার্যক্রম পরিচালনা। উল্লেখ্য যে, এ সময় মুসলমানদের মধ্যে সভা সমিতি যে একেবারে ছিল না, তা নয়। বাংলার নব্য শিক্ষিত অভিজাত মুসলমানদের চেষ্টায় এসময় কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩) এবং 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনে'র কথা বলা যেতে পারে তবে এ সবগুলো ছিল কলিকাতা কেন্দ্রিক। তদুপরি এসব সভা সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হত উর্দু, ইংরেজী এবং ফারসী ভাষায়। এসব সংগঠনের সভায়, বক্তৃতায়, প্রচার-পত্র, কার্য-বিবরণী ও স্মারক

Dhaka University Institutional Repository

পত্রের কোথাও বাংলা ভাষার ব্যাবহার হতনা। ফলে এগুলোর কার্যক্রমের সাথে সাধারণ মানুষের সংযোগ ঘটেনি। বস্তুত এসব সভা সমিতি নব্য শিক্ষিত উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর আখড়ার পরিণত হয়। এ বিষয়টি মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌কে ব্যথিত করে। তিনি অনুধাবন করেন যে, খ্রীষ্টান মিশনারীদের অবপ্রচারের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের সতর্ক করতে হবে, তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে কুসংস্কারমুক্ত করতে হবে, তদুপরি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে তাদের চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন এমনি কিছু সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা যেগুলো অবহেলিত ও অল্প শিক্ষিত মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করেন। এ পর্যায়ে তিনি নিজ উদ্যোগে কিছু সংগঠন গড়ে তোলেন এবং পূর্বক্তো উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত গড়ে উঠা কিছু সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এরূপ কিছু সংগঠন এবং এর সাথে মুন্সীর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা

'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত প্রথম সংগঠন। এটি খুব সম্ভবত ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের আগে কোন এক মাসে গঠন করা হয়েছিল।[১] এটি প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার। সংগঠনের নামকরণ হতে এরূপ ধারণা করা যায়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র নীতি এবং তদুপরি শেখ জমিরুউদ্দীন রচিত 'মেহের-চরিত' গ্রন্থেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময় যশোর ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গিয়েছিল। তখন মুন্সী মেহেরুল্লাহ তাঁর কতিপয় সহযোগীকে নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারে অবতীর্ণ হন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, শুধু খ্রিষ্টান পাদ্রীদের বক্তৃতার জবাবে বক্তৃতা নয়, খ্রিষ্টান মিশনের অনুরূপ মিশন বা সমিতি স্থাপন করে সংগঠিত পায়ে প্রচারকার্য পরিচালনা করা উচিত।

এ লক্ষ্যেই তিনি 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' স্থাপন করেন।[২] শেখ জমিরুদ্দিনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ সংগঠনের একটি বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষ্যে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র আমন্ত্রনে কলকাতার মৌলভী মেয়ারাজুদ্দীন আহমেদ, মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ ও মুন্‌শী শেখ আবদুর রহিম

যশোহরে এসেছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে যশোহরের ঘোব গ্রামের খ্যাতনামা রইস সৈয়দ আবদুল্লাহর বাসভবনে এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভার এক বিরাট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৩] উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ২৩ শে কার্তিক বাংলা ১২৯৬ (৮ নভেম্বর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ) সালে উপর্যুক্ত পন্ডিতদের প্রচেষ্টায় এবং করটিয়ার জমিদার মাহমূদ আলী খান পন্নী ও বর্ধমানের কুসুম গ্রামের জমিদার মোহাম্মদ আলী নওয়াব চৌধুরীর আর্থিক আনুকুল্যে কলিকাতা হতে সাপ্তাহিক 'সুধাকর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র।[৪] এসলাম ধর্মোত্তোজিকা সভার বিশেষ অধিবেশনে বহুসংখ্যক মুসলমান সুধাকরের গ্রাহক হয়েছিলেন বলে শেখ জমিরুউদ্দীন উল্লেখ করেছেন।

১৮৮৯ সালে মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৭-৯২) 'গো-জীবন' নামক একটি প্রবন্ধ পুস্তক রচনা করেন। গো-হত্যা নিয়ে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে বিবাদ চলছিল তারই প্রেক্ষাপটে তিনি 'গো-জীবন' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। মীর মশারফ হোসেনের এ গ্রন্থটি মুসলিম সমাজে সমালোচনার ঝড় তুলে। মুসলমানদের মধ্য থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ উঠে। গোঁড়া মুসলমানগন মীর মশারফ হোসেনকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেন। সুধাকর' পত্রিকা মীর মশারফ হোসেনের গ্রন্থের প্রতিবাদে জনমত সংগঠনে ভূমিকা পালন করে। মুসলমানদের মধ্যকার বাদ-প্রতিবাদ শেষে আদালত পর্যন্ত গড়ায়। করটিয়া হতে প্রকাশিত সাময়িকপত্র 'আখবারে ইসলামীয়া' সম্পাদক মৌলভী মোহাম্মদ নইমুদ্দীন (১৮৩২-১৯০৮) তাঁর নিজ পত্রিকায় মীর মশারফ হোসেনকে 'কাফের' এবং তাঁর 'স্ত্রী হারাম' বলে ফতোয়া দেন।[৫] এতে মশারফ হোসেন টাঙ্গাইল মুন্সেফ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। পন্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ মাশহাদী এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রমূখ নঈমুদ্দীনকে সমর্থন দেন। এ মামলার বিষয়ে সুধাকর পত্রিকায়ও একাধিক ক্রোড়পত্র ছাপা হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ নইমুদ্দীন আহমদকে সমর্থন করেন। নইমুদ্দিনকে মামলার ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে সহায়তার জন্যমেহেরুল্লাহ্ উদ্যোগে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভার' পক্ষ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়েছিল।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র উদ্যোগে গঠিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি'। সমিতিটি প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট সন তারিখ জানা যায় না। শেখ হবিবর রহমান তাঁর গ্রন্থে এরূপ একটি মহতি প্রতিষ্ঠান এবং এর প্রতিষ্ঠায় মেহেরুল্লাহ্‌র অবদান সম্পর্কে একেবারেই উল্লেখ করেন নি। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, শাহাদত আলী আনসারী এবং মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেও সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার সন তারিখ উল্লেখ করেননি।[৭] জানা যায় যে, কর্মোপলক্ষ্যে মেহেরুল্লাহ্‌ একবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন। এখানে তিনি বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ এবং সাময়িকী পাঠের সুযোগ পান। এতে তিনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষন করতে সক্ষম হন। এ সময় তাঁর মনে খ্রীষ্টান ধর্মের অসারত এবং দুর্বল দিকগুলো প্রতিভাত হয়ে ওঠে। যশোরে ফিরে এসে তিনি যখন খ্রিষ্টান মিশনারীদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতা দেখতে পান, তখন তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য কলকাতায় যান। কলকাতায় তাঁর সাথে 'মিহির' পত্রিকা সম্পাদক মুন্সী রেয়াজদ্দীন আহম্মদ, 'সুধাকর' সম্পাদক মুন্সী আব্দুর রহিম, মুন্সী মেয়ারাজউদ্দিন আহম্মদ প্রমুখ আলেম ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিদের মুসলমানদের দুরাবস্থা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে করণীয় স্থির করার উদ্দেশ্যে কলকাতা নাখোদা মসজিদে একটি সভা আহবান করা হয়। সভায় খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দার ও খান বাহাদুর নূর মোহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ বিশেষ সহায়তা করেন। এ সভায় ইসলাম ও মুসলমানদের দুরাবস্থা সম্পর্কে আলোচনাক্রমে'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি'নামক একটি সংস্থা গঠন করা হয়। তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের আর্দশ প্রচার করা ছিল এ সংস্থা গঠনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। নবগঠিত সমিতির উদ্যোক্তাগন বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র উপর। মেহেরুল্লাহ্‌ সানন্দচিত্তে এ গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ফুরপুরা শরীফের পীর প্রখ্যাত সাধক আবু বকর (রাঃ) তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণীত করেন।[৮]

প্রচার সমিতি কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্তির পর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বাংলা এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর শুরু করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি দেশে বিপুল সাড়া জাগাতে

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হন। এ সময় থেকেই খ্রীষ্টান মিশনারীদের সাথে তাঁর বাহাস চলতে থাকে এবং তাদের প্রচার কার্যক্রমও প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হয়।[৯]

আঞ্জুমানে নুরুল ইসলাম

'আঞ্জুমানে নূরুল ইসলাম' এটি শিক্ষামুলক সংগঠন। ১৩০৯ সালে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় 'আঞ্জুমানে নূরুল ইসলাম' নামে একটি পত্র প্রকাশিত হয়।[১০] এ পত্রে উল্লেখিত তথ্যানুযায়ী ডাঃ মাহতাবউদ্দিন নামক জনৈক বিদ্যোৎসাহী ১৩০৬ সালে (১৮৯৯ খ্রীঃ) যশোহরের মনোহরপুরে 'শুভকরী' নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এর নামকরণ করা হয় 'প্রভাকর'।[১১] সুধাকর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে, ১৩০৯ সালে সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সে সময়কার যশোহরের ডিস্ট্রিক সেসন জজ সৈয়দ নূরুল হুদার যশোহর অবস্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য উক্ত প্রভাকর সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'আঞ্জুমানে নূরুল ইসলাম' রাখা হয়।[১২] মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এ সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

আঞ্জুমানে নূরুল ইসলামের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল মনোহরপুরে একটি 'নিম্ন প্রাথমিক স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা। অল্পদিন পরেই এটিকে মধ্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত করে প্রভাকর নাম দেওয়া হয়। মেহেরুল্লাহ্‌র প্রচেষ্টায় এর সঙ্গে একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৩০৭ সালে অনুষ্ঠিত সমিতির প্রথম বার্ষিক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলীর নামানুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'মাদ্রাসা-ই-কারমতিয়া।'[১৩] মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ মাদ্রাসার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৩০৮ সালে অনুষ্ঠিত সমিতির ২য় বার্ষিক অধিবেশন এডঃ খোন্দকার তোফেলউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মৌলভী আব্দুর করিম, মুন্‌শী কাশেম আলীসহ বহু গন্যমান্য হিন্দু-মুসলমান যোগদান করেন। এ সভায় মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ শিক্ষাভাবে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অবনতি এবং সেই সাথে শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে একটি উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দেন। এতে সমিতি ও মাদ্রাসার একজন উদ্যোগী সদস্য জাহাঁ বখ্‌শ মাদ্রাসার গৃহ নির্মাণের জন্য দেড় বিঘা জমি দান করেন।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

'আঞ্জুমানে নুরুল ইসলাম' একটি শিক্ষামুলক সংগঠন হলেও স্ব-সমাজের স্বার্থের দিকেও এর বিশেষ নজর ছিল। ১৩০৯ সালে সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যশোহর ডিষ্ট্রিক বোর্ড বে আইনীভাবে মুসলমান স্কুল ইন্সপেক্টরের শূন্যপদে এন্ট্রান্স ফেল হিন্দুলোক নিয়োগ করায় অধিবেশনে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এতে সমিতির পক্ষ থেকে কমিশনার ও ডিরেক্টর বরাবরে অভিযোগ দায়েরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রস্তাবটি শিঘ্রই কার্যকর করা হয় । পরে কমিশনার এ ব্যাপারে ডিস্ট্রিক বোর্ডকে কৈফিয়ত তলব করে এবং অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করে।[১৫] উক্ত অধিবেশনে সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের রাস্তাঘাটের উন্নয়নসাধন ও নিকটবর্তী নদী খাল পারাপারের জন্য সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয়। সমিতির এরূপ দাবী দাওয়াতে এর সভ্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।[১৬]

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যশোহরের তৎকালীন জেলা জজ জনাব নূরুল হুদা মাদ্রাসা-ই-কারামতিয়ার একজন পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। মাদ্রাসার সেক্রেটারী মুন্সী মেহেরুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেছেন-

> "এই উদারচেতা, স্বধর্মরত, সর্বজন প্রিয়, সুক্ষ্মদর্শী ও সুবিচারক জজ বাহাদুর (সৈয়দ নূরুল হুদা) যশোহরে থাকাকালীন মাদ্রাসার দরিদ্র সেক্রেটারীকে (মেহেরুল্লাহ্) সুমধুর ভাষায় 'ইসলাম মিশন স্থাপন ' ও মাদ্রাসা-ই-কারামতিয়ার উন্নতি বিধান করিতে উৎসাহ প্রদান পূর্বক স্বয়ং সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার যশোহর আগমনের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ নূরুল হুদা নামের সংস্পৃষ্টে আমরা 'নূরুল ইসলাম সমিতি' 'নূরুল ইসলাম মিশন' ও 'নূরুল ইলাম পত্রিকা'র সূত্রপাত করিলাম।"[১৭]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ বর্ণিত উর্পযুক্ত দুটি প্রতিষ্ঠান ও একটি পত্রিকার মধ্যে 'নূরুল ইসলাম' সমিতি সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। মেহেরুল্লাহ্র বর্ননা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ইসলাম মিশন' একটি পৃথক সংগঠন। কিন্তু এর উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না।

মেহেরুল্লাহ্র নিজের উক্তি থেকে জানা যায় যে, তারা 'নূরুল ইসলাম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। নাসির হেলাল তাঁর সম্পাদিত 'মুনসী মেহেরুল্লাহ্ রচনাবলী' প্রথম খন্ডে উল্লেখ করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

যে, প্রখ্যাত সাহিত্য গবেষক, সমালোচক, কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জানিয়েছেন যে, 'নূরুল ইসলাম' নামে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। কিন্তু নূরুল ইসলাম নামে আদৌ কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার মত কোন তথ্য উপাত্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। মুহম্মদ আবু তালিব এর বর্ননা থেকে জানা যায় যে, 'নুরুল ইসলাম' প্রকৃতপক্ষে কোন পত্রিকা নয়। তাঁর ভাষায়,"নূরুল এসলাম মানে ইসলামের আলো, এ থেকে কেউ মনে করতে পারেন বোধহয় ইসলাম বিষয়ক কোন বই বুঝি। সমকালীন কেন, সকল কালে সকল দেশেই ইসলাম সংক্রান্ত গ্রন্থাদির এরূপ নামকরণ করা হয়ে থাকে।"[১৬] আবু তালিব এরূপ নামকরণ বিষয়ে বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। তবে আমাদের আলোচ্য নূরুল ইসলাম যে ইসলামী গ্রন্থ নয় এ ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ। তাঁর মতে, নূরুল ইসলাম হল মাদ্রাসা-ই-কারামাতিয়ার ইতিবৃত্ত। মাদ্রাসার দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদনটিই ১৩০৮ সালে (১৯০১ খৃঃ) নূরুল ইসলাম নামে প্রকাশিত হয়। যশোর অন্নপূর্না প্রেসে শ্রী অমৃতলাল রায় কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়।[১৭] উল্লেখ্য যে, সে সময় যশোহরের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কার্য-বিবরণী মুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ 'যশোর হিন্দু ধর্ম রক্ষিনী সভা'র বার্ষিক কার্য-বিবরণীর কথা উল্লেখ করা যায়। ১৮৮৭ বিনয় পত্রিকায় এর বার্ষিক কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ ছিলেন কারামাতিয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারী । ফলে তাঁর উপরই সম্ভবত এর কার্য-বিবরণী তৈরী ও প্রকাশের দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং তিনি তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনায় যে সমিতিটি যুগ সন্ধিক্ষনের সাক্ষী হয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে, সেটি হল 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি'। হাবিবুল্লাহ বাহার রচিত 'সাহিত্য সমিতির ইতিহাস' নামক একটি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৮৯৯ খৃঃ) এ সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯] শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের 'জাতীয় ফেরারী' কাব্য গ্রন্থেও (১৩১৯) বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের কথা বলা হয়েছে। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন এ সমিতির একজন কৃতি সংগঠক ও সদস্য। কলকাতার এন্টনি বাগানিস্থিত

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী আব্দুর রহমান খা'র বাড়ীতে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে শেখ আব্দুর রহিম, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ, কবি মোজাম্মেল হক, মওলানা আকরাম খাঁ, শেখ জমিরউদ্দিন, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ শতাধিক মুসলিম সাহিত্যিক এক সভায় মিলিত হন। শেখ আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' গঠন করা হয়। ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সমিতির সভাপতি এবং শেখ আব্দুর রহিম সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২১] সে সময় হিন্দু লেখকদের রচিত ইতিহাস, কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও অন্যান্য রচনায় কোন কোন ঐতিহাসিক মুসলিম চরিত্র কলঙ্কিত ও হীনবীর্য করে চিত্রিত করার যে প্রবণতা শুরু হয়েছিল, সেগুলোর প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে এ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২২] 'The Moslem Chronicle' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকেও এরূপ ধারণা পাওয়া যায়।[২৩] উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ১৮৬৩ সালে নবাব আব্দুল লতিফ 'Mohammedan Literary Society' নামক একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। কিন্তু এতে বাংলা ভাষার চর্চা হত না। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই বাংলা ভাষা সম্পর্কে বাঙালী মুসলমানদের মনোভাব পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ডক্টর ওয়াকিল আহমদের মতে, বাংলার মুসলামান সাহিত্যিকগণ খুব সম্ভবত সোসাইটির কার্যের প্রতিক্রিয়া থেকেই আত্মিক প্রেরণাবশেই বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি স্থাপন করেন।[২৪]

'The Moslem Chronicle' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, এ সমিতি বাংলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশে মুসলমান লেখকদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করত। সমিতির তত্বাবধানে বেশ কয়েকটি বাংলা পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩১১ সালে সমিতির এক সভায় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলার মুসলমানদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে রচিত শ্রেষ্ঠ বাংলা প্রবন্ধের জন্য স্বর্ন পদক উপহার দেবার ঘোষনা দেন।[২৫] টেক্সট বুক কমিটিতে মুসলমান সদস্য অর্ন্তভুক্তকরণ বিষয়েও এ সমিতির পক্ষ থেকে জোরালো ভূমিকা পালন করা হয়েছিল। আর্টস্কুল ও ভেটেনারী কলেজের দু'জন মুসলমান ছাত্রকেও সমিতির খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। The Moslem Chronicle এ প্রকাশিত নিবন্ধ মতে, "স্বদেশ, স্বজাতি, স্ব-ভাষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি জাতীয় আকাংখাকে প্রথম সাংগঠনিক ভিত্তি দিয়েছিল।"[২৬] সমিতির এসব কৃতিত্বের সাথে এর অন্যতম সংগঠক মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র কৃতিত্বও জড়িত ছিল। উল্লেখ্য যে, ১২ বছর সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালনের পর এ সমিতির 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে' বিলয় ঘটে।

মাদ্রাসা-ই-কারামতিয়া

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দারিদ্র জনিত কারণে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ উচ্চ শিক্ষা লাভে ব্যর্থ হন। তবে তাঁর দুর্দম জ্ঞানস্পৃহার কারণে তিনি আজীবন বিদ্যাচর্চা করেছেন। লোকশিক্ষা প্রসারেও তাঁর অবদান অপরিসীম। দেশের ও সমাজের কল্যান এবং জাতীয় উন্নতির জন্য শিক্ষার অপরিহার্যতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত মুসলমান সমাজের জাগরণ সম্ভব নয়। এজন্য তিনি দেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে জনসাধারণকে উদ্দীপনাময় ভাষায় উপদেশ দিতেন। মুস্তাফা নূরউল ইসলামের তথ্য মতে, বাংলা আসামের যে অসংখ্য সভায় তিনি বক্তৃতা করেন, তাতে মুসলমানদের স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা স্থাপনের উপর সর্বত্রই তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন।[২৭] মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনীকার শেখ হবিবর রহমান বলেছেন, "মুন্‌শী সাহেব শুধু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রকৃত কর্মীর মত তিন নিজ পরিচালনাধীনে তাঁহার বাটীর পার্শ্বে মনোহরপুর নামক স্থানে "মাদ্রাসায়ে কারামতিয়া" নামক একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।"[২৮] ১৮৯৯ সালে মনোহরপুরে ডাক্তার মাহতাব উদ্দিন 'আঞ্জুমান -ই-নুরুল ইসলাম' নামক একটি শিক্ষামুলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ ছিলেন এ সংগঠনের উদ্যোক্তা সংগঠক । ওয়াকিল আহমদ এর বিবরণ অনুযায়ী,পূর্বোক্ত সংগঠনের উদ্যোগে মনোহরপুরে একটি 'নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে এটি মধ্য ইংরেজী স্কুলে রূপান্তিরিত হয়। এ স্কুলের সাথে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আলীয় মাদ্রাসার ক্লাস খোলা হয়েছিল। ১৩০৭ সালে সংগঠনের প্রথম অধিবেশনে সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলীর নামানুসারে মাদ্রাসাটির নামকরণ করা হয় 'মাদ্রাসা-ই-কারামতিয়া' মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌ মাদ্রাসার সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।[২৯] শেখ হবিবর রহমান ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌কেই মাদ্রাসা কারমতিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা কারামতিয়ার দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন 'নূরুল ইসলাম' নামে প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবেদন মতে, মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠা কাল ১৩০৭ (১৯০১ খ্রিঃ) সাল।[৩১] মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মেহেরুল্লাহকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। এর জন্য তিনি নিজের থেকেও বহু অর্থ ব্যয় করেন। ১৩০৮ সালের ২০ শে আশ্বিন মাদ্রাসার একটি স্থায়ী গৃহ নির্মাণের জন্য একটি সভা যশোহরের উকিল মৌলভী তোফেলউদ্দিন খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। 'নূরুল ইসলাম' প্রতিবেদন মতে, "খড়কী নিবাসী আবেদ ও কামেল মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত মৌলভী মহাম্মদ আব্দুল করিম সাহেব বহু কষ্টে সভায় উপস্থিত হইয়া সাধারনের উৎসাহবর্ধন করিয়াছিলেন।" প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে,

> "ঘুরুলিয়া নিবাসী মুন্সী মহাম্মদ কাছেম সাহেব ও মুন্সী নাসিরদ্দিন সাহেব ও মান্যবর সভাপতি সাহেব দ্বয়ের বক্তৃতায় উৎসাহী ইহয়া সভ্যমন্ডলী অতি আগ্রহের সহিত চাঁদার খাতায় নাম লিখিয়া দেন।"[৩২]

এ সভায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ নিজেও শিক্ষাভাবে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অবনতি, শিক্ষার উপকারিতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। মাদ্রাসার অন্যতম উদ্যোগী জাঁহা বখশ মাদ্রাসার গৃহ নির্মাণের জন্য দেড় বিঘা জমি দান করেছিলেন।[৩৩] মাদ্রাসার দু'জন উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খুলনা জেলার ধামালিয়ার ভিখু সর্দ্দার ও তাঁর পুত্র আহাদ আলী সর্দারের নাম জানা যায়। আহাদ আলী সর্দার ছিলেন মাদ্রাসার সর্বোচ্চ চাঁদা দাতাদের অন্যতম। জনৈক নাসিরদ্দীন মাদ্রাসার জন্য ২৫/ পঁচিশ টাকা দান করেছিলেন। আবু তালিব বলেছেন যে, পঁচিশ টাকাই ছিল সর্বোচ্চ চাঁদা। তবে নূরউল ইসলাম থেকে জানা যায় যে, আহাদ আলী সর্দার ত্রিশ টাকা মুল্যের একটি দুর্লভ কিতাব মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে দান করেছিলেন।[৩৪]

মুন্সীর চেষ্টায় মাদ্রাসার একটি সাধারণ গৃহ নির্মিত হয়। এতে একটি পাকা দেওয়াল তৈরী এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন ছিল। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এ অর্থের জন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট সহায়তার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়,

> "এই বিশাল বঙ্গদেশে এখনও অসংখ্য উদার হৃদয় ধনবান হিন্দু মুসলমান বিদ্যমান আছেন। মাদ্রাসায়ে কারামতিয়ার টুল-টেবিল, বেঞ্চ ও পাকা দেয়াল ইত্যাদির জন্য ১০০০/ টাকা দরকার। আমরা এই টাকাগুলির জন্য প্রত্যেক হিন্দু মুসলমান মহাত্মাগনের দ্বারে দ্বারে প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের এই কাতর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রন্দন ও মর্মস্পর্শী চিৎকার কোন উদারচেতা হৃদয়বান মহাপুরুষের কর্নে কি পৌছিবে না? হে বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান ধনবানগন, আমাদের এই কাঙ্গাল ও দরিদ্র মাদ্রাসা স্কুলের প্রতি একবার স্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। আমরা বঙ্গের প্রতি নগরে ও পল্লীতে প্রাণ ভরিয়া তোমাদের জয় ও গৌরবগান গাহিয়া সুখী হই।"[৩৫]

সে সময় বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান সমাজ মুন্সীর উর্পযুক্ত আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রার্থিত এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিল কি-না জানা যায় না। প্রথম প্রথম মাদ্রাসাটি বিশেষ অর্থ কষ্টের মধ্যে পড়ে। মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজন হত মাসিক ৩০/৪০ টাকা।[৩৬] মাদ্রাসার দুই বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে জানা যায় যে, প্রায় প্রতিমাসেই মুন্সী সাহেবকে নিজ তহবিল থেকে সিংহভাগ অর্থ বায় করতে হত। তিনি এ টাকা ব্যক্তিগত ঋণ হিসাবে দান করতেন। তবে মহান শিক্ষা ব্রতী মুন্সী এ টাকা আর ফেরৎ নেননি।

মাদ্রাসার ছাত্র-সংগ্রহেও মুন্সী মেহেররুল্লাহ্ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ছাত্র সংগ্রহ করেছেন। বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্রদের জায়গীরের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি নিজের বাড়ীতেও একাধিক ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ছাত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ মানুষকে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, এ যশোর জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যা দ্বিগুন। কিন্তু শতকরা পাঁচজন মুসলমানও লেখাপড়া জানে না। শিক্ষার অভাবই তাদেরকে নীতিজ্ঞানহীন ও ধর্মসম্বন্ধে অজ্ঞ করে রেখেছে। নীতিজ্ঞানহীন মানুষ না করতে পারে এমন পাপ নেই। বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনা ছাড়া মুসলমানদের উন্নতি হবে না। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানরা অশিক্ষিত তাই ধুর্ত ও দুষ্ট মহাজন, নায়েব, গোমস্তা, বরকন্দাজ, মালী এবং অত্যাচারী জমিদারগণ তাদেরকে সহজে ঠকাতে পারে এবং তাদের পরিশ্রমলব্ধ ফসল ফাঁকি দিয়ে নিতে পারে। তাছাড়া তারা মুখর্তাবশতঃ কৃষি কাজের উন্নতি করতে পারে না। তারা সারা দিন রাত পরিশ্রম করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে অনাহারে দিন কাটায়। তাদের সন্তান যদি কিছু বিদ্যা শিক্ষা করতে পারে, তাহলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ফলে তৎকালীন বাংলার মুসলমান সমাজ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে উদাসীন ছিল। এমনকি মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহারেও তাদের আগ্রহ ছিল না। স্বল্প শিক্ষিত গোঁড়া মুন্‌শী-মৌলভীরা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করতেন। এমনকি তা মুখে উচ্চারণ করাকেও অপমানজনক মনে করতেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ইংরেজী ভাষা ভালরূপে জানতেন না। তবে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার কারণে তিনি ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধী করেছিলেন। এজন্যই তিনি মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারে সচেষ্ট হন। মাদ্রাসা কারামতিয়ার সঙ্গে তিনি পরে মধ্য ইংরেজী স্কুলও সংযুক্ত করেছিলেন।[৩৮] মাতৃভাষা বাংলার প্রতিও ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। এজন্যই তিনি ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী মোল্লা মৌলভীদের কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ করেন এবং এর ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করেন।[৩৯] মেহেরুল্লাহ্ তাঁর মাদ্রাসা সংলগ্ন মধ্য বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তাঁর নিজের বাংলা পাঠ ছিল 'বাধদয়' পর্যন্তই। নিজে সুযোগের অভাবে যে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন দেশবাসীর জন্য সে শিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে তিনি মাহত্ম্যের পরিচয় দিয়েছিলেন বলে মনে করা যায়। শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন "স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রগণ যাহাতে বক্তৃতা ও তর্কশক্তি আয়ত্ত্ব করিতে পারে, তিনি তাহার ব্যবস্থা করেন। তাহারা যাহাতে ভবিষ্যত জীবনে কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য তাহার চেষ্টার অন্ত ছিল না।"[৪০] বলা বাহুল্য যে, শিক্ষা বিস্তারে এরূপ মনোবৃত্তি তৎকালীন বাংলায় নিতান্তই দুর্লভ ছিল।

প্রসঙ্গঁত উল্লেখ্য যে, মাদ্রাসা-ই-কারামতিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল মনোহরপুর গ্রামে। এতে এ গ্রামটি যেমন শিক্ষার আলোতে উদ্ভাসিত হয়, তেমনি পাশ্ববর্তী বাদিয়াটোলা, ঝাউদিয়া, চান্দুটীয়া, আলমনগর, মঠবাড়ী, ফরিদপুর, বাসবাড়ীয়া, মাদখোপা, খএরতলা, নূরপুর, খিতিবদিয়া, ছাতিয়ানতলা, বাগডাঙ্গা, চূড়ামানকাঠি, নলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামেও এর প্রভাব পড়ে।[৪১]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি

প্রচার ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে'Momammedan Literary Society'ও'Central National Mohammedan Association'-এর পরেই ছিল 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির' স্থান।

Dhaka University Institutional Repository

'কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়নের[৪২] উদ্যোগে ১৯০৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জানা যায় যে, ১৮৮৬ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খান 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নামে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৯ সালে প্রথমবারের মত কলকাতায় এ সংগঠনের প্রথম অধিবেশন হয়। 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী রচিত নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, সৈয়দ ওয়াজেদ হোসেন (কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক) প্রমুখ শিক্ষানুরাগী এখান থেকে প্রেরণা লাভ করে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠনের পরিকল্পনা করেন।[৪৩] পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে যে, কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়নের উদ্যোগে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি গঠন করা হয়। এদিক থেকে প্রথমোক্ত সংগঠনটিকে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি'র প্রসুতি বলা যেতে পারে।। বস্তুত ১৯০৩ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়নের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আমীর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ইউনিয়নের তৎকালীন সম্পাদক সৈয়দ ওয়াজেদ হোসেন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' স্থাপনের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।[৪৪] এ সভায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয় । 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' শীর্ষক এ প্রচার পত্রটি ১৯০৩ সালে নভেম্বর মাসে কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন কর্তৃক পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। সৈয়দ ওয়াজেদ হোসেন কৃত এ প্রচার পত্রে দারিদ্র ও অশিক্ষাকে বাংলার মুসলমান সমাজের দুগর্তির প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয় যে, বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। অবস্থা পরিবর্তনের জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্য, কৃষি ও কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও এতে বিশেষভাবে বলা হয়। নারী শিক্ষার প্রসার ও বিদ্যালয় স্থাপন সমিতির কর্মসূচীভুক্ত করা হয়। শিক্ষিত, ধর্মপরায়ন, আলেম দ্বারা ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়।[৪৫] 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগের সাথে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ জড়িত ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার মত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে তিনি এবং তাঁর সহযোগী শেখ জমিরুদ্দীন যে এ

Dhaka University Institutional Repository

সমিতির কার্যক্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৩১০ সালের ২০ ও ২১ শে চৈত্র (১৯০৪ সালের ২ ও ৩ এপ্রিল) রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়া শহরে সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল সৈয়দ শামসুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী এ সমেলনে ঢাকা, চট্রগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোহর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, নাটোর, রাজশাহী ও কলকাতা থেকে প্রায় চার হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহর করেন। এ সম্মেলনে মোট ১৫ টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে, প্রস্তাব সমূহের মধ্যে সাধারণ ও বৈষয়িক শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন, নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ, শিক্ষা তহবিল গঠন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি ছিল প্রধান।[৪৬] উল্লেখ্য যে, উক্ত সম্মেলনে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ অংশগ্রহণ করেন। তাঁর উত্থাপিত একটি প্রস্তাব সম্মেলনের তৃতীয় প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে বলা হয় "এই সমিতির বিবেচনায় মুসলমান ছাত্রদিগকে ধর্ম শিক্ষা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন এবং প্রত্যেক এসলামীয়া বিদ্যালয়ে অন্ততঃ প্রতিদিন ১ ঘন্টা সময় ধর্ম শিক্ষার নিমিত্ত নির্ধারিত থাকা কর্তব্য।[৪৭]

সম্মেলনের চর্তুদশ প্রস্তাব অনুযায়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব,বেগম সাহেবা ও ঢাকার নবাব বাহাদুরেকে পৃষ্ঠপোষক, সৈয়দ শামসুল হোদা ও মির্জা সুজাত আলী বেগ খান বাহাদুরকে সভাপতি এবং সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেনকে সম্পাদক করে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন অন্যতম সদস্য।[৪৮] ১৩১২ সালের ৯ ও ১০ ই বেশাখ (১৯০৫ এপ্রিল) সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরার পুশ্চিম গাঁও -এর জমিদার খান বাহাদুর আলী নওয়াব চৌধুরীর 'খোরশেদ মঞ্জিল' প্রাসাদ প্রাঙ্গনে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মাহমুদুন্নবীর সভাপতিত্বে এ দুদিনের সম্মেলনে মহীপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী, নোয়াখালীর জমিদার বজলোর রহমান খান বাহাদুর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিনিধি বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফি প্রমুখ গণ্যমান্যসহ স্থানীয় আলেম, উকিল, মোক্তার শিক্ষক ও অন্যান্য শ্রেণীর বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রবন্ধ পাঠক ও বক্তাদের মধ্যে মুন্সী মেহেরুল্লাহ ছিলেন অন্যতম। শেখ হবিবর রহমানের ভাষ্যমতে,

Dhaka University Institutional Repository

> ''কনফারেন্সের শেষ দিনে মুন্‌শীসাহেব ধর্ম ও শিক্ষা সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এই কনফারেন্সের সাফল্যের মূলে তাঁহার কর্মশক্তি বিশেষভাবে কার্য্য করিয়াছিল। পরদিন মৌলভী মনিরুজ্জামান ইসলামবাদীর সাহেবের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে তর্ক ও আলোচনা হয়। মৌলভী সাহেব মুন্‌শী সাহেবের জ্ঞানের গভীরতা ও তর্কশক্তি দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন।''[৪৯]

সম্মেলনের ৪টি অধিবেশনে মোট ১৫ টি প্রস্তাব পাশ করা হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ছিলঃ ক) শিক্ষা তহবিল গঠন খ) বঙ্গ ভাষার অঙ্গচ্ছেদের বিরোধীতা গ) মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ রীতি প্রবর্তন। ঘ) মুসলমান বালকের ধর্মীয় শিক্ষা ঙ) মক্তব ও মাদ্রাসায় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট প্রদানের প্রথা প্রবর্তন। চ) মহসিন ফান্ডের সদ্ব্যবহার ছ) মুসলমান সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ্যসূচীর অর্ন্তভুক্তকরণ জ) ইউনানী চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা ঝ) কেন্দ্রীয় কমিটির শক্তিবৃদ্ধি ইত্যাদি। এছাড়া সভায় কুমিল্লা শহরে একটি 'মোসলেম বোর্ডিং' স্থাপনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।[৫০]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। তখন কলকাতার শিক্ষা সমিতির অনুরূপ ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠন করা হয়। ধনবাড়ীর জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী এর নেতৃত্ব দেন। ১৯০৬ সালের ১৪ ও ১৫ ই এপ্রিল ঢাকার নবাবের 'শাহবাগ' উদ্যানে সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে ঢাকার মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রবাস প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসার কারিকুলাম, মুসলমানী বাংলার উন্নতি, অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে উর্দু শিক্ষা, ইত্যাদি ছিল উল্লেখ্যযোগ্য।[৫১]

১৯১৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি সক্রিয় ছিল। বিদ্যাশিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান শিক্ষা সমিতি মুসলিম সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে যেরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আর কোন সংগঠনের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। ঘুনেধরা পশ্চদপদ মুসলিম সমাজে এ সমিতি শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম শিক্ষার সংস্কার, অর্থকরী বিদ্যার প্রসার, নারী শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

আবশ্যকতা এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। এ সমিতি জমিদার, বুদ্ধিজীবি, চাকুরিজীবীসহ সকল শ্রেণীর লোকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। ওয়াকিল আহমদ বলেছেন, "এটাই শিক্ষা সমিতির স্বাতন্ত্রের দিক, এখানেই তার সাফল্যের চাবিকাঠি।"[৫২]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ১৯০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আমৃত্যু তিনি এ সমিতির কার্যক্রমে একজন বলিষ্ট কর্মী, উদ্যোক্তা সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে মুসলিম পূনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯০৬ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়। শিক্ষানুরাগী মুন্সী মেহেরুল্লাহ এ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন।[৫৩] এ সম্মেলন শেষেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি

ওয়াকিল আহমদের ভাষ্যমতে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' গঠনের পরিকল্পনা একই কালে, প্রায় একই শ্রেণীর নেতৃবর্গ দ্বারা সম্পন্ন হয়।[৫৪] ইসলাম মিশন সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামা বাদী। তিনি ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় (১৩১৩ আশ্বিন-কার্তিক) 'ইসলাম ও মিশন' শিরোনামে যে প্রবন্ধ লিখেন তাতে এরূপ একটি মিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। এমনকি প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাবিত সমিতির গঠন প্রক্রিয়া, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। উল্লেখ্য যে, খ্রীষ্টান মিশনের অনুরূপ 'ইসলাম মিশন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের পরিকল্পনা মুসলমানদের দীর্ঘকালের। কোহিনুর পত্রিকা সম্পাদক মোহাম্মদ রওশন আলী লিখিত এবং ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় (১৩১১ , বেশাখ-জৈষ্ঠ) প্রকাশিত 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' নামক প্রবন্ধে এ বক্তব্যের সমর্থন মিলে।[৫৫] এই প্রবন্ধে উল্লেখিত তথ্য মতে, ১৩১০ সালের ২০ শে চৈত্র রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ায় সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেনের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে আগত লোকদের নিয়ে এ পৃথক সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মিশন সমন্ধে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' নামে

Dhaka University Institutional Repository

একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন মিশন সমিতির যে উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রস্তাব করেন সেগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

> "অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানবসমাজে সত্য সনাতন ইসলাম ধর্মের প্রচার, হত সচেতন মুসলিম সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি, ইসলাম ধর্মের উন্নতি বিধান কল্পে বাংলা ভাষায় নানাবিধ ট্রাক্ট বা পুস্তিকা এবং পত্রিকাদি প্রকাশ, ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টান ও অন্যান্য বিধর্মীদের অযথা আক্রমণ হতে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজকে রক্ষার বিধান এবং প্রয়োজনে এসব আক্রমনের প্রতিবিধানের চেষ্টাকরণ মফঃস্বল ও গ্রামে ইসলাম প্রচারের জন্য বেতনভোগী বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত বক্তা বা প্রচারক নিযুক্তকরণ ইত্যাদি।"[৫৬]

সমিতির উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও কর্মসূচী বিশ্লেষন করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র নীতি ও ব্রতের সাথে এগুলো ছিল সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সমিতির অন্যতম উদ্যোক্ত মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরীর প্রস্তাব অনুযায়ী মহীপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরীকে সভাপতি এবং ইসলাম প্রচারকও সোলতান পত্রিকা সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমেদকে সম্পাদক করে সমিতির যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ ছিলেন এর নির্বাহী পরিষদের অন্যতম সদস্য।[৫৭]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ যে সব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অন্যদের প্রতিষ্ঠত যে সব সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন সমকালীন বাংলার ইতিহাসে এসব সংগঠনের ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ এসব সংগঠন সে সময় বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং ধর্মীয় ও সমাজিক সংস্কার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এসব সংগঠন ইসলামের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের আক্রমণ প্রতিহত করে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সর্বোপরি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে মুসলিম জাগরণ ও সমাজ উন্নয়নে গতি সঞ্চার করে।

৪ঃ২ ঃ ইসলাম প্রচার কার্যক্রম

ক) ধর্মসভায় বক্তৃতা প্রদান

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন একজন অসাধারণ বক্তা। বলা বাহুল্য যে, তাঁর মধ্যে বহু গুনের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। ধর্ম শাস্ত্রজ্ঞ, শিক্ষাব্রতী, তর্কযুদ্ধা এবং সমাজ সংস্কারক প্রভৃতি নানাবিধ গুনের জন্য তিনি সর্বত্র বিপুলভাবে সমাদৃত হলেও বক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশী। শেখ হবিবর রহমানের ভাষ্যমতে, তিনিই এদেশের মুসলমান সমাজে সভা-সমিতি এবং বক্তৃতার প্রথা প্রবর্তন করেন। শেখ জমিরুদ্দীনের বিবরণীতেও একই দাবী লক্ষ্যনীয়। শেখ জমিরুদ্দীনের উদ্ধৃতি দিয়ে মুহম্মদ আবু তালিব লিখেছেন,

> ''আমরা আজকাল যে ধরণের ধর্মসভা বা ওয়াজের মজলিশ করি, মুন্সী সাহেবই তার প্রবর্তক ছিলেন। এর আগে মুসলমানগণ এ ধরণের ধর্ম সভার কথা জানতই না। ধর্মসভা করে তখন খ্রীষ্টান পাদরী সাহেবগনই খ্রীষ্টান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়াতেন এবং সেই সূত্রে অপর ধর্মের নিন্দা ও বিষেদগার করতেও তাঁরা ছাড়তেন না।''[৫৮]

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সে সময় খ্রীষ্টান পাদ্রীগন বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনা করলেও মৌলভী -; মৌলানাগন এসব বক্তৃতা ও আলোচনা সভয়ে সাবধানে এড়িয়ে চলতেন। শেখ হবিবর রহমান বলেছেন, ''কেহ এতৎসমন্ধে কিছু বলিলে কাফেরী ও 'গোমরাহীর' ফৎওয়া দিয়ে নাছারাদিগকে দোজখে পাঠাইয়া দিতেন; কিন্তু সাহস করিয়া কেহ তাঁহাদের সম্মুখে টু-শব্দ করিতেন না।''[৫৯] মেহেরুল্লাহ্ দেখলেন যে, এদেশের সর্বত্রই মিলাদ মাহফিলের যথেষ্ঠ প্রচলন আছে। কিন্তু এতে যা পঠিত হয় তার প্রায় সবটুকুই কবির কল্পনাপ্রসুত। এতে মহানবীর পবিত্র জীবন চরিত্র ও মহান জীবনাদর্শের বিষয়ে প্রায় আলোচিত হয় না। তদুপরি পঠিতব্য বিষয়গুলো আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষার হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রোতা এর মর্মবস্তু বুঝতে পারে না। অথচ সকলেই আশা করেন যে, এর প্রভাবে তাহাদের জীবনে কৃত পাপ ক্ষয় হবে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের মিলাদ মাহফিল ছিল এক শ্রেণীর মোল্লা মৌলভীর জীবিকার্জনের একটি প্রধান উপায়। এর দ্বারা শ্রোতাগনের ধর্মজীবনের বা চরিত্রগঠনের বিশেষ উন্নতি হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনব্যাপী সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মূলত তিনটি। ক) খ্রীষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারকে প্রতিহত করা। খ) ইসলাম প্রচার করা এবং গ) সমাজ সংস্কার। এসব উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য তিনি বক্তৃতাকে প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচারও মুসলমান সমাজের উন্নয়নের মহান ব্রত নিয়ে তিনি বাংলা-আসামের সর্বত্র ধর্মসভায় বক্তৃতা দিয়ে খ্যাতি লাভ করেন। মেহেরুল্লাহর জীবনীকারগন তাঁর ধর্মসভার যে সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন প্রাসঙ্গিক কারণে নিম্নে এসব সভার কিছু বিবরণ দেওয়া হল।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ প্রচারকার্য শুরু করেছিলেন তাঁর জন্মস্থান যশোহর থেকেই। কারণ যশোহরে তখন খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রবল তৎপরতা ছিল। ফলে এখানকার মুসলমান সমাজ বিপন্নবোধ করছিলেন। এমতপরিস্থিতিতে ইসলাম প্রচারক মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ যশোহর থেকেই তার প্রচারকার্য শুরু করেন। ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে,

> ''যশোর জেলার খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগন বড়ই গোলাযোগ করিয়া তুলিয়াছিলেন; বহুসংখ্যক অজ্ঞান মুসলমান তাহাদের অযথা কুহকে পড়িয়া ভ্রান্তপথে পদ নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। মুন্‌শী মহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ও মুন্‌শী মোহাম্মদ কাসেম প্রভৃতি প্রচারক সাহেবানের কঠোর উদ্যোমে খ্রিষ্টিয়ানগনের উদ্যম নিস্ফল হইয়াছে।''[৮০]

শেখ হবিবর রহমানের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অনুকরণে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ প্রথমে হাটে-হাটে বক্তৃতা শুরু করেন। এতে তিনি পাদ্রীদের বক্তব্যের অসারতা প্রতিপন্ন করার সাথে সাথে ইসলামের মাহাত্ম্য ও গৌরববাণী প্রচার করতে থাকেন। অচিরেই বক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতির বিস্তার ঘটে। ১২৯৮ (১৮৯১ খ্রীঃ) সালে ফিরোজপুরে পাদ্রীদের সাথে তর্কযুদ্ধ এবং রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীনের সাথে কলম যুদ্ধ বাংলার মুসলমান সমাজে তাঁকে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করে। বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর ডাক আসতে থাকে। আর তিনিও সানন্দচিত্তে এসব আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলার সর্বত্র তর্কসভা ও ধর্মসভায় বক্তৃতা করতে থাকেন। মেহেরুল্লাহর জীবনীকার আছিরুদ্দীন প্রধান লিখেছেন,

> ''১৩০৪ সাল হতে ১৩১৩ সাল পর্যন্ত শেখ সাহেব সহ তিনি (মেহেরুল্লাহ্) একত্রে পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পরগনা, বরিশাল, নোয়াখালি , ফরিদপুর, ময়মনসিংহ,

রাজশাহী, নদীয়া, যশোহর, হুগলী, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি জেলায় শহর ও মফস্বলের ধর্মসভায় বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।"[৫৯]

আবুল হাসান এ তালিকায় ঢাকা, হাওড়া এবং খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের নাম সংযুক্ত হবে বলে উল্লেখ করেছেন। তবে দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য যে, মেহেরুল্লাহ্‌র সব ধর্ম সভার বিবরণ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সূত্র হতে যেস ব ধর্মসভার বিবরণ দৃষ্টিগোচর হয়েছে সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হল।

পান্টিসভা

১৩০৪ সালের ১৩ ই ফাল্গুন নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার অর্ন্তগত কুমারখালী থানার পান্টি নামক স্থানে একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ এ সভায় বক্তৃতা করেন। 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় (১২ চৈত্র ১৩০৪) এ সভা সম্পর্কে মেহেরুল্লাহ্‌র নিজের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। মুন্সীর বিবরণমতে,

''বিগত ১৩ ই ফাল্গুন(১৩০৪) বৃহস্পতিবারে নদীয়া জেলার অর্ন্তগত পান্টি নামক স্থানে একটি বিরাট সভার অধিবেশন গিয়োছে। সভায় আনুমানিক তিন সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। তথায় বক্তৃতা করিবার জন্য আমার সহিত মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল আজিজ সাহেব ও (চার্চ্চ অব ইল্যান্ডের ভূতপূর্ব মিশনারী, নবদীক্ষিত মুসলমান) শ্রীযুক্ত মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন এইচ, জি, আর সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বেলা ২ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৯ টা পর্যন্ত ৭ ঘন্টাকাল বক্তৃতা হইয়াছিল।"[৬০]

উল্লেখ্য যে, পান্টির ধর্মসভাকে কেন্দ্র করেই মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সাথে শেখ জমিরুদ্দিনের প্রথম সাক্ষাত হয়। ইতোপূর্বে তাদের মধ্যে প্রথমে কলম যুদ্ধ এবং পরে পত্রালাপ হয়েছিল। কিন্তু ব্রত ও কর্মে দুই সমধর্মীর প্রথম সম্মুখ সাক্ষাত হয় পান্টিতে। শেখ জমিরুদ্দিন লিখেছেন-

''১৩০৪ সালের ১১ ফাল্গুন মঙ্গলবার নদীয়া জেলার অর্ন্তগত পান্টি নামক স্থানে মুন্সী মোহাম্মদ মেরুল্লাহ্‌ সাহেবের সহিত আমার প্রথম সাক্ষত হয়। তাঁহার সহিত তালতালা হরিপুরের মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব ছিলেন। মুন্সী সাহেব আমাকে লইয়া যাইবার জন্য সুফী আবদুল বারিকে কুমারখালী স্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। আহা ! সেই দিন স্মরন করিলে হৃদয়ে আনন্দ ধরে না।"[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর দু'জন একসঙ্গে বহু সভা সমিতিতে যোগদান করেন। জমিরুদ্দীনের সক্রিয় সহায়তায় মেহেরুল্লাহ্‌র মিশন আরো ফলপ্রসু ও গতিময় হয়ে উঠে। পান্টির ধর্মসভায় জমিরুদ্দীন যে বক্তৃতা করেছিলেন মেহেরুল্লাহ তাঁর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেনএবং বাংলার মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর বক্তৃতা শুনার জন্য উদাত্ত আহবাণ জানান।[৬২]

রানাঘাটের সভা

বাংলা ১৩০৪ সালে রানাঘাটে এক ধর্মসভায় মেহেরুল্লাহ্‌ বক্তৃতা করেছিলেন বলে জানা যায়। রানাঘাটের পাদরী মনরোর সাথে বাহাসের উদ্দেশ্যই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাদরী মনরো নির্দিষ্ট দিনে বাহাস স্থলে উপস্থিত না হওয়ায় রানাঘাটের বাহাস সভাটি একটি ধর্ম সভায় রূপান্তরিত হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ এবং তার ঘনিষ্ট সহচর মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন এ সভায় ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও খৃষ্টান ধর্মের অসারতা বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী ও তেজোদীপ্ত ভাষায় বক্তৃতা করেন। এ সভায় কয়েক হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। তন্মধ্যে পুলিশের উচ্চ পদস্থ কমকর্তাসহ বহু হিন্দু ভদ্রলোকও ছিলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক। সমকালীন 'সুধাকর' পত্রিকায় তিনি এ সভা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন নিম্নে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলঃ

> "----প্রথমে মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দিন সাহেব হামদ ও নায়াত অন্ত বক্তৃতা করেন। ইহার তেজপূর্ন হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা অতীব প্রশংসনীয়, শ্রবনে বিবিধভাবে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। ইনি অনর্গল তিনঘন্টা বক্তৃতা করার পর মুসলমান সমাজের প্রবীণ বক্তা মুন্‌শী মহম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ সাহেব গত্রোত্থান করিলেন। ইহার যুক্তিপূর্ণ মধুর বক্তৃতায় শ্রোতাবর্গ অতীব বিমোহিত হইয়াছিল তাহারা কখনো বিস্মৃত, ভীত, চমকিত কখনোবা উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল ----ইসলামের মাহাত্ম কীর্ত্তন এবং বাধ্য হইয়া খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা প্রদর্শন ও তৎসহ মুসলমান সমাজের উন্নতি বিষয়ক বক্তৃতায় ৩/৪ ঘন্টা অতিবাহিত হয়। পরে মোনাজাত করে সভা ভঙ্গ হয়।"[৬৫]

নোয়াখালী সভা

১৩০৫ সালের মাঘ-ফাল্গুন মাসে নোয়াখালী সফর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়। উল্লেখ্য যে, বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত নোয়াখালী অঞ্চলেও সে সময় খ্রীষ্টান মিশনারীদের

Dhaka University Institutional Repository

তৎপরতা দেখা যায়। বাংলা ১৩০৫ সালের শেষভাগে সেখানকার খ্রীষ্টান পাদ্রীগন তথাকার মুসলমানদের নিকট কতগুলো প্রশ্ন করেন। নোয়াখালরি আলেম সমাজ এসব প্রশ্নের উত্তর দানে অপারগ হওয়ায় স্থানীয় মুসলমানগন প্রশ্নগুলো মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র নিকট পাঠিয়ে দেন। মেহেরুল্লাহ্‌ শেখ জমিরুদ্দীনের সহায়তায় এসব প্রশ্নের লিখিত উত্তর পাঠিয়ে দেন। শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন যে, এই উত্তর পেয়ে পাদ্রীগন উচ্চ বাচ্য করেন নাই। পাদ্রীদের কৃত ৩৬ টি প্রশ্ন ও মেহেরুল্লাহ্‌র প্রদত্ত উত্তর নিয়ে নোয়াখালীর মুন্সী আবদুল জব্বার 'জওবোন্নাসারা' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর নোয়াখালী থেকে মুন্সীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি তার পার্শ্বচর মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীনসহ সেখানে যান। তাঁদের সফর উপলক্ষ্যে নোয়াখালীতে বেশ সাড়া পড়ে। নোয়াখালীতে অবস্থানকালে তাঁরা স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল আজিজের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এখানে থেকে তারা বেশ কয়েকটি ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন। শেখ হবিবর রহমান নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত তিনটি ধর্মসভার উলেখ করেছেন। তার প্রদত্ত তথ্যমতে,প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১লা ফাল্গুন রবিবার, ঈদের দিনে। স্থানীয় ঈদগাহে অনুষ্ঠিত এ সভাটিতে স্থানীয় ডিষ্ট্রিক জজ সৈয়দ নূরুল হোদা (বি.এ.এল.এল.বি. বার এট-ল) উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩রা ফাল্গুন রাজকুমার জুবিলী স্কুল মাঠে। এ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন খান বাহাদুর বজলোর রহিম। তৃতীয় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৫ ই ফাল্গুন। নোয়াখালী টাউন হলে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কারগিল। শেষোক্ত দুটি সভায় স্থানীয় সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহর নোয়াখালী সফরকে কেন্দ্র করে তথায় ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। পূর্বোক্ত ধর্মসভা সম্পর্কে সমকালীন 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় বিবরণ প্রকাশিত হয়। মেহেরুল্লাহ্‌ জীবনীকারগনও এসব ধর্মসভার বিবরণ দিয়েছেন। শেখ জমিরুদ্দীন লিখেছেন, ''নোয়াখালী টাউন হল ও রাজকুমার স্কুলে মুন্সী সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবন করিয়া তথাকার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিলএ মোক্তার সকলেই মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন।"[৬৬] মুন্সী

Dhaka University Institutional Repository

মেহেরুল্লাহ্‌র নোয়াখালীর ধর্মসভা সম্পর্কে আসিরুদ্দীন প্রধান প্রদত্ত বিবরণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভাষায়-

> ''সভার প্রথম দিন ২/৩ সহস্র ও দ্বিতীয় দিন ৩/৪ সহস্রের উপর লোক সমবেত হইয়াছিল। ---- তৎপর স্বনামধন্য বক্তাকুলতিলক মুন্সী সাহেব মাগরেবের নামাজ অন্তে দন্ডায়মান হইয়া সমাজ পতন ও উদ্ধারবৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব-জীবনের কর্তব্য কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রী-শিক্ষা, শিক্ষার উপকারীতা, মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল স্থাপন, শিল্প শিক্ষা ধর্মগতপ্রাণ গঠন, ব্যায়াম চর্চা, সভা সমিতির উপকারিতা, বায়তুল মাল তহবিল গঠন, বাল্য বিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।''[৬৭]

উল্লেখ্য যে, উপরের বর্ণনায় ধর্ম বিষয়ে আলোচনার সাথে সাথে বর্তমান জগত ও জীবন ধারা সম্পর্কে মুন্সীর যে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র নোয়াখালী প্রচার সম্বন্ধে কবি আব্দুর রহিম 'আখলাকে আহমদিয়া' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। পয়ার ছন্দে লিখিত ৫৫ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকাতে মেহেরুল্লাহ্-জমিরুদ্দীনের অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়।[৬৮]

লক্ষ্যনীয় যে, আখলাকে আহমদিয়ার উর্পযুক্ত বিবরণীতে নোয়াখালীতে মেহেরুল্লাহ্‌র প্রথম সভা হিসেবে জুবিলী স্কুলের ধর্মসভার নামোল্লেখ করা হয়েছে। এতে ১লা ফাল্গুন তারিখে স্থানীয় ঈদগাহে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার উল্লেখ নেই। সম্ভবত প্রথম সভাটি ঈদগাহে এবং ঈদের জামাতান্তে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আখলাকে আহমদিয়ার লেখক এর উল্লেখ করেননি, বরং জুবলী স্কুলের সভাটিকেই প্রথম সভা বলে অভিহিত করেছেন। মুন্সীর ওয়াজ শুনে বিভিন্ন স্থানের বহু বিধর্মী নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আখলাকে আহমদিয়ায় এ বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নোয়াখালী টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় মেহেরুল্লাহ্‌র উদ্যোগে তথায় আহমদিয়া মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। বিশিষ্ট আলেম মাওলানা হাফেজ আহম্‌দের স্মৃতি সংরক্ষণ উপলক্ষ্যে স্থাপিত এ মাদ্রাসাটি পরে একটি উচ্চ শ্রেণীর মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

কেশবপুর সভার

যশোর জেলার কেশবপুরে অনুষ্ঠিত সভাটি মুন্সী মেহেরুলাহ্‌র অসাধারণ ব্যক্তিত্বের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। শেখ হবিবর রহমানের ভাষ্যমতে, কেশবপুরের এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৫ ই অগ্রহায়ন ১৩০৬ সালে। আবু তালিবের বর্ণনায় সালটি একই হলেও সভার তারিখ হিসাবে ৫ই অগ্রহায়নের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য তালিবের উল্লেখিত তারিখটি মুদ্রন প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। কেননা তিনি এ সভা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তাঁর সূত্র শেখ হবিবর রহমানের রচনা। এ ক্ষেত্রে হবিবর রহমান উল্লেখিত তারিখটিকেই তিনি গ্রহণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কেশবপুরের এ সভাটি অনুষ্ঠানের সাল সম্পর্কেও ভিন্নমত পাওয়া যায়। মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীনের বর্ণণামতে, ''১৩০৫ সালের অগ্রহায়ন মাসে আমরা যশোহর জেলার কেশবপুর অঞ্চলে প্রচার করিয়া পরে নোয়াখালী গিয়াছিলাম।''[৬৯] শেখ জমিরুদ্দীনের বর্ণণা অনুযায়ী তিনি নিজেও কেশবপুরে গিয়েছিলেন। অতএব, তাঁর উল্লেখিত সালটিই যথাযথ হওয়া স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেশবপুরের এ সভাটি কোন সাধারণ ধর্মসভা ছিল না। এটি ছিল একটি বাহাস বা তর্ক সমর। তবে এ তর্কযুদ্ধে মুসলমান খৃষ্টান পরস্পরের প্রতিপক্ষ ছিল না। বরং এ বিরাট বাহাস সভার প্রতিপক্ষ ছিল মুসলমানদের 'হানাফী' ও 'মোহাম্মদী' সম্প্রদায়। উভয় সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোক উভয় দলের খ্যাতনামা আলেমগন রাশি রাশি কিতাব ও দলীল দস্তাবেজসহ উপস্থিত ছিলেন। এ তর্ক সমরে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলভী মোহাম্মদ সানাউল্লা ও কোরআন অনুবাদক মৌলভী আব্বাস আলী প্রমুখ বিশিষ্ট আলেমগনও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, শুধু কেশবপুরে নয়, তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন স্থানে মুসলমান সমাজে এরূপ বির্তকের নজীর লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ এসব বাহাস সভাগুলো ছিল মুসলিম সমাজের মুর্খতা ও অতি গোঁড়ামীর একান্ত শোচনীয় বহিঃপ্রকাশ। এসব তর্ক সমরের পরিণাম অনেক ক্ষেত্রে হাতাহাতি, লাঠালাঠি, মারামারিতে পর্যবসিত হয়ে শেষ পর্যন্ত আইন-আদালত পর্যন্ত গড়াত। কেশবপুর সভাতেও এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র চেষ্টায় তা হয়নি। মুন্সী বিচক্ষনতার সাথে এরূপ তর্ক-বাহাসের অপকারিতা সম্পর্কে সকলকে বুঝিয়ে দেওয়ায় মুহর্তের মধ্যেই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের বিষবাস্প

দুর হয়ে যায়। হানাফী ও মোহাম্মদী উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধভাবাপন্ন আলেমগণ অবণত মস্তকে মুন্সীর মিমাংসা মেনে নেন।[৭০]

কতটুকু ব্যক্তিত্ব এবং শাস্ত্রজ্ঞানে পান্ডিত্য থাকলে পরস্পর বিরোধী বিদ্বেষ বিষদগ্ধ হাজার হাজার লোকের মন জয় করা যায় এবং পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞান গর্বিত দুধর্ষ আলেম সমাজকে নিজের আয়ত্ত্বে এনে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় তা সহজেই অনুমেয়।

কসবা সভা

১৩০৬ বাং সালে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ খুলনাঞ্চলে বেশ কয়টি ধর্মসভায় বক্তৃতা করেছিলেন। জীবনীকার শেখ হবিবর রহমান এসব ধর্মসভার অন্তত দুটিতে যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি তখন খুলনা জেলার পয়গ্রাম কসবার স্থানীয় মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তার বিবরণী মতে,

> ''১৩০৬ সালের ৭ ই জ্যেষ্ঠ তারিখে সভার দিন ঠিক হয়।"ঐ তারিখেই আমার সহিত মুন্শী সাহেবদ্বয়ের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। অতিবৃষ্টি নিবন্ধন ঐদিন সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। সমবেত জনগনকে সম্বোধন করিয়া মুন্শী সাহেব সামান্য কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন মাত্র। আপাততঃ উহাতেই আমাদিগকে সন্তষ্ট হইতে হইয়াছিল। ১৯ শে জ্যেষ্ঠ তারিখে সুন্দরভাবে উক্ত সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। গ্রীস্মোপলক্ষ্যে অমাদের স্কুল বন্ধ থাকায় আমার এই সভায় যোগদানের সৌভাগ্য হয় নাই। আমি তখন যশোহর জিলার অর্ন্তগত ঘোষগাতি গ্রামে অমার নিজ বাটিতে গিয়াছিলাম। উক্ত সভা উপলক্ষে আমি দুটি কবিতা লিখিয়াছিলাম; তিনি তাহা শ্রবনে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন, এবং একান্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও নিজ স্নেহগুনে আমাকে 'শিশু-কবি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।"[৭১]

দৌলতপুর সভা

১৩০৬ সালে খুলনার দৌলতপুর স্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মসভায় মুন্সী মেহেরুলাহ্ বক্তৃতা করেছিলেন বলে জানা যায়। শেখ হবিবর রহমান নিজে এ সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তবে সভাটি কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা উল্লেখ করেননি। খুলনা শহর ও আশপাশের হিন্দু মুসলমান

নির্বিশেষে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক এ সভায় সমবেত হয়েছিলেন। সমকালীন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক খান বাহাদুর, মৌলভী কাজী এমদাদুল হক এ সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। মুন্সী সাহেব 'গাছে উপবিষ্ট একটি পাখীর'র[৭২] গল্প দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। গল্প শেষে তিনি বলেন,

> ''সমবেত ভদ্র মহোদয়গন আপনাদের মত সজ্জন পরিপূর্ণ এই সভায় আমার নতুন কথা শুনাইবার মত যোগ্যতা নাই, তবে এইটুকু আমার ভরসা যে, আমি সেই পাখীর ন্যায় যাহা কিছু বলিব, হয়ত অনেক স্থানে তাহা অর্থহীন হইতেও পারে। তথাপি আপনার নিজ নিজ গুনে তাহার মধ্য হইতে ভাল অর্থই গ্রহণ করিবেন।''[৭৩]

মুন্সী বক্তৃতার এ ভূমিকায় কেউ গল্প শুনে, কেউ এর ভিতরকার গভীর অর্থ ও ঈঙ্গিত উপলব্ধী করে সর্বোপরি তাঁর বিনয়ের পরিচয় পেয়ে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। উক্ত সভায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ৪/৫ ঘন্টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে শ্রোতামন্ডলী মন্ত্রমোগ্ধের ন্যায় মোহাবিষ্ট হয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়েছিলেন। শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন যে, বলতে কি সেই বক্তৃতার মধ্যে যে মাদকতা ছিল কয়দিন পর্যন্ত আমি তাঁর মোহ কেটে উঠতে পারি নাই। দৌলতপুর সভার কয়েকদিন পর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ফুলতালা থানার ছাতিয়ানী নামক গ্রামে একটি সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। এ সভাতেও শেখ হবিবর রহমান উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বর্নণা মতে, ''তাঁহার এই সভায় বক্তৃতাও দৌলতপুর সভার বক্তৃতার ন্যায় সর্ব্বজন মনোহর হইয়াছিল।''[৭৪] উল্লেখ্য যে, মুন্সী সাহেবের এই বক্তৃতায় পূর্বতন বক্তৃতার কোন অনুবৃত্তি হয়নি; অথচ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

বড়ইবাড়ী সভা (পাবনা)

১৩০৬ সালে পাবনা জেলার বড়ইবাড়ী হাটে একটি ধর্মসভায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ বক্তৃতা করেছিলেন। আবু তালিব এ সভাটির কথা উলেখ করলেও কত তারিখে এবং কি উপলক্ষ্যে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন বিবরণ দেননি। তবে তার বর্ণনামতে, এ সভাতেই মুন্সীর সাথে কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ইসমাইল হোসেন সিরাজী তখন স্থানীয় বানোয়ারী লাল উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। বড়ইবাড়ীর সভায় তিনি 'অনল-প্রবাহ' নামক এটি মুসলিম জাগরণমুলক কবিতা পাঠ করেন। এ তরুণ কবির কবিতা শুনে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্

Dhaka University Institutional Repository

মুগ্ধ হন এবং তাঁকে কাব্য রচনা অব্যাহত রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন।[৭৫] এ সভাতেই তিনি সিরাজীকে তাঁর কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেন এবং পরবর্তীতে নিজ ব্যয়ে তা প্রকাশ করেন।

টাউন হলের সভা (পাবনা)

১৩০৮ সালে (১৯০১) পাবনা টাউন হলে একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩, ৪ ও ৫ ই আষাঢ় অনুষ্ঠিত তিন দিনের এই ধর্মসভায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ বক্তৃতা করেছিলেন। এ সভায় সুপ্রসিদ্ধ কবি ও বক্তা ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও মুন্‌শী মোহাম্মদ ইব্রাহিমসহ বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া টমসন হলের সভা

১৩০৮ সালের ২২ শে মাঘ বগুড়াতে অনুষ্ঠিত একটি ধর্ম সভায় মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ বক্তৃতা করেছিলেন। সভাটি প্রথমে টমসন হলে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লোক সমাগম বেশী হওয়ায় হলের পরিবর্তে সামনের বিরাট খোলা মাঠে সভা আয়োজন করা হয়। এ সভায় বগুড়ার নবাব সৈয়দ আবদুস সোবহান বাহাদুর, স্থানীয় ডেপুটি, মুন্সেফ ও উকিলসহ বহু গন্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানে মেহেরুল্লাহ্ রাত ১ টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে উপস্থিত হাজার হাজার লোক সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিবিষ্ট মনে মুন্সীর বক্তৃতা শুনেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা শুনেও তাদের মনে অতৃপ্তি থেকে যায়।

রংপুর টাউন হল সভা

২৮ শে মাঘ ১৩০৮ সালে রংপুর টাউন হলে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সভায় মুন্সী গো-হত্যা সম্পর্কে একটি চমৎকার বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, গো-হত্যা বিষয়ে এ সময় হিন্দু ও মুসলমান সমাজে জোরালো বির্তক চলছিল। হিন্দু সম্প্রদায় গো জাতিকে তাদের দেবতা জানে এর হত্যার বিরোধী ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিম সমাজে গো-হত্যা প্রচলিত ছিল। মুসলিম সমাজকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে গরু কোরবানী ও দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় গরুর মাংস উপাদেয় হিসেবে গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ পরিস্থিতিতে বঙ্গভারতে প্রায়শই গো-হত্যাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হত। রংপুর টাউন হল সভায় গো-জাতি রক্ষা ও এর উন্নতিকল্পে করণীয় সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তা শুনে উপস্থিত সুক্ষিত হিন্দু শ্রোতাবর্গ মুগ্ধ হন। শেখ জমিরুদ্দীন উল্লেখ করেছেন, ''স্থানীয় পন্ডিত মহা-মহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার গলায় গলায় মিলিয়া শত শত প্রশংসা করিয়াছিলেন।''[৭৩] সে সময় গো-হত্যা সম্পর্কে বক্তৃতা করে সুশিক্ষিত হিন্দু সমাজের এরূপ প্রশংসা অর্জন একজন মুসলমান বক্তার পক্ষে কত বড় কৃতিত্বের বিষয় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অন্যান্য ধর্ম সভাঃ

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ উপর্যুক্ত ধর্মসভাসমুহ ছাড়াও আরো বহু সভায় বক্তৃতা করেছেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি শেখ ফজলল করিম, তন্মধ্যে মহিষখচা, গঙ্গাচড়া, ভূষভান্ডার, কাকিনা ও কুলাঘাটে অনুষ্ঠিত পাঁচটি সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য তিনি এসব সভার সন-তারিখ উল্লেখ করেননি। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী প্রণীত মেহেরুল্লাহ্র জীবনীগ্রন্থে এসব ধর্মসভার উল্লেখ মাত্র নেই। আবু তালিব প্রদত্ত ধর্মসভার বিবরণীতেও উর্পযুক্ত ধর্মসভাসমূহের কোন উল্লেখ নেই। এমনকি আবু তালিব তাঁর গ্রন্থে 'মেহের বর্ষপঞ্জী' শিরোনামে পরিশিষ্টে সংযোজিত পর্বে বর্ষভিত্তিক কিছু ধর্মসভার কথা উল্লেখ করলেও শেখ ফজলল করিম উল্লেখিত ধর্ম সভা সমূহের কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। আমাদের প্রাপ্ত তথ্যসমূহের কোনটিতেই এসব সভার তারিখ এমনকি নামোল্লেখ পর্যন্ত না থাকায় এসব সভার সন তারিখ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা কঠিন।

কবি শেখ ফজলল করিমের বর্নণানুযায়ী তাঁর সাথে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল মহিষখচা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায়। ফজলল করিম তাঁর বড় ভাই মুন্শী ফজলর রহমান ও আরো কয়েকজন বন্ধু বান্ধবসহ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহিপুরের জমিদার খান বাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে শ্রোতামন্ডলি চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়েছিল বলে শেখ ফজলল করিম উল্লেখ করেছেন। এ সভাতে শেখ

Dhaka University Institutional Repository

ফজলল করিমও বক্তৃতা করেছিলেন এবং এ সুবাদে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সাথে তাঁর পরিচয় হয়। আলাপ সূত্রে তিনি মুন্সীর কাছে তাঁর 'পরিত্রাণ' কাব্যর কথা বললে মুন্সী সাহেব নিজ ব্যয়ে এটি ছাপানোর প্রতিশ্রুতি দেন এবং সে অনুযায়ী কলিকাতার রিয়াজুল ইসলাম প্রেস হতে 'পরিত্রাণ' কাব্যটি প্রকাশ করেন। শেখ ফজলল করিমের বিবরণ মতে, পরিত্রাণ কাব্যটি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে 'অনল প্রবাহ' প্রকাশিত হয়েছিল। অনল প্রবাহের প্রকাশকাল ১৩০৭ বাং/ ১৯০০ ইং। এতে অনুমান করা যায় যে, মহিষখচায় অনুষ্ঠিত সভাটি ১৩০৭ সাল বা এর আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মহিপুরের জমিদার খান বাহাদুর আবদুল মজিদ তাঁর বাড়ীর নিকটস্থ গঙ্গাচড়া মাঠে একটি মেলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম বছরের মেলায় একদিকে যেমন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল, অন্যদিকে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কবি শেখ ফজলল করিম এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বর্ণনা মতে, এখানেও লোকেরা মুনশীর বক্তব্য শুনে মোহিত হয়েছিল।[৭৭]

ভুষভান্ডারে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মসভায় মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ তাঁর সহযোগী মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন ও শাহ আবদুল্লাহসহ বক্তৃতা করতে এসেছিলেন। এ সভাতেও শেখ ফজলল করিম উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বিবরণী মতে, স্কুল প্রাঙ্গনে খোলামাঠে অনুষ্ঠিত এ সভাতে সহস্রাধিক লোক সমাগম হয়েছিল। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র বক্তৃতার পূর্বে অন্যান্য বক্তাগন যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন সভায় গোলযোগ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় মুনশী সাহেব বক্তৃতা মঞ্চে উঠে মিনিটের মধ্যে যা বললেন, তাতে মনে হল সভায় যেন আর একটিও জীবিত মানুষ নাই; চিত্রার্পিতের মত সকলেই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, গোলযোগ থেমে গেল।"[৭৮]

শেখ ফজলল করিমের ভাষ্যমতে, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র সাথে তাঁর ঘনিষ্টভাবে মিশবার সুযোগ হয় কাকিনার ধর্মসভা উপলক্ষ্যে। কাকিনাধিপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীর অনুমতিক্রমে স্থানীয় 'শম্ভুসাগর' নামক এক বিরাট দীঘির পাড়ে এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানকার 'ব্রাহ্মসমাজ' ও ছাত্র সমাজকে উদ্দেশ্য করে। নির্দিষ্ট দিনে সভার প্রথমে মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন এবং শাহ আব্দুল্লাহ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তারপর মুন্সী মোহাম্মদ

মেহেরুল্লাহ্। শেখ ফজলল করিমের ভাষায়, ''সমাগত সহস্রাধিক হিন্দু মুসলমান এই ছিন্নবস্ত্র পরিহিত অতি সাধারণ ম্যুষটির অদ্ভুত ক্ষমতা, অপূর্ব বাগ্মিতার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।"[৭৬] উল্লেখ্য রাজা মহিমা রঞ্জন রায় চৌধুরী নিজে একজন সু-পন্ডিত ও সুবক্তা ছিলেন। বড় বড় সভা সমিতিতে বক্তৃতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তিনি বিদ্বৎ সমাজে এবং বাংলার জমিাদরদের মধ্যে বরণ্য হয়েছিলেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র বক্তৃতা শুনে রাজা উদ্বেলিত চিত্তে বলে উঠেন-''আজ আমার অনেকদিনের একটা ভুল ধারণা ঘুচিল। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে একজন বাগ্মী আছেন, ইহা আমি প্রথম দেখিলাম।"[৮০] সভায় রাজা নিজেও তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় মুসলমান সমাজকে শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন।

কাকিনা সভা শেষে মেহেরুল্লাহ্ তাঁর সহযোগীদের নিয়ে কবি শেখ ফজলল করিমের বাড়ীতে রাত্রিযাপন করেন। সংবাদ শুনে পরদিন সকালে তাঁর সাথে বহু লোক দেখা করতে আসেন। মুনশীর সাথে সাক্ষাতপ্রার্থীদের মধ্যে স্থানীয় হাইস্কুলের হেডপন্ডিত প্রবীণ শিক্ষক বাবু গগন চন্দ্র ঘোষ ছিলেন অন্যতম। তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত পর্দা প্রথার কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, মুসলমানদের দেখাদেখি হিন্দুর অন্তঃপুরেও এই কড়াকড়িটা ছড়িয়ে পড়েছে। এতটা ভাল নয়। মুন্শী সাহেব তাঁর কথা শুনে হেসে বললেন,

> ''আচ্ছা পন্ডিত মশাই এই, 'অসূর্য্যম্পর্শ্যা,' শব্দটা হিন্দুর না মুসলমানের ? যদি মুসলমানের হইত, তাহা হইলে না হয় বলিতে পারিতেন যে, আমাদের দেখা দেখি হিন্দু সমাজে পর্দ্দার কড়াকড়ি হইয়াছে। কিন্তু শব্দটা যে আপনাদের-ই।"

পন্ডিত মহাশয় এ কথার আর প্রতিবাদ করতে পারলেন না। শুধু বললেন ''আপনি ছেলেমানুষ। কিন্তু আপনার কাছে আজ বড় জব্দ হইলাম"।[৮১] জানা যায় ঐ দিন পন্ডিত গগন চন্দ্র ঘোষ মেহেরুল্লাহ্কে 'বিধবা-বিবাহ' সম্পর্কেও একটি প্রশ্ন করেছিলেন। এ প্রশ্নের জবাবেও মুন্শী যে উত্তর দেন, তাতে পন্ডিত প্রবর পুনরায় লা জওয়াব হয়ে যান।[৮২] মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন, বুদ্ধিমান। তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল কিংবদন্তীতুল্য। উর্পযুক্ত পন্ডিত মহাশয়ের সাথে কথোপকথনে তাঁর অসামান্য পান্ডিত্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কুলাঘাটে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মসভাতেও মুন্সী মেহেরুল্লাহ যোগদান করেছিলেন। এটি লালমনিরহাট জংশনের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। নির্ধারিত দিনের সভা সমাপ্তির পূর্বেই প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় মুন্শীর বক্তৃতার ব্যাপারে শ্রোতাদের মনে অতৃপ্তি থেকে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে পরদিন আবার বক্তৃতা করতে হয় বলে শেখ ফজলল করিম উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ সভাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার সন তারিখ উল্লেখ নেই। কবি শেখ ফজলল করিম বলেছেন যে, এ সভাতেই মুন্শী সাহেব তাঁকে 'বিধবা-গঞ্জনা, দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশের কথা বলেছিলেন। বিধবাদের দুঃখ সম্বন্ধে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল কবির লেখা সংগ্রহ করে এটি বাহির করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ফজলল করিম বলেছেন,

> ''এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আমাকেও একটি কবিতা লিখিয়া দিতে বলেন। আমি তাঁহার কথা মত'বিধবা বিলাপ' কবিতা লিখি। কিন্তু উহার অল্পদিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সেই বই আর বাহির হয় নাই।"[৮৩]

মুন্সী মোহম্মদ মেহেরুলাহ মৃত্যুবরণ করেন ১৩১৪ বাং/ ১৯০৭ ইং সনে। শেখ ফজলুল করিমের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, কুলাঘাটের সভাটি তাঁর মৃত্যুর বেশী দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই অনুমান করা যায় যে, সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩১২ বাং সাল বা তার পরে।

বাংলা ১৩১২ সালের ৯ ও ১০ শে বৈশাখ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন ত্রিপুরার পশ্চিম গাওয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এ অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করে ধর্ম ও শিক্ষা বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জণ করেন। অধিবেশন শেষে তিনি ত্রিপুরা জেলার রূপসার প্রসিদ্ধ জমিদার মৌলভী আহমদ গাজী চৌধুরীর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত একটি ধর্ম সভাসহ এ অঞ্চলের আরো বেশ কিছু সভায় বক্তৃতা করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে কুচবিহার টাউন হলে আয়োজিত সভায় মুন্শীর অসাধারণ বক্তৃতার বিষয়টিও স্মরণযোগ্য। কুচবিহারের মহারাজার দেওয়ান বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভাটি উপস্থিত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মেহেরুল্লাহ্র বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য যে, কুচবিহার টাউন হলে প্রদত্ত বক্তৃতার খসড়া বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

আসাম প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মুন্‌শীর অবারিত গতি ছিল। আসামের বিভিন্ন সভায় তিনি বক্তৃতা করেছেন। শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন, ''জীবনে তিনি কত সভা সমিতি করিয়াছেন তাহার ইয়াত্তা নাই। নিখিল বঙ্গের এমন কোন স্থান ছিলনা, যে স্থানে তাঁহার মধুর বক্তৃতা ঝঙ্ক ারে মুখরিত হয় নাই।''[৮৪] মুন্সীর এসব বক্তৃতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণী সংগ্রহ করা গেলে বাংলার মুসলিম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অতি মূল্যবান সংযোজন সম্ভব হতে পারত। কারণ মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ তথাকথিত মোল্লা মৌলানাদের মত বক্তৃতা করতেন না। মুন্‌শী তাঁর বক্তৃতায় ব্যক্তি জীবনের বহু অভিজ্ঞতার কথা, সমাজ-সভ্যতার বিভিন্ন ইতিকথা, সরল-সহজ গ্রাম্য জীবন ও সাধারণ মানুষের সুঃখ-দুঃখের বিবরণ ও তাঁর প্রতিকার বিষয়ে নিজের ভাবনা ও অভিমত প্রকাশ করতেন। মানুষের ইহজাগতিক উন্নতি ও পারলৌকিক মুক্তির পথ নির্দেশ ছিল তাঁর বক্তৃতার উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় এরূপ মহামূলাবান বক্তৃতা সমূহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগৃহিত হয় নি।

(খ) খ্রীষ্টান মিশনারীদের সাথে তর্কযুদ্ধ

যশোর শহরের অর্ন্তগত মজানদী দাড়টানার মোড়ে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র দর্জী দোকান ছিল। তার এ দোকানের সামনে দাড়িয়ে প্রাদ্রীরা প্রায়ই ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, পবিত্র কোরআনের আয়তসমূহের অপব্যাখ্যা এবং মহানবীর পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করতেন। এতে ধর্মপ্রাণ মুন্সী মেহেরুল্লাহ ব্যথিত হন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রয়াসকে ব্যর্থ করার ব্যাপারে তিন মনস্থির করেন। প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, মেহরুল্লাহ্ উপলব্ধি করেছিলেন যে, তর্কযুদ্ধে অবর্তীণ হতে হলে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের দরকার। তাই তিনি নতুন করে জ্ঞান সাধনা আরম্ভ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থাদিসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যেমন- বেদ, উপনিষদ, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল, ও গ্রন্থ সাহেব প্রভৃতি মনোযোগ সহকারে পড়তে শুরু করেন। দার্জিলিং এ অবস্থানকালে 'তোহফাতুল মুকতাদী' নামক গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন ধর্মের এুটিসমূহ অবহিত হন। এ ছাড়া হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ ও বাবু ঈশান চন্দ্র মন্ডল রচিত পূর্বোক্ত পুস্তক সমূহসহ সোলায়মান ওয়ার্সীর রচিত তিনটি গ্রন্থ 'কেন আমি আমার পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম' 'কেন আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিলাম' এবং

Dhaka University Institutional Repository

'প্রকৃত সত্য কোথায়' তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। একই সাথে তিনি পাদ্রীদের প্রচার পুস্তকগুলো সংগ্রহ করে তা থেকে উপাদান নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেন। এরপর তিনি পাদ্রীদের যুক্তি খন্ডনে আর্বিভুত হন।[৮৫]

মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ প্রথমে পাদ্রীদের বক্তৃতাসভায় কিছু বাদ-প্রতিবাদ করতেন। তারপর হাটে হাটে মিশনারীদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে বক্তৃতা শুরু করেন। এ ব্যাপারে তিনি আশাতীত সাফল্য লাভ করেন। শেখ হবিবর রহমানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পাদ্রীদের বিরুদ্ধে মেহেরুল্লাহ্র এরূপ সাহসিকতাপূর্ন প্রচারণায় সাড়া দেশে অদ্ভূত সাড়া পড়ে যায়। এই সাহসী লোকটিকে এ নজর দেখার জন্য তাঁর বক্তৃতা শুনার জন্য আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই ব্যাকুল হয়ে উঠে।[৮৬]

শেখ হবিবর রহমানের উর্পযুক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রচারকার্যে মেহেরুল্লাহ্ খুব সাফল্য লাভ করেন। অল্প দিনের মধ্যে ইসলাম প্রচারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ব্যাপক বিস্তার ঘটে। অচিরেই তিনি একটি প্রচারক দলও সংগঠিত করেন। এ দলে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিলেন যশোহর ঘুরুলিয়ার মুন্শী মোহাম্মদ কাছেম ও ঘোপ গামের মুন্শী গোলাম রব্বানী। প্রচারক জীবনের প্রথম পর্যায়ে তাঁরা মেহেরুল্লাহ্র ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। শেখ হবিবর রহমানের বক্তব্য অনুযায়ী এ দু'জন অনেক সময় স্বতন্ত্রভাবেও তর্কযুদ্ধে অবতীর্ন হতেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের সাথে মেহেরুলাহ্ যে সব তর্কযুদ্ধে অবর্তীন হয়েছিলেন সেগুলোর পূর্নাঙ্গ লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়না। শেখ হবিবর রহমান তিনটি তর্কযুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে একটি হল পিরোজপুরের তর্কযুদ্ধ।

১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসে (১৮৯১ , অক্টোবর) তৎকালীন বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমায় খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সাথে মুন্সী মেহেরুলাহ্র এক বাহাস বা তর্কযুদ্ধ হয়। শেখ হবিবর রহমান একে পাদ্রীদের সাথে মুন্সীর প্রথম প্রকাশ্য তর্কযুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। সমকালীন 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা ও অন্যান্য সূত্রে উল্লেখিত তথ্যমতে, পিরোজপুরের পাদ্রী রেভারেন্ড আর এ স্পার্জন, পাদ্রী টিম্মান ও তাঁদের দোসরগন মুসলমান সমাজকে লক্ষ্য করে কতগুলো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। শেখ

Dhaka University Institutional Repository

হবিবর রহমান বলেছেন, ''খৃষ্টান পাদ্রীগণের এই চ্যালেঞ্জ ইসলামের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিবার লোক সমগ্র বাংলায় খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল।"[৮৭]

মুসলিম বাংলার হক্কানী আলেম সমাজ পাদ্রীদের চেলেঞ্জের কোন সঠিক জবাব দিতে পারেননি বা জবাব দিতে এগিয়ে আসেননি। অবশ্য ইসলাম প্রচারক পত্রিকার বিবরণ মতে মৌলবী ইব্রাহিম সাহেব পাদ্রী স্পার্জনের সাথে বির্তকে লিপ্ত হয়েছিলেন। তবে এ তর্কযুদ্ধে কোন মিমাংসা না হওয়ায় একটি প্রকাশ্য সভায় উভয় পক্ষের প্রাধান্য রক্ষার প্রস্তাব সাব্যস্ত হয়। ১২৯৮ সালের ২১, ২২ ও ২৩ আশ্বিন তুমুল আড়ম্বরে খ্রীষ্টান পাদ্রী ও মুসলমানদের মধ্যে তর্ক যুদ্ধ হয়। মুসলমান পক্ষে নেতৃত্ব দেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পাদ্রীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কোন আলেম যখন এগিয়ে আসতে সাহসী হলেননা, তখন সুধাকর ও ইসলাম প্রচারক পত্রিকার সম্পাদক মুন্শী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ মেহেরুল্লাহ্কে পিরোজপুরের পাদ্রীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য পত্র মারফত অনুরোধ করেন। মেহেরুলাহ্ সানন্দচিত্তে এ আহবানে সাড়া দেন। শেখ হবিবর রহমান বলেছেন- "সেই নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্য বোধদয় পর্যন্ত অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবক যশোহর হইতে সুদূর বরিশাল জেলায় নানা ভাষায় সুপন্ডিত খৃষ্টান পাদ্রীগনের সহিত তর্ক সংগ্রামের জন্য একাকী উপস্থিত হইলেন"[৮৮]

তিন দিনব্যাপী তর্কযুদ্ধে খ্রীষ্টান পক্ষ অসংখ্য প্রশ্ন জাল বিস্তার করে তার উত্তর প্রার্থী হয়েছিলেন। প্রাসঙ্গিক কারণে নিম্নে পাদ্রীদের উত্থাপিত কিছু প্রশ্ন এবং মেহেরুল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর উল্লেখ করা হলঃ ক) পাদ্রীগণ কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন, মুসলমানদের দাবী অনুযায়ী মুহম্মাদ (সাঃ) যদি আল্লাহর প্রিয় বন্ধু ও মানব জাতির মুক্তির দিশারী হন তবে তাঁর প্রিয় বন্ধু ও মানব জাতির মুক্তির দিশারী হন তবে তাঁর প্রিয় দৌহিত্র, পরিবার পরিজন ও অনুসারীদের এরূপ করুণ পরিণতি হল কেন? আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুর দৌহিত্র ও তাঁর বংশের করুণ পরিণতি প্রতিরোধ করলেন না কেন ? আর মুসলমানদের দাবী অনুযায়ী মহানবী যদি পূর্বেই এই ঘটনা অবগত হয়ে থাকেন, তা

Dhaka University Institutional Repository

হলে তিনি এদের রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন না কেন? তাঁরা প্রশ্ন রাখেন এর পরও কি মুসলমানরা মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহর বন্ধু বলে দাবী করবেন ?[৮৯]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ পাদ্রীর উর্পযুক্ত প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছিলেন তা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা নয় বটে তবে এতে তাঁর গভীর ধী-শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে,

> ''আখেরী নবী হযরত রসুলুল্লাহর পরিবারবর্গের প্রতি মমত্ববোধ করে পাদরী সাহেব সত্যিই আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু পরের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে তারা নিজেদের ঘরের কথা ভুলে গেছেন। রসূলুল্লাহ যখন এই দুঃসংবাদ আল্লাহর কাছে জানতে গেলেন, আল্লাহ্তায়ালা গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, দোস্ত তুমি তো তোমার নাতি- নাতনীদের কথা ভাবছো, এদিকে খৃষ্টানরা যখন আমার পেয়ারা যীশুকে (যারা তাঁকে আমার পুত্র বলেন) ক্রুশে বিধে মেরে ফেললো, আমি স্বয়ং খোদা হয়েই বা তার কি করতে পারলাম ! পাদরী সাহেবেরা আমার সমস্ত ক্ষমতাই কেড়ে নিয়েছে।''[৯০]

বলা বহুল্য যে, মুন্সীর এ জবাবে পাদ্রীরা নিরুত্তর হয়ে গিয়েছিল। এ তর্কসভাতে পাদ্রী স্পার্জন যীশুখ্রীষ্টকে আল্লাহ্র পুত্র প্রমানার্থে ব্যাখ্যা দেন যে, 'পুত' ধাতুর 'এ' প্রত্যয়ান্তে 'পুত্র' শব্দ নিস্পন্ন হয়েছে অর্থ্যাৎ 'পুত' নামক নরক ত্রাণ দেন যিনি তিনিই পুত্র সুতরাং যীশু খ্রীষ্ট যখন সমুদয় গোনাহগার নর-নারীকে নরক যন্ত্রনায় পরিত্রাণ প্রদনার্থে জগতে আর্বিভুত হয়েছেন, তখন বাংলা ব্যাকরণের সন্ধি ও সূত্রানুসারেও যীশু ইশ্বরের পুত্র প্রমাণীত।[৯১]

পাদ্রীর এ প্রশ্নের জবাবে মেহেরুল্লাহ্ বাঙ্গাঁলা অভিধান ও ব্যাকরণের সূত্র ব্যবহার ছাড়াও হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের ব্যবহার করে খ্রীষ্টান পাদ্রীর প্রশ্নের অসারত্ব প্রমাণ করেন। শুধু তাই নয় তিনি যীশুর প্রতি এরূপ আখ্যা আরোপ যুক্তি সঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত কি-না সে বিষয়ে পাদ্রীর নিকট প্রশ্ন রাখেন।[৯২] বলা বাহুল্য যে, পাদ্রী স্পার্জন মুন্সীর জ্ঞান গর্ভ জবাব ও পাল্টা প্রশ্নের প্রতি উত্তর দানে ব্যর্থ হন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশ্নের জবাবে মুন্শীর প্রদত্ত উওরের মাধ্যমে অন্য ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞান সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী, মেহেরুল্লাহ্ বাহাসে খ্রীষ্টান পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রায় সকল প্রশ্নেরই যুক্তিপূর্ণ ও সুন্দর জবাব দেন। এতে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মুগ্ধ হন। সভাশেষে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তিনি হযরত ঈসা (আঃ) যে স্বয়ং খোদাতায়ালা তা প্রমাণ করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

পাদ্রাদের বলেন। কিন্তু তাঁরা এতে ব্যর্থ হন। পাদ্রী স্পার্জন, পাদ্রী হাসান আলী, পাদ্রী ঈশান মন্ডল "আমাদের আর সময় নাই, আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমাদিগকে ক্ষমা করুন" এই কথা বল্লে তর্কসভা শেষ হয়। এভাবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করে ইসলামের গৌরব পতাকা উত্তোলন করেন। মুন্শীর ক্ষমতা ও খ্যাতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র সাথে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের এ তর্কসভার বিবরণ ইসলাম প্রচারক পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১২৯৮ -এ 'মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান তর্কযুদ্ধ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই তর্কসভায় ৫জন বিশিষ্ট হিন্দু পন্ডিত মধ্যস্থ থেকে প্রস্তাবিত বিষয় সমূহের মীমাংসা করেছিলেন বলে জানা যায়। ১২৯৯ সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় এ মীমাংসা পত্রটি মুদ্রিত হয়েছিল।

পিরোজপুর তর্কসভার এক বছর পর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীনের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এটি ছিল মূলত মসীযুদ্ধ। এটি মেহেরুল্লাহ্র জীবনের একটি চমকপ্রদ ঘটনা। উল্লেখ্য যে, জন জমিরুদ্দীনের আসল নাম মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন। তিনি তৎকালীন নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার অধিবাসী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম হওয়ায় প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ। কিন্তু আমঝুপি খ্রীষ্টান স্কুলে (কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুল) পড়ার সময় তিনি খ্রীষ্টান মিশনারীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। জমিরুদ্দীন নিজেই বলেছেন,"তাহাদিগের (মিশনারীদের) প্রচার শুনিয়া ও পুস্তকাদি পড়িয়া ইসলাম ধর্মে সন্দেহ ও খ্রিষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস হয়।"[১৩] আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' নামক গ্রন্থে শেখ জমিরুদ্দীন তাঁর খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "পরিশেষে অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া রীতিমত খ্রীষ্টীয়ান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খ্রীষ্ট ধর্মে সম্পূর্ন বিশ্বাসী হইয়া প্রিয় আত্মীয় স্বজনের অবাধ্য হইয়া ও তাহাদের মনে অতীব কষ্ট দিয়া ১৮৮৭ সালের ২৫ ডিসেঃ রবিবার অপরাহ্নে পাদ্রী সলিভান সাহেব কর্তৃক বাপ্তাইজ হইয়া খ্রীষ্ট সমাজভূক্ত হইলাম"।[১৪]

জমিরুদ্দীন মোট আট বছর খ্রীষ্টান সমাজভুক্ত ছিলেন। তিনি এলাহাবাদস্থ সেন্ট পল্স্ ডিভিনিটি কলেজে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার বা মিশনারী বিদ্যা শিক্ষা করেন। এখানে অধ্যয়ন শেষে তিনি H.G.R (Higher Grade of Reader) বা 'পাঠকরত্ন' উপাধি লাভ করেন। অতঃপর খ্রীষ্টান পাদ্রীদের

Dhaka University Institutional Repository

চিরাচরিত নিয়মানুসারে সমগ্র দেশে তিনি যীশুর মহিমা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সুমধুর বক্তৃতা দ্বারা নিরীহ জনসাধারণকে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বাণ জানাতেন। একই সঙ্গে তিনি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে লেখনীর ব্যবহার করে বহু মুসলমানকে বিভ্রান্ত করেন এবং খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন।[৯৫]

১৮৯২ সালে 'খৃষ্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় জন জমিরুদ্দীনের প্রকাশিত একটি নিবন্ধকে কেন্দ্র করে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সাথে তাঁর কলম যুদ্ধ শুরু হয়। জন জমিরুদ্দীন তখন এলাহাবাদ ডিভিনিটি কলেজে 'First Year' এর ছাত্র। এ সময় তিনি 'আসল কোরাণ কোথায়? শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। খ্রীষ্টান মাসিক পত্রিকা 'খৃষ্টীয় বান্ধব' এর জুন সংখ্যা ১৮৯২ সালে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে জমিরুদ্দীন প্রচলিত কোরআনের অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে ছয় দফা যুক্তি উপস্থাপন করেন। আবুল হাসান তাঁর রচনায় ছয়দফার স্থলে সাত দফা যুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শেখ হবিবর রহমান তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে এ প্রবন্ধটি হুবহু তুলে ধরেছেন। সেখানে ছয় দফা যুক্তি দেখা যায়। যা হোক জমিরুদ্দীন তাঁর এ প্রবন্ধে বহু কূট যুক্তি ও বাকজালের সাহায্যে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, বর্তমান মুসলমান সমাজে প্রচলিত কোরআন শরীফ আসল নয়; আসল কোরআন শরীফ মুসলিম জগতের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) এর শাসনামলে তাঁর নির্দেশে অগ্নীদগ্ধ করা হয়েছে। তদস্থলে যে কোরআন আসল বলে চালানো হয় তাতে মূল কোরআনের অনেক অংশ এমনকি একটি পূর্নাঙ্গ সূরা পর্যন্ত বর্জিত হয়। তাই তিনি প্রশ্ন করেন 'আসল কোরাণ কোথায়'?[৯৬] চতুর প্রবন্ধকার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মুসলমানদের হাদিস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন। প্রবন্ধের শেষে তিনি মন্তব্য করেন যে, এ সম্পর্কে তিনি আরো অনেক প্রমাণ দিতে পারেন। তবে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ব্যাপারে সম্পাদকের বিধি-নিষেধের কারণে তিনি এ পথে আর অগ্রসর হন নাই। বরং তাঁর উক্ত ছয়টি প্রমাণের ভিত্তিতেই তিনি মুসলমানদের কছে আসল কোরন কোথায় -এ প্রশ্ন রাখেন। এ প্রবন্ধে কিছু মূদ্রণ প্রমাদ ছিল, প্রবন্ধকার এগুলো সংশোধন করেন। ১৮৯২ সালের জুলাই মাসে খৃষ্টীয় বান্ধব পত্রিকায় এ সংশোধনীটি ছাপা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসংঙ্গত উল্লেখ করা আবশাক যে, মুসলমান মাত্রেরই দৃঢ় মিশ্বাস, এ পর্যন্ত কোরআনশরীফের কোন অক্ষরের এমন কি কোন হরকতেরও পরিবর্তন হয় নাই। কোরআন শরীফে স্বয়ং আল্লাহ নিজেই নিজেকে কোরআনের সংরক্ষক বলে ঘোষনা দিয়েছেন। একজন খৃষ্টানপাদ্রী ইসলামী শাস্ত্র ও ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা এ কোরআনকে যখন জাল প্রমাণের চেষ্টা করলেন তখন বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায় ভীতি বিহবল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন।[৯৭] মুসলিম সমাজের এরূপ সংকটকালে এদেশের আলেম সমাজ কোথায় ছিলেন? শেখ হবিবর রহমানের বর্ণনাতেই এ প্রশ্নের জবাব আছে। তাঁর ভাষায়;

> "এ শ্রেণীর শাস্ত্রীয় এবং জ্ঞানগর্ভ তর্ক সমরে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা এদেশের সাধারণ আলেম সমজের ছিল না। জ্ঞান থাকিলেও ভাষার অভাবে তাহা প্রকাশের সাধ্য ছিল না। বিশেষতঃ খ্রীষ্টান পাদ্রীগন রাজার ধর্মাবলম্বী, ইংরাজী এবং অন্য নানা ভাষায় তাঁহারা সুশিক্ষিত বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুসজ্জিত। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইবার সাহসই অনেকের হইত না।"[৯৮]

বাংলায় ইসলামের এই মহাসংকটময় মুর্হুতে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধংদেহী রবে পাদ্রীর মোকাবিলায় অগ্রসর হন। জন জমিরুদ্দীনের কলমের জবাবে তিনিও কলম ধরেন। পাদ্রী জন জমিরুদ্দীনের 'আসল কোরান কোথায়'? শীর্ষক প্রবন্ধের জবাবে মেহেরুল্লাহ্ 'ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোকা ভঞ্জন' নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। 'সুধাকর' পত্রিকায় (১৯ চৈত্র/১২৯৯/১৮৯২ খৃঃ) মুন্শীর প্রবন্ধটি প্রকাশ করে। প্রবন্ধটি ছিল নিঃসন্দেহে গবেষণাধর্মী। এতে মুন্শীর সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি শেখ জমিরুদ্দীন রচিত প্রবন্ধের উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর ভাষায়,

> ''লেখক জন জমিরুদ্দীন শেখ মহাশয় পাদ্রী ফান্ডারকৃত মিজানউল-হক ও (উর্দ্দু) পাদ্রী আমানুদ্দীন প্রনীত তালিমে মোহাম্মদী (উর্দ্দু) এবং পাদ্রী য্যাকব কান্তিনাথ বিশ্বাস কৃত 'এসলাম দর্শন' (বাঙালা) ইত্যাদি গ্রন্থসমূহের আশ্রয় লইয়া সংশয়শূন্য মহাকোরানের প্রতি অযথা আক্রমণ ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বোধকরি ঈসাই সমাজের 'ট্যাংরা বাবুদের নিকট অগন্য ধন্যবাদও পাইয়াছেন।''[৯৯]

এরপর তিন উর্পযুক্ত পন্ডিতদের গ্রন্থের প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থান হতে মুসলমান আলেমগন যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। তিনি ব্যঙ্গাত্বিক ভাষায় জন জমিরুদ্দীনকে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বসারীদের লেখার নকলকারী হিসাবে প্রতিপন্ন করে তাঁর উত্থাপিত ছয়টি প্রশ্নের দফা ওয়ারী জবাব দেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ অত্যন্ত নিপূনতার সাথে কোরআন গবেষণার সর্বাধুনিক তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে জমিরুদ্দীনের ধোকাভঞ্জন করতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে তিনি জমিরুদ্দীন কর্তৃক বিকৃতভাবে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রমানাদির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেন। প্রবন্ধ শেষে তিনি বলেন,

> "আশাকরি যখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কোরানের আসলত্বে কোন প্রকারেই কোন গোলমাল হয় নাই। আজ আমরা তর্করূপ রণ প্রান্তরে দন্ডায়মান হইয়া সগর্ব্বে উচ্চৈস্বরে বলিতে পারি যে, যদি ঘটনাক্রমে একই সময়ে জগতের সমস্ত লিখিত কাগজপত্র প্রস্তর ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তবে পৃথিবীস্থ অন্য কোন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ অঙ্গহীন অবস্থায় ব্যতীত পাওয়া যাইবে না। কেবল কোরান শাস্ত্রই সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ অটলভাবে বিদ্যমান থাকিবে; তাহার আসলত্বের বিন্দু বিসর্গও ক্ষতি হইবে না। খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুগন ধর্ম্মতঃ বল দেখি, তোমরা বাইবেলের বলে এরূপ সাহস বাঁধিতে পার কি?"[১০০]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র পূর্বোক্ত প্রবন্ধের উত্তরে জন জমিরুদ্দীন একটি প্রতিবাদ লিপি রচনা করেন। ২৩ বৈশাখ, ১৩০০ সালে 'সুধাকর' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। জন জমিরুদ্দীনের এ লেখাটি ছিল মূলতঃ পুরনো প্রবন্ধের চর্বিত চর্বনমাত্র। এতে তিনি এ মর্মে অভিযোগ করেন যে, মুন্‌শী সাহেব তাঁর প্রশ্নের সঠিক মর্ম বুঝতে পারেন নি, ফলে সঠিক জবাব না দিয়ে অনর্থক কটুক্তি করেছেন। প্রবন্ধে তিনি পুনরায় কোরআন শরীফের বিকৃতির কথা তুলে ধরে শিয়া-সুন্নীদের কুরআনের মধ্যেই যে পার্থক্য রয়েছে সে ব্যাপারে আলোকপাত করেন। পরিশেষে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র প্রতি তিনি আবেদন জানান- "ভাই মোহাম্মদী, আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। যাহা সত্য তাহা গ্রহণ করুন। তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে।"[১০১]

জন জমিরুদ্দীনের প্রতিবাদের জবাবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ পুনরায় কলম ধরেন। এবং 'সর্ব্বত্রই আসল কোরআন' শিরোনামে আরেকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৭ আষাঢ় ১৩০০ সালে সুধাকর পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধে জন জমিরুদ্দীনের অভিযোগ খন্ডন করেন এবং তার পূর্বোক্ত প্রবন্ধতেই যে ছয়টি প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়েছেন তা স্মরণ করিয়ে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

কোরআন শরীফের পরিবর্তনশীলতা প্রমাণের জন্য জন জমিরুদ্দীন নতুন করে যে সব যুক্তি অবতারণা করেন মুন্সী সে সবেরও অসারত্ব প্রমাণ করেন। প্রবন্ধ শেষে তিনি বলেন যে,

> ''ঈসাই বন্ধুকে আমরা অনুরোধ করি, তিনি পৃথিবীর সমস্ত দেশের কোরান একত্র করিয়া পরস্পর ঐক্য করিয়া দেখুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নহে। তাই বলি সর্ব্বত্রই আসল কোরান।"[১০২]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র 'সর্ব্বত্রই আসল কোরাণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর জমিরুদ্দীন এ বিষয়ে আর কোন বাদ প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেননি। আবুল হাসানের বক্তব্য মতে, ''মেহেরুল্লাহ্‌র এই যুক্তিনিষ্ট জবাব জমিরুদ্দীনের মনে গভীর দাগ কাটতে সক্ষম হয়। এই সময় থেকে তাঁর অর্ন্তজগতে ক্রমশঃ ভাবান্তরের আভাষ দেখা দেয়।"[১০৩]

উল্লেখ্য যে, মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে এ তর্ক-বির্তকের বছরই কুষ্টিয়া অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকালে জমিরুদ্দীনের মনে বাইবেলের অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সংশয় জাগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সত্য ধর্মের অন্বেষনে তাঁর চিত্ত চঞ্চল ও কাতর হয়ে পড়ে। তাঁর মনে সত্য ধর্ম অন্বেষণের আকাংখা প্রবল হওয়ায় এ অবস্থায় তাঁর অন্তরের ধর্ম জিজ্ঞাসা তাঁকে এক সময় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তিনি বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান শুরু করেন। জমিরুদ্দীনের ভাষায়,

> "তাহার পরে অনেকানেক গ্রন্থ পাঠে, বিশেষ আমার পরম ভক্তিভাজন মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবকৃত 'রদ্দে খ্রীষ্টীয়ান ও দলিলোল ইসলাম" ও শ্রীযুক্ত মেহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ ও শেখ আব্দুর রহিম সাহেব কৃত 'ইসলামতত্ব' ১ম ও২য় খন্ড পাঠ করনান্তর পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়।"[১০৪]

এরপর তিনি নিজ বাড়ীতে এসে আত্মীয় স্বজন সমক্ষে মৌলবী রেয়াজ উল হক কর্তৃক ইসলাম ধমে দীক্ষিত হন। জমিরুদ্দীনের ইসলামধর্মে পুনঃ প্রবর্তনকে রক্ষণশীল সমাজ প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁকে বেশ কিছুদিন একঘরে হয়ে থাকতে হয়। সমাজের এ অযৌক্তিক বৈরী মনোভাবের কারণে তাঁকে ঋণে আবদ্ধ এবং তাঁর অগ্রজকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। জমিরুদ্দীনের এ দুর্দিনে মোহাম্মদ রেয়াজদ্দীন আহমদের পরামর্শে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ করেন। জমিরুদ্দীনের পত্রের জবাবে মেহেরুল্লাহ্‌ ১২ ই বৈশাখ ১৩০৪ ও ১৭ ই বৈশাখ ১৩০৪ সালে পর পর দুটি চিঠি লিখেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিঠিতে তিনি জমিরুদ্দীনকে ধর্মপ্রচার ও ধর্ম বিষয়ক পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাসও দেন। জমিরুদ্দীন মেহেরুল্লাহ্‌র আহবানে সাড়া দেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর প্রধান সহচর হিসেবে আমৃত্যু নিজের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সেবা করেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র বিশেষ যত্ন, চেষ্টা ও সাহায্যে তিনি ঋণমুক্ত হন। উল্লেখ্য যে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত দু'জনে একসঙ্গে অসংখ্য সভা সমিতিতে যোগদান করেছেন। জমিরুদ্দীনের সক্রিয় সহযোগিতা মেহেরুল্লাহ্‌র মিশনকে আরো গতিময় ও ফলপ্রসু করে তুলেছিল। এই সময়কালে বলা চলে জমিরুদ্দীন ছিলেন মেহেরুল্লাহ্‌র ছায়াসঙ্গী।

রেভারেন্ড জন জমিরদ্দীনের ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরের ঘটনা। নদীয়া জেলার ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের প্রসিদ্ধ জংশন ষ্টেশন রানাঘাট। এখানকার পাদ্রী মনরো ও তাঁর সহকর্মীগন ছিলেন ইসলাম ও মুসলমানদের জঘন্যতম শত্রু। উক্ত পাদ্রী ও তাঁর সহযোগীরা রানাঘাটে একটি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে স্থানীয় দরিদ্র লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পাদ্রীদের এরূপ কর্মের পশ্চাতে জনসেবার মহৎ উদ্দেশ্য অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার আকাংখাই ছিল প্রবল। শেখ হবিবর রহমানের বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তার ভাষায়, "উপকারপ্রাপ্ত, কৃতজ্ঞ, নিরীহ, দরিদ্র গ্রামবাসীদের নিকট যীশুর দয়ার মহিমা প্রচার করিয়া নানা কৌশলে হিন্দু মুসলমানকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত।"[১০৫]

400411

উল্লেখ্য যে, পাদ্রী মনরো 'সত্য ধর্ম্ম নিরূপন' নামে একটি পুস্তকও রচনা করেন। এতে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে লম্পট, প্রবঞ্চক ও ধূর্ত বলে চিহ্নিত করা হয়। আর ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়, "কোরাণের ধর্ম্ম মানুষ্যের যোগ্য নহে, কিন্তু শুকরের ধর্ম্ম।"[১০৬]

পাদ্রী মনরো ও তাঁর সহযোগীদের এরূপ ধৃষ্টতায় রানাঘাটের মুসলমান সমাজে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ক্ষিপ্ত মুসলমানগন পাদ্রী মনরোকে বাহাস বা তর্ক যুদ্ধে আহবান জানান। মনরো সদর্পে এ আহবানে সাড়া দেন। মনরোর দাতব্যালয়ের নিকট আমবাগানের বির্তকের স্থান নির্ধারন করা হয়। পাদ্রীদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার সমস্ত ঘটনা জানিয়ে স্থানীয় মুসলমানগন রানাঘাটের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বাহাসে উপস্থিত হওয়ার জন্য মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌কে আমন্ত্রণ জানান। মুন্‌শী সাহেব সানন্দচিত্তে এতে সম্মতি জানান। মনরোর সাথে বাহাসের জন্য মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌, শেখ জমিরুদ্দীন ও শান্তিপুরের কবি মুজাম্মেল হক সহ রানাঘাটে পোঁছান। ১৪ ই মার্চ ১৮৯৭ (চৈত্র,১৩০৪) বাহাসের নির্ধারিত দিনে তর্ক সমর উপভোগ করতে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত হন। মুসলমানদের ঐকান্তিকতাপূর্ন আহবাণ সত্বেও পাদ্রী মনরো শেষ পর্যন্ত বাহাস স্থলে উপস্থিত হননি। পাদ্রী মনরোর অনুপস্থিতি সম্পর্কে কবি মোজাম্মেল হক সুধাকর পত্রিকায় লিখেছেন, ''বড়ই বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়, যিনি মাঠ-ময়দান অতিক্রম করিয়া কষ্ট সহ্য করতঃ দূরবর্ত্তী কৃষক পল্লীতে যাইয়া খৃষ্টপ্রেম বিতরণ করিতে পারেন, তাঁহারা এই স্থানে গৃহের সম্মুখে আসা হইল না।''[১০৭]

উল্লেখ্য যে,কোনরূপ শান্তিভঙ্গের আশংকা ছিল না; পুলিশ প্রহরী ঘটনাস্থলে যথেষ্ট উপস্থিত ছিল। তথাপি পাদ্রী সাহেব কেন তথায় উপস্থিত হন নাই, সে কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। পাদ্রী মনরোর অনুপস্থিতির কারণে রানাঘাটের বির্তক সভাটি শেষ পর্যন্ত ধর্মসভায় রূপান্তরিত হয়। এতে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ ও তাঁর অনুচর মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন ৬-৭ ঘন্টা ধরে ইসলামের মহাত্ম্য ও খ্রীষ্টান ধর্মের অসারতা প্রসঙ্গে প্রানস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত জনসাধারণকে মুগ্ধ করেন। কবি মোজ্জামেল হক সুধাকর পত্রিকায় এ সভার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।[১০৮]

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সাথে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রকাশ্য তর্কযুদ্ধের আর কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। মুহম্মদ আবু তালিব একে খ্রীষ্টান মুসলমানের শেষ উল্লেখযোগ্য তর্ক-যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত এ তর্কযুদ্ধে পর খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আর প্রকাশ্যে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সাথে তর্ক সমরে অবর্তীণ হওয়ার সাহস দেখায়নি। তাই বলে তারা যে একেবারে প্রচারকার্য বন্ধ করে দিয়েছিল, তেমনটি ভাববার কোন কারণ নেই। মিশনারীরা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। আর মেহেরুল্লাহও্‌ তাদের প্রতিহত করণে সচেষ্ট থাকেন। নানাস্থানে তাঁর হাতে পাদ্রীদের শোচনীয় পরাজয় কাহিনী তৎকালীন সংবাদপত্রে মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, যেখানেই খ্রীষ্টান মিশনারীদের উৎপাত দেখা যেত মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ সেখানেই উপস্থিত হয়ে তাদের প্রতিহত করতেন। এ প্রসঙ্গে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁর প্রচার কার্যক্রমের বিষয়টি অবতারণা করা যেতে পারে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার কলিকাতার একটি উলেখযোগ্য স্থান। মুসলমানগন চলতি কথায় একে 'গোলতালাব' বলতেন। সে সময় বিভন্ন স্কোয়ার বিশেষতঃ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা নিয়মিতভাবে ধর্মপ্রচার করতেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ এ সংবাদ জানতে পেরে তার সহযোগী মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় যান এবং মুনশী শেখ রেয়াজুদ্দীনের বাড়ীতে থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পাদ্রীদের পাল্টায় বক্তৃতা করতে থাকেন। ফলে পাদ্রীদের অপচেষ্টা অনেকটা নিষ্ফল হয়।

যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমাতে পাদ্রীগন একটি খ্রীষ্টান মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেখানকার মুসলমানগন মেহেরুল্লাহ্কে বিষয়টি অবহিত করেন এবং তাঁকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রন জানান। মুন্শী সেখানে যান এবং একটি সভা করে মিশনারীদের উদ্দেশ্য পন্ড করে দেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র সাথে খ্রীষ্টান মিশনারীদের উর্পযুক্ত প্রকাশ্য তর্কযুদ্ধ ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য বাহাসের সংবাদ পাওয়া না গেলেও মুহম্মদ আবু তালিব কয়েকটি অপ্রধান বাহাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এসব বাহাসের উল্লেখিত সূত্র প্রচলিত জনশ্রুতি। উল্লেখা যে, এসব বাহাসের স্থান ও প্রতিপক্ষ পাদ্রীদের নামোল্লেখ নেই। অনেক ক্ষেত্রে পাদ্রীরা অন্যকে যে সব প্রশ্ন করেছেন মেহেরুল্লাহ্ তাদের পক্ষ থেকে এসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। সে যা হোক, প্রাসঙ্গিক বিধায় নিম্নে এরূপ বাহাসের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

কথিত আছে যে, একবার এক পাদ্রী যীশুখ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার লক্ষ্যে মুন্শীকে বললেন যে, খ্রীষ্টানদের নবী ঈসা (আঃ) চতুর্থ আকাশে অবস্থান করছেন, কিন্তু মুসলমানদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) সাধারণ লোকের ন্যায় পৃথিবীর মাটিতে সমাহিত আছেন। সারবান এবং মূল্যবান বস্তুকে মালিক চিরদিনই উচ্চে স্থান দিয়ে থাকেন এবং সযত্নে রক্ষা করেন।এ ক্ষেত্রে কোন নবী শ্রেষ্ঠ ? পাদ্রীর এ প্রশ্নের জবাবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ তাৎক্ষনিকভাবে বলেন যে, আপনাদের পয়গাম্বর আপনাদেরকে

পৃথিবীতে রেখেই আকাশে চলে গেছেন। কিন্তু অমাদের পয়গাম্বর আমাদের সকলকে না নিয়ে স্বর্গে যাবেন না। সে জন্যই আমাদের সকলের প্রতীক্ষায় পৃথিবীতে অবস্থান করছেন; কেয়ামতের দিন সমস্ত ধার্মিক মুসলমানকে নিয়ে স্বর্গে যাবেন। আবু তালিব যীশুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে মুন্সীর প্রদত্ত ভিন্নতর দুটি উত্তরের উল্লেখ করেছেন। তন্মেধ্যে একটি সূত্র বোল্টন ও হোসেন রচিত 'ছোট থেকে বড়' নামক গ্রন্থ। এ সূত্রানুযায়ী মেহেরুল্লাহ্ পাদ্রীর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, আমরা জানি সারবান বস্তুই ভারী হয়, তা হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার মত নয়। এটি আধুনিক বিজ্ঞানেরই কথা, পক্ষান্তরে ফাঁপা এবং হালকা জিনিসই হাওয়ায় উড়ে যায়, যেমন-বেলুন। যীশু হালকা জিনিস বলেই উড়ে গেছেন, আর নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে সযত্নে মাটিতে রাখা হয়েছে। তাছাড়া আখেরী নবী তাঁর উম্মতদেরকে ভালোবাসেন বলে তাদের ফেলে চতুর্থ আকাশে যেতে রাজী হননি। এ থেকে কে শ্রেষ্ঠ তা নিরূপন করুন। আবু তালিব উদ্ধৃত মুন্সীর অপর জবাবটির তথ্যসূত্র মুন্সীর পুত্র মোখলেসুর রহমান। তিনি এটি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শুনেছিলেন বলে দাবী করেছেন। তাঁর বিবৃত জবাবটিতেও মুন্শী পূর্বোক্ত দুটি জবাবের ন্যায় আখেরী নবীর উম্মত প্রীতি এবং এজন্য তাঁর পৃথিবীতে অবস্থনের কথা উল্লেখ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের প্রয়াস পেয়েছেন। বলা বাহুল্য মুন্সীর এরূপ কৌতুকপ্রদ অথচ যুক্তি নির্ভর জবাবে পাদ্রী লা-জাওয়াব হন। তিনি আর কোন প্রতিবাদ করতে পারেন নি।

আল্লাহ্র পাক-জাত সম্পর্কে জনৈক পাদ্রীর সঙ্গে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র বাহাসের ঘটনাটিও চিত্তাকর্ষক। মুসলমান মাত্রই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বভুতে বিরাজমান। একদা জনৈক পাদ্রী মুন্শী সাহেবকে প্রশ্ন করলেন যে, আল্লাহ যদি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতে বিরাজমান থাকেন তবে নিশ্চয়ই তিনি সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ এমনকি মলমূত্রের মধ্যেও আছেন। মুন্সী সাহেব তাতে সম্মতি জানালেন। পাদ্রী বললেন যে, যিনি অপবিত্র বস্তুর মধ্যে অবস্থান করেন তিনি তো নিজে অপিবিত্র হয়ে যান। মেহেরুল্লাহ এ ব্যাপারে দ্বি-মত পোষণ করে বলেন যে, আল্লাহ 'জাত-পাক'। কোন অপবিত্রতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। পাদ্রী এর প্রমাণ দেখতে চাইলে তিনি যে ঘটনার অবতারণা করেন তা বিস্ময়কর এবং তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জলন্ত উদহারণ। পাদ্রীর দাবী অনুযায়ী পরদিন প্রমাণ

Dhaka University Institutional Repository

দেখানোর উদ্দেশ্য একটি মাটির হাড়িতে সদ্যকৃত প্রশ্রাব নিয়ে হাজির হন। তিনি পাদ্রীকে হাড়ির ভিতর দেখতে বলেন। মুন্সীর কথামত তিনি ভিতরে দৃষ্টিপাত করলেন। এতে তাঁর প্রতিবিম্ব ভেসে উঠল। তখন মুন্সী পাদ্রীকে নতুন সাবান দিয়ে মুখখানা ভাল করে ধুয়ে আসতে বলেন। কেননা হাড়ির অপবিত্র প্রশাবে প্রাদ্রীর মুখ দেখা গেছে, তাই পাদ্রীও অপবিত্র হয়ে গেছেন। পাদ্রী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, মুখ দেখা যাচ্ছে তাতেই নাপাক হয়ে গেল। মুন্সী তখন পাদ্রীকে তাঁর নিজের কথা স্মরণ করে দিয়ে বললেন যে, মুত্রের মধ্যে আল্লাহর অবস্থিতি থাকলে আল্লাহ যদি অপবিত্র হয়ে যান তবে পাদ্রীর কেন হবে না। মুন্সীর এ কথা শুনে পাদ্রী নিরত্তর হয়ে যান। এরপর পাদ্রীকে লক্ষ্য করে মুন্শী বলেন যে, পাক-জাত আল্লাহ্ সকল সৃষ্টির মধ্যেই নিজেকে বিস্তারিত করে রেখেছেন। এবং সবকিছুর মধ্যে থেকেও তিনি সবার উর্ধ্বে আছেন। প্রকৃত চোখ নেই বলে আমরা দেখতে পাইনা।আবু তালিব উদ্ধৃত এ গল্পটির সূত্র হিসেবে মেহেরুল্লাহ্র 'জওয়াবোন্নাছারা' গ্রন্থের পরবর্তী একটি সংস্করনের প্রকাশকের ভূমিকার কথা বলেছেন। মুন্সী সাহেবের পুত্র মুখলেসুর রহমানও এটিকে তাঁর বাবার জীবনের একটি ঘটনা হিসেবে দাবী করেছেন বলে আবু তালিব উল্লেখ করেছেন।[১০৯] মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের পরিচয় সম্বলিত এরূপ আরো বহু ঘটনা বাংলায় প্রচলিত আছে। এসবের কোন কোনটি হালকা রসাত্মক হলেও এর নিগূঢ় অর্থ ছিল তাৎপর্যময়। যার মাধ্যমে তিনি প্রতিপক্ষের যুক্তিকে শুধু অসারই প্রমাণ করেননি, ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমান করেছেন।

শুধু খ্রীষ্টান পাদ্রী নয়, জীবনে তাঁর সাথে বহু মতের, বহু পথের লোকের সাক্ষাতৎ হয়েছে। তাদের সাথে তর্ক-বির্তক হয়েছে। তিনি বহু বাজে তর্কের মুখোমুখি হয়েছেন। অথচ এসব বির্তকের কোনটিতেই তিনি পরাজিত হয়েছেন, এ রকম জানা যায়না। শেখ হবিবর রহমান উল্লেখ করেছেন, একবার এক হিন্দু ভদ্রলোক মুন্শী সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন, গোমাংস ভক্ষণ কি ভাল ? মুন্সী সাহেব বললেন কেন নয় ? গোবর ভক্ষনে যদি হিন্দুর মহাপাপের প্রায়াশ্চিত্য হতে পারে তবে যারা গো-মাংস ভক্ষণ করে কেন তাদের সমস্ত জীবনের পাপ ক্ষয় হবে না। গোবর অপেক্ষা কি গো-মাংস অধিক সারবান নয়?[১১০] বলার অপেক্ষা রাখে না প্রশ্নকারী আর কোন কথা বলতে পারলেন না।

উনিশ শতকের শেষার্ধে 'বিধবা বিবাহ' নিয়ে বাঙালী হিন্দু সমাজে তোলপাড় শুরু হয়। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের চেষ্টায় হিন্দু সমাজে বিধবা বিাহের কিঞ্চিত প্রচলন হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ নিজেও বিধবা বিবাহের একনিষ্ট সমর্থক ছিলেন। আর ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ বে-আইনী নয়। বিধবা বিবাহ নিয়ে হিন্দু সমাজে যখন তুমুল বির্তক এ সময় মেহেরুল্লাহ্ একবার কাকিনাতে ধর্মসভায় বক্তৃতা করতে যান। কাকিনার মহারাজা মহিরারঞ্জন এ সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সভার পরদিন কবি শেখ ফজলল করিমের বাড়ীতে ঘরোয়া আলোচনায় কাকিনা স্কুলের হেডপন্ডিত গননচন্দ্র ঘোষ মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিধবা বিবাহের সমালোচনা করে বলেন, এ প্রথা চালু থাকলে সতিত্বের আর কি মর্যাদা থাকলো?

মুন্সী মেহেরুলাহ্ পন্ডিত মহাশয়ের মন্তব্য শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললেন আপনাদের দ্রৌপদী সতী একই সঙ্গে পাঁচ পতির ঘর করেও সতীরত্ন ছিলেন। আপনাদের কুন্তী প্রভৃতি দেবীর কথা নাই বা বললাম। এরা যদি একসঙ্গে একাধিক পতী উপ-পতির ঘর করেও সতী থাকেন, তাহলে বিধবা নারীর একটি পতি থাকলে আপত্তির কি আছে? বিধবা নারী মানেই তো পতি হারা নারী ! একটু ভেবে দেখুনতো কোনটি ভাল?'''[১১] হিন্দু দেবীদের উপমা ব্যবহার করে মুন্শীর প্রদত্ত এ তাৎক্ষনিক জবাবে পন্ডিত প্রবর হতবিহবল হয়ে পড়েন। তিনি এর কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। একই পন্ডিত মহাশয় কর্তৃক মুসলমান সমাজে প্রচলিত 'পর্দা প্রথা' সম্পর্কে করা প্রশ্ন এবং মুন্সীর উত্তটিও চিত্তাকর্ষক। সে যা হোক মুন্সীর উত্তরে বিব্রত পন্ডিত আর কোন প্রতিবাদ না করে শুধু বললেন -''আপনি ছেলে মানুষ, কিন্তু আপনার কাছে আজ বড় জব্দ হইলাম''[১১২]

উপরের আলোচনা হতে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে খ্রীষ্টান মিশনারীরা তাদের মোহনীয় বক্তৃতা বিবৃতি ও পুস্তক রচনার মাধ্যমে ইসলামের অপব্যাখ্যা ও খ্রীষ্ট ধর্মের মহিমা প্রচারের মাধ্যমে বাংলার নিরীহ নিরক্ষর মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালায়। উচ্চ শিক্ষিত ও ধর্ম প্রচারে অভিজ্ঞ পাদ্রীরা কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে স্থানীয় অজ্ঞ মুসলমানদের বে-কায়দায় ফেলে তাদের ঘায়েল করার অপচেষ্টায় মেতে উঠে। আর এদেশের অজ্ঞ হিন্দু-মুসলমান সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জালে বন্দী হয়ে পিতৃ পুরুষের ধর্ম বিসর্জন দিতেশুরু করে। বাঙালী সমাজের এরূপ সংকটকালে ত্রাণকর্তা হিসেবে আর্বিভূত হন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ । মিশনারীদের সর্বগ্রাসী থাবার সম্মুখে তিনি সিংহ-শার্দ্দুলের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়েন। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অপতৎপরতা রোধে তিনি তাদের প্রকাশ্য তর্ক সমরে আহবান করেন এবং অসাধারণ বাক-পটুতা ও পত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে তাদের কুপোকাত করেন। ফলে পাদ্রীদের ভয়াল আক্রমনের হাত থেকে বাংলার মুসলিম সমাজ রক্ষা পায়। শেখ হবিবর রহমানের ভাষায়- ''এইরূপে পাদ্রীদের সহস্র চেষ্টা সত্বেও এই অসাধারণ শক্তিশালী বিজ্ঞ ও সর্তক প্রহরীর কল্যাণে ইসলামের অঙ্গে তেমন কোন আঘাত লাগিতে পারে নাই।''[১১৩]

উল্লেখ্য যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ রচিত 'রদ্দে খৃষ্টান' 'খৃষ্টান ধর্মের অসারতা' 'খৃষ্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' ইত্যাদি পুস্তক খৃষ্টান পাদ্রীদের জব্দ করেছিল। শেখ হবিবর রহমান বলেন যে, পুস্তকগুলির অকাট্য যুক্তিতর্কের সম্মুখে পাদ্রীগন আর মাথা উচুঁ করতে সাহস পায় নাই। সর্ব্বত্র ই তারা তাঁকে এড়িয়ে চলে। এবং নিরাপদ দুরত্বে থেকে নিরীহ গ্রাম-বাসীদের মধ্যে ত্রি-ত্ববাদের মহিমা প্রচার করতঃ নিজেদের চাকুরি ও ঠাট বজায় রাখতে চেষ্টা করে।[১১৪]

তথ্য-সূত্র

১. ডক্টকর ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১৮৪।

২. ঐ, পৃঃ ১৮৪।

৩. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, মেহের চরিত, কলিকাতা, ১৩১৫, পৃঃ পৃঃ ৯-১০।

৪. আবদুল কাদির, মিহির ও সুধাকর, মুসলিম সাময়িক পত্র, পৃঃ ৪৭।

৫. উক্টর ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৯।

৬. সুধাকর, ১ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২৯ অগ্রাহয়ণ, ১২৯৬ বাংলা।

৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌, পৃঃ ১০, শাহাদত আলী আনসারী, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌, পৃঃ ৬।

৮. আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ্‌ ও জমিরুদ্দীন, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৭, পৃঃ ৮৯।

৯. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মনীষী মেহেরুল্লাহ্‌, প্রেক্ষণ, মেহেরুল্লাহ্‌ স্মরণ সংখ্যা, ঢাকা ১৯৯৬, পৃঃ ১৮০।

১০. মিহির ও সুধাকর, ৫ অগ্রাহায়ণ, ১৩০৯।

১১. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৪।

১২. মিহির ও সুধাকর, ৫ অগ্রাহায়ণ, ১৩০৯।

১৩. ঐ

১৪. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৫

১৫. The Moslem Chronicle, II July. 1896

১৬. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ। ২০৮।

১৭. নূরুল ইসলাম, ২য় বর্ষ, ১৩০৮, যশোর, পৃঃ ৮, উদ্বৃতি ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৮।

১৮. মুহম্মদ আবু তালিব, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ঃ দেশ কাল সমাজ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৭৪।

১৯. মুহাম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ পৃঃ ৭৪, ৮১।

২০. উদ্বৃতি, ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০১।

২১. ঐ, পৃঃ ২০১।

২২. ঐ, পৃঃ ২০০।

২৩. The Moslem Chronicle, 7 May, 1904।

২৪. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২।

২৫. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭।

২৬. The Mosl'em Chronicle, 7 May, 1904 ।

২৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭।

২৮.শেখ হবিবর রহমান, কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌, কলিকাতা, ১৯৩৪, পৃঃ ৮৮।

২৯. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩০. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

৩১. মুহম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫।

৩২. উদ্বৃতি, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ রচনাবলী-১ম খন্ড, সম্পাঃ নাসির হেলাল, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ চৌদ্দ।

৩৩. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭।

৩৪. মুহম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫।

৩৫. ঐ, পৃঃ ৭৬।

৩৬. মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।

৩৭. ঐ, পৃঃ ৯।

৩৮. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮।

৩৯. মুহম্মদ শাহাদ আলী আনসারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।

৪০.শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮।

৪১. মুহম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫।

৪২. কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল নব্য শিক্ষিত মুলমানদের প্রতিষ্ঠান। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী কারা ছিলেন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে ইসলাম প্রচারক (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১০ বাং) পত্রিকায় প্রকাশিত মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদীর 'ইসলাম ও মিশন' নামক নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজে এবং মোহাম্মদ রেয়াযুদ্দিন আহমদ এর প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিলেন।

৪৩.মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসলাম ও মিশন, ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১০ বাংলা।

৪৪. মির্জা আবুল ফজল, প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, নবনূর, শ্রাবণ, ১৩১০ বাংলা।

৪৫. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৮।

৪৬. ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ-জৈষ্ঠ, ১৩১১।

৪৭. আবুল হাসান চৌধুরী, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৯। পৃঃ ৮০।

৪৮. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ। ২১৫।

৪৯.শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭।

৫০. কোহিনুর, বৈশাখ, ১৩১২।

৫১. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত,পৃঃ ২১৬।

৫২. ঐ, পৃঃ ২১৮।

৫৩. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯।

৫৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৯।

৫৫. দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২২০।

৫৬. ঐ, পৃঃ ২২১।

৫৭. ঐ, পৃঃ পৃঃ ২২১-২২২।

৫৮. আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮।

৫৯. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।

৬০. ইসলাম প্রচারক, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৯৮।

৬১. শেখ আছিরুদ্দিন, মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনী, জলপাইগুড়ি, ১৯০৯, পৃঃ ১৩। উদ্বৃতি, আবুল হাসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

৬২. মিহির ও সুধাকর, ১২ চৈত্র, ১৩০৪ বাংলা।

৬৩. উদ্বৃতি,আতাউল হক, ইসলাম প্রচারক মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌, প্রেক্ষণ, পৃঃ ১২৩-২৪।

৬৪. আবুল হাসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ পৃঃ ৩৩-৩৪।

৬৫. উদ্বৃতি, শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

৬৬.উদ্বৃতি, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।

৬৭. উদ্বৃতি, আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯১।

৬৮. দ্রঃ শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃপৃঃ ৩৯-৪০।

৬৯. উদ্বৃতি মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।

৭০. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ পৃঃ ৫২-৫৩।

৭১. ঐ, পৃঃ পৃঃ ৮১-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৭২. গল্পটির বিস্তারিত দেখুন শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ পৃঃ ৫৫-৫৭।

৭৩. ঐ, পৃঃ ৫৭।

৭৪. ঐ, পৃঃ ৪৬।

৭৫. মুহাম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১১।

৭৬. শেখ জমিরুদ্দীন, মেহের চরিত, পৃঃ ৬৩।

৭৭. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

৭৮. ঐ, পৃঃ ৬।

৭৯. ঐ, পৃঃ ৮।

৮০. ঐ, পৃঃ ৮।

৮১.ঐ, পৃঃ ১০।

৮২. মুহাম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ পৃঃ ৫৫-৫৬।

৮৩. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

৮৮. ঐ, পৃঃ ১০৫।

৮৫. মুহম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ পৃঃ ৪-৫।

৮৬.শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত,পৃঃ পৃঃ ২০-২১।

৮৭. ঐ, পৃঃ ৩৪।

৮৮. ঐ, পৃঃ ৩৪।

৮৯. মুহম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ পৃঃ ৪৩-৪৪।

৯০. ঐ, পৃঃ পৃঃ ৪৪-৪৫।

৯১. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌, রদ্দে খৃষ্টিয়ান ও দলিলুল ইসলাম, নতুন সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৬, পৃঃ ৩৯।

৯২. ঐ, পৃঃ ৩৯।

৯৩. শেখ জমিরুদ্দীন, খ্রীষ্টীয় সমাজে আট বছরঃ শরিয়ত, আষাঢ়, ১৩৩২, পৃঃ ৫০।

৯৪. শেখ জমিরুদ্দীন, আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, নতুন সংস্করণ, রাজশাহী, ১৯৬৭, পৃঃ পৃঃ ৩-৪।

৯৫. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭।

৯৬. প্রবন্ধটি বিস্তারিত শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ পৃঃ ১২৩-২৬।

৯৭. ঐ, পৃঃ ৩১।

৯৮. ঐ, পৃঃ ২৮।

৯৯. ঐ, পৃঃ ১২৭।

১০০. ঐ, পৃঃ পৃঃ ১৩৮-১৩৯।

১০১. ঐ, পৃঃ পৃঃ ১৩৯-১৪০ ।

১০২.ঐ, পৃঃ ১৪০।

১০৩. আবুল হাসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭।

১০৪. শেখ জমিরুদ্দীন , আমার জীবনী, পৃঃ ১৭।

১০৫. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫।

১০৬.মুহাম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯।

১০৭. উদ্বৃতি, শেখ জমিরুদ্দীন, মেহের-চরিত, পৃঃ ৫০।

১০৮. উদ্বৃতি, শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

১০৯. আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ পৃঃ ৫৪, ৫৭।

১১০. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১১।

১১১. মুহম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, ফৃঃ ৫৬।

১১২. ঐ, পৃঃ ৫৫।

১১৩. শেখ হবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২।

১১৪. ঐ , পৃঃ ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সাহিত্য সাধনা ও এর মূল দর্শন

আনিসুজ্জামান ইসলাম ধর্ম প্রচারক হিসাবে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর অমর কৃতিত্বের কথা স্বীকার করলেও লেখক হিসেবে তিনি অতটা স্মরণীয় নয় বলে মন্তব্য করেছেন।[১] মুন্সীর রচনাবলীর সাহিত্যমান, রচনাশৈলীর ত্রুটি, বিচ্যুতি ইত্যাদি বিবেচনায় সম্ভবত তিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন। তবে একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ নিছক সাহিত্য প্রেরণায় সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। সাহিত্য চর্চা তাঁর জীবনের লক্ষ্যও ছিল না। বিশেষ পরিস্থিতিতে, ধর্ম প্রচার ও স্ব-জাতির উন্নয়নকল্পে তিনি এ বিষয়ে ব্রতী হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তৎকালে খ্রীষ্টান মিশনারীরা হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে বক্তৃতা দান, প্রচার পুস্তিকা রচনা ও সাময়িকপত্র প্রকাশের মাধ্যমে বংলার মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যীশুর মহিমা ও খ্রীষ্টধর্মের সত্যতা প্রচার করে তাদের ধর্মান্তরিতকরনের চেষ্টা করতেন। মুসলমানদের ধমান্তরিত করনের উদ্দেশ্য তাদের রচিত বই-পত্রের কথা এবং এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম, কোরআন ও মহানবী সম্পর্কে অশ্রদ্ধাবাচক বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন সম্পর্কে তাদের অপচেষ্টা সম্পর্কে ইতোপূর্বে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।[২]

কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এমন কেউ ছিলেন না যিনি পাদ্রীদের এসবের জবাব দিতে পারতেন। মুসলমান কবি সাহিত্যিক ছিলেন না এমন নয় তবে তাদের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস আমাদের কাছে নিতান্তই অস্পষ্ট। এমনকি নেই বললেও চলে।[৩] আনিসুজ্জামান বলেছেন,

> ''আলীগড়-আন্দোলনের প্রেরণায় ইসলাম সম্পর্কে রচনাদি আরো পরে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে - তাও উর্দু ও ইংরেজীতে। অতএব বাঙালী মুসলামানের কাছে তা খুব ব্যাপকভাবে পৌঁছতে পারেনি। ফলে, মুসলমানদের মধ্য থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া শুরু হল। একে, হিন্দুধর্মের সহচার্য ও অন্যান্য প্রভাবের ফলে বাংলার প্রচলিত ইসলাম ধর্মে নানা বিকৃতি প্রবেশ লাভ করেছিল, তার উপর এই ভাঙন আরেক সমস্যারূপে দেখা দিল।''[৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার মুসলমান সমাজের এরূপ দুর্দিনে তাদের পরিত্রাণকারী মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র আর্বিভাব। ইসলাম, কুরআন ও মহানবী (সঃ) সম্পর্কে মিশনারীদের প্রচারিত অপব্যাখ্যা ও আজগুবি প্রচারণার প্রত্যুত্তরে তিনি মিশনারীদের তর্ক-যুদ্ধে আহবান জানালেন। গ্রাম-গঞ্জ শহর-বন্দরে আয়োজিত ধর্মসভায় বক্তৃতা করলেন। এ ব্যাপারে তাঁর আশাতীত সাফল্য সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, স্ব-জাতি ও স্বধর্মের উন্নয়নে ধর্মপ্রচার ও সংস্কার আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ সম্যকরূপে অনুধাবন করেন যে, বক্তৃতার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। একাজে বক্তৃতা প্রদান ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পুস্তক রচনা ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, উন্নতির পথে পরিচালিত করার জন্য এগুলো একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা সাহিত্যের প্রভাব ব্যাপক ও স্থায়ীভাবে সমাজের উপর কাজ করে। এরূপ আত্মোপলব্ধী থেকেই মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দারিদ্র ও অকাল পিতৃ-বিয়োগ ইত্যাদি কারণে মুন্সী সমকালীন উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল 'বোধদয়' পযর্ন্ত-ই। এমতাবস্থায় বাংলা ভাষায় দুর্বলতার কারণে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তিনি কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হন। তিনি বুঝতে পারেন মাতৃভাষা ছাড়া মনেরভাব যথাযথভাবে প্রকাশ অসম্ভব। অবশ্য এজন্য তিনি হতোদ্যম হয়ে পড়েননি। অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে তিনি বাংলা ভাষা চর্চা শুরু করেন এবং এতে মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করেন। ফলে উচ্চমাপের ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব না হলেও বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব এবং সহজবোধ্যতার কারণে তাঁর রচিত সাহিত্য পাঠক নন্দিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে মেহেরুল্লাহ নিজেই বলেছেন,

> ''যদিও আমি বাঙলা জানি না, তথাপি ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি। তদ্বারা সমাজের কতখানি উপকার হইয়াছে বলিতে পারি না; তবে এইমাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আর্কষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করতে হয় না।''[৫]

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী মেহেরুল্লাহর উর্পযুক্ত বক্তব্য থেকে বাংলাভাষায় তাঁর দুর্বলতার কথা জানা যায়। তিনি তাঁর রচনার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাঁর প্রণীত 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়ে সরল স্বীকারোক্তি রয়েছে।[৬] ভাষার দুর্বলতা ও রচনাশৈলীর ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে মেহেরুল্লাহ রচিত পুস্তক-পুস্তিকার সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ থাকলেও সমকালীন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে এর গুরুত্ব ও প্রভাব অনস্বীকার্য। পুনশ্চঃ স্মরণীয় যে, তিনি নিছক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেননি। মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারীর ভাষায়,

> ''তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন মুসলামানদের মনের কুসংস্কার এবং ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূর করে, ইসলাম সমন্ধে তাদেরকে পরিস্কার ধারণা দেওয়ার জন্য, নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আর পাদ্রীদের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অপপ্রচার, অপব্যাখ্যা প্রতিহত করার জন্য। প্রসঙ্গত অপর ধর্মের সাথে তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য।''[৭]

বলা বাহুল্য যে, মেহেরুল্লাহর উর্পযুক্ত উদ্দেশ্যাবলী সফল হয়েছিল।

৫.১ মুন্সী মেহেরুল্লাহর রচনার প্রকৃত সংখ্যা

মুন্সী মেহেরুল্লাহর সাহিত্য সৃষ্টিকর্মে ব্রতী হওয়ার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনার পর তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা, এসবের প্রতিপাদ্য বিষয়, শৈল্পিক মান, ভাষাশৈলী ও শব্দ চয়ন কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত আবশ্যক।

মুন্সী মেহেরুল্লাহর সমগ্র রচনাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর রচিত পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি, অমুদ্রিত রচনা ইত্যাদির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রনয়ন করা দুস্কর। তাঁর রচনা সংখ্যা নিয়ে নানা মুনীর নানামত পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি নাসির হেলালের সম্পাদনায় 'মুন্সী মেহের উল্লা রচনাবলী-১' শিরোনামে মেহেরুল্লাহর রচনার প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মুন্সীর প্রকৃত রচনা সংখ্যা ১২টি বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] তিনি মুন্সীর রচনা সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন গবেষক পন্ডিতদের মতামত তুলে ধরে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুন্সীর রচনা সংখ্যা প্রসঙ্গে পন্ডিত মহলে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। এখন তাঁর প্রাপ্ত রচনাবলী এবং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন পন্ডিতের অভিমতের আলোকে মুন্সীর রচনা সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কিত একটি বস্তুনিষ্ট আলোচনার চেষ্টা করা হল। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনীকার শেখ হবিবর রহমান 'কর্ম্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ' গ্রন্থে মুন্সীর রচিত ৬টি পুস্তক-পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন। যথা - ১. রদ্দে খৃষ্টান ২. খৃষ্টান ধর্মের অসারতা ৩. মেহেরুল ইসলাম ৪. পান্দনামা ৫. বিধবা গঞ্জনা এবং ৬. হিন্দু ধর্ম রহস্য। উল্লেখ্য যে, শেখ হবিবর রহমানের বিবরণ মতে, রদ্দে খৃষ্টান গ্রন্থটির দ্বিতীয় খন্ড হিসেবে মেহেরুল্লাহ্‌ দলিলুল ইসলাম রচনা করেছিলেন। কিন্তু এটি প্রকাশের পূর্বেই লেখকের মৃত্যু হওয়ায় এটি আর প্রকাশিত হয়নি।[৯]

মুস্তাফা নূর উল ইসলাম তাঁর 'মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ' গ্রন্থে মেহেরুল্লাহ্‌র রচিত ১০টি পুস্তক-পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন। প্রদত্ত এ তালিকার উৎস হিসেবে লেখক কর্তৃক প্রাপ্ত মেহেরুল্লাহ রচনাবলী, মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনী গ্রন্থসমূহ, বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ এবং বিভিন্ন গবেষকদের প্রাসঙ্গিক রচনা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। মুস্তফা নূর উল ইসলাম প্রদত্ত তালিকায় শেখ হবিবর রহমান কর্তৃক উল্লেখিত ৬টি রচনা ছাড়াও আরো যে ৪টি রচনার উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হল- ১. খ্রীষ্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ ২. সাহেব মুসলমান ৩. জোওয়াবোন্নাছারা ৪. বাবু ঈশানচন্দ্র মন্ডল এবং চার্লস ফ্রেঞ্চের এসলাম গ্রহণ।[১০]

মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী মুন্সীর রচনা সংখ্যা ৯টি বলে উল্লেখ করাছেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রদত্ত তালিকায় পূর্বোক্ত রচনার মধ্য হতে 'সাহেব মুসলমান' ও 'জোওয়াবোন্নাছারা' নামক দুটি পুস্তকের উল্লেখ নেই। তবে তিনি প্রদত্ত তালিকায় 'শ্লোকমালা' নামক একটি নতুন রচনার কথা উল্লেখ করেছেন।[১১]

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ রচিত ৯টি গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকায় উল্লেখিত গ্রন্থগুলোর সাথে মুহম্মদ শাহদাত আলী আনসারী প্রদত্ত তালিকার হুবহু মিল আছে। অর্থাৎ এ তালিকাতেও 'শ্লোকমালা' নামক মুন্সীর একটি রচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১২]

কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মেহেরুল্লাহ্‌র রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮টি বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩] এ গ্রন্থে উল্লেখিত তালিকায় 'শ্লোকমালা' ছাড়া আলী আহসান ও

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল হাই উল্লেখিত অন্য ৮টি গ্রন্থ রয়েছে। মোতাহার হোসেন সুফী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র'র ৭টি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এতে পূর্বোক্ত 'শ্লোকমালা' ছাড়াও 'বাবু ঈশানচন্দ্র মন্ডল ও চালর্স ফ্রেঞ্চের ইসলাম গ্রহণ' এ দুটি গ্রন্থের উল্লেখ নেই। মাহবুবুল আলম রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ রচিত পুস্তকের সংখ্যা ১০টি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার এই যে, মাহবুবুল আলম প্রদত্ত তালিকায় ইতোপূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে 'জোওয়াবুন্নাছারা' 'শ্লোকমালা' এবং 'বাবু ঈশানচন্দ্র মন্ডল ও চালর্স ফ্রেঞ্চের ইসলাম গ্রহণ' এ তিনটি বইয়ের উল্লেখ নেই। তবে এতে 'উপদেশমালা' 'নবরত্নমালা' বা 'বাংলা গজল' ও 'ইসলামী বক্তৃতামালা' নামক তিনটি নতুন পুস্তকের নাম রয়েছে।[১৪]

মুহম্মদ আবু তালিব মেহেরুল্লাহ্‌র নামে প্রচলিত যে সব পুস্তক-পুস্তকার সন্ধান লাভ করেছেন তার সংখ্যা ৮টি বলে জানান। এগুলো হলঃ ১. খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা ২. রদ্দে খৃষ্টান ৩. রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম ৪. মেহেরুল এছলাম ৫. বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভান্ডার ৬. হিন্দুধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা ৭. পান্দেনামা ৮. জোওয়াবোন্নাছারা বা খ্রীষ্টানদের প্রশ্নোত্তর।[১৫] এখানে লক্ষ্যনীয় যে, মুহম্মদ আবু তালিব উল্লেখিত তালিকায় 'রদ্দে খৃষ্টান' এবং 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম' কে দুটি পৃথক পুস্তক হিসাবে দেখানো হয়েছে। অবশ্য তিনি রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম গ্রন্থের উল্লেখ করতে গিয়ে নিজেই বলেছেন যে, গ্রন্থটির প্রথম খন্ড শুধু 'রদ্দে খৃষ্টান' নামে প্রকাশিত হয়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, মেহেরুল্লাহ্‌ র জীবনীকার শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন যে, মেহেরুল্লাহ্‌ র জীবদ্দশায় 'রদ্দে খৃষ্টানের' দ্বিতীয় খন্ড 'দলিলোল এসলাম' প্রকাশিত হয়নি। এমন কি দলিলোল এসলামের পান্ডুলিপিটি পর্যন্ত রিয়াজুল ইসলাম প্রেস থেকে হারিয়ে যায় এবং পরবর্তী ২৫ বছরের মধ্যে এটি বাহির হয়েছিল কিনা এটি তাঁর জানা নেই।[১৬]

মুহম্মদ আবু তালিব স্বীকার করেছেন মুন্সী সাহেবের নামে আরো কিছু বই প্রচলিত আছে। অবশ্য তিনি এগুলোর নাম উল্লেখ করেননি। তবে তিনি সেগুলো পরবর্তী মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ নামধারী ব্যক্তিদের রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পরিবেশিত তথ্য মতে, এ যাবত অন্ততঃ আরো দু'জন

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য মেহেরুল্লাহ্‌র পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের একজন সিরাজগঞ্জের, অন্যজন সাতক্ষীরার।[১৭]

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ মেহেরুল্লাহ রচিত ৯টি গ্রন্থের নামে উ'ল্লখ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তালিকায় 'কারামাতিয়া-মাদ্রাসা' নামক একটি পুস্তকের নাম উল্লেখ রয়েছে। ইতোপূর্বে উল্লেখিত অন্য কারো প্রদত্ত তালিকায় এ পুস্তকের নাম নেই। এ ছাড়া মাহবুবুল আলমের ন্যায় তিনিও 'ইসলামী বক্তৃতামালা' নামে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র একটি গ্রন্থ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮] আলী আহমদ সংকলিত 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী' নামক পুস্তকে মুন্সীর যে ১০টি পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে 'কারামাতিয়া-মাদ্রাসা' অন্যতম।

মেহেরুল্লাহ্‌'র পুত্র মোহাম্মদ মোহসেন চুড়ামনকাটি ছাতিয়াতলায় 'মেহের লাইব্রেরী' নামে একটি লাইব্রেরী পরিচালনা করতেন। এ লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি লিফলেট আমাদের হস্তগত হয়েছে। লিফলেটটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত মোহাম্মদ মোহসেনের 'পশ্চাতের পথ' পান্ডুলিপির ভিতরে আছে। এতে লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র গ্রন্থের মূল্যসহ একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। এ তালিকায় উল্লেখিত ৯টি গ্রন্থের মধ্যে ৮টির নাম ইতোপূর্বে আমাদের আলোচনায় এসেছে। এখানে 'বয়েতনামা' নামে একটি নতুন গ্রন্থের নাম রয়েছে। যেটি তখনো যন্ত্রস্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে অন্য কোন গবেষকের রচনায় কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক 'বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জী (১৪০০-১৯৮৫) গ্রন্থে' মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র রচিত ১৫টি বইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তালিকায় 'হিন্দু ধর্ম রহস্য' হিন্দু ধর্ম রহস্যও দেবলীলা' কে পৃথক দুটি গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছ। এছাড়া তিনি 'ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোকা ভঞ্জন' নামে মুন্সীর একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

নাসির হেলালের সম্পাদনায় 'মানব জীবনের কর্তব্য' নামে মুন্সীর একটি অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এটি কোন পূর্নাঙ্গ রচনা নয়, বস্তুত এটি মুন্সীর বক্তব্যের একটি নোট। ১৩১১ বঙ্গাব্দে

Dhaka University Institutional Repository

২৬শে আষাঢ় তিনি কুচবিহারে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় যে বক্তৃতা দেন এটি হল তারই নোট। এ নোটের মূল কপিটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

এখন যদি আমরা উর্পযুক্ত লেখক-গবেষকদের বর্ণিত গ্রন্থের সকল নাম সঠিক ধরে নেই তা হলে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ রচিত গ্রন্থ সংখ্যা দাড়ায় নিম্নরূপঃ ১. খৃষ্টান ধর্ম্মের অসারতা ২. খৃষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ ৩. মেহেরুল এছলাম ৪. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা ৫. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভান্ডার ৬. রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম ৭. বাবু ঈশানচন্দ্র মন্ডল ও চার্লস ফ্রেঞ্চের ইসলাম গ্রহণ (সংগৃহীত) ৮. পান্দেনামা (বঙ্গানুবাদ) ৯. শ্লোকনামা ১০. উপদেশমালা ১১. নবরত্নমালা বা বাংলা গজল ১২. জওয়াবোন্নাছারা ১৫. কারামতিয়া মাদ্রাসা ১৬. মানব জীবনের কর্তব্য ১৭. হিন্দু ধর্ম রহস্য ১৮. ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোঁকা ভঞ্জন ১৯. বয়েতনামা।

বর্তমান অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, উর্পযুক্ত গ্রন্থসমূহের সবগুলো আলোচ্য মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ রচিত নয়। মুহম্মদ আবু তালিব বলেছেন যে, এসব রচনার কোন কোনটি পরবর্তী মেহেরুল্লাহ নামধারী ব্যক্তিদের রচিত। উল্লেখ্য যে, যশোরের মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ছাড়াও আরো দু'জন মেহেরুল্লাহ্র পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধে সিরাজগঞ্জের মুন্সী মেহেরুল্লাহ 'ছানী (দ্বিতীয়) মেহেরুল্লাহ' নামে পরিচিত। তাঁর এরূপ পরিচিতির কারণ সম্ভবতঃ তিনি যশোরের মেহেরুল্লাহ্র ন্যায় নিজেকে ইসলাম প্রচারক হিসেবে পরিচয় দিতেন।[১৯] ছানী মেহেরুল্লাহও সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর প্রণীত একটি পুস্তিকার শেষ প্রচ্ছদে তাঁর নিম্ন লিখিত রচনাসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ ১. ইসলামিক বক্তৃতামালা ২. বাল্য বিবাহের বিষময় ফল ৩. এসলাহ কওম বা সমাজ সংস্কার ৪. মানবজীবনের কর্তব্য ৫. মহাবাক্যবলী (বিবিধ নীতি বাক্যপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ) ৫. বাঙালা কোরান শরীফ (১ম খন্ড) ৭. শ্লোকমালা (বেদ, উপনিষদ, বাইবেল ইত্যাদি হতে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ) ৮. উপদেশমালা ৯. হক নছিহত।[২০] বলা বাহুল্য যে, এ সবগুলোই ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা। তবে এর সবকয়টিই ছিল ধর্ম ও সমাজমূলক। এ রচনাগুলো যশোরের মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রচনাবলীর স্বাদযুক্ত হওয়ায় সম্ভবত অজ্ঞতা অথবা অসাবধানতাবশে অনেকেই এগুলোর কোন কোনটি প্রথম মেহেরুল্লাহ্ রচিত বলে ধরে নিয়েছেন। উাহরণস্বরূপ 'ইসলামিক বক্তৃতামালা' 'শ্লোকমালা' 'উপদেশমালা' ও

Dhaka University Institutional Repository

'মানবজীবনের কর্তব্য' ইত্যাদি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়। আমাদের প্রদত্ত উপরের তালিকা হতে সম্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ কটি পুস্তক সিরাজগঞ্জের মুন্সী মেহেরুল্লাহ কর্তৃক প্রণীত।

আলী আহমদ সংকলিত এবং বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী' নামক গ্রন্থে সিরাজগঞ্জের মুন্সী মেহেরুল্লাহ রচিত যে গ্রন্থ তালিকা দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে 'নবরত্নমালা বা বাংলা গজল' পুস্তকটি অন্যতম। এ গ্রন্থের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রকাশকঃ গ্রন্থাকার, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। মুদ্রকঃ মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহম্মদ, ১৫৯ কড়েয়া রোড কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ খ্রীঃ। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে উল্লেখিত লেখকের 'ইসলামী বক্তৃতামালা' পুস্তকটিও মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীনের কড়েয়া রোড কলিকাতা প্রেস হতে প্রকাশিত হয়েছিল। আলী আহমদ পরিবেশিত তথ্যটি সঠিক হলে সিরাজগঞ্জের মুন্সী মেহেরুল্লাহ রচিত 'নবরত্নমালা বা বাংলা গজল' পুস্তককেই ভুলবশতঃ প্রথম মেহেরুল্লাহর পুস্তক তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। সম্ভবত এরূপ মারাত্মক তথ্য বিভ্রাটের অন্যতম কারণ হচ্ছে উভয়ের একনাম। তদুপরি উভয়ের রচিত পুস্তকগুলোর মুদ্রক রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর রচিত গ্রন্থ তালিকায় 'মানব জীবনের কর্তব্য' শিরোনামের একটি পুস্তিকার উল্লেখ রয়েছে। ছানী মেহেরুল্লাহর রচনা তালিকাতেও উক্ত শিরোনামের একটি পুস্তিকার উল্লেখ দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে ভুলক্রমে একের রচনা অন্যের বলে চালানোর কোন ব্যাপার নেই। 'মানব জীবনের বর্তব্য' আমাদের আলোচ্য মেহেরুল্লাহর কোন পুস্তিকা নয়, এটি তাঁর বক্তৃতার নোট। কুচ বিহারে আয়োজিত একটি ধর্মসভায় বক্তৃতার উদ্দেশ্য তিনি এটি লিখেছিলেন। মুন্সীর স্ব-হস্তে লিখিত এ নোটের পান্ডুলিপিটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। মুন্সীর অপ্রকাশিত এ নোটটি নাসির হেলালের সম্পাদনায় 'দৈনিক সংগ্রাম' 'অগ্রপথিক' 'পালকি' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি এটি নাসির হেলাল সম্পাদিত 'মুন্সী মেহেরউল্লা রচনাবলী'-১ম খন্ডে সংযোজন করা হয়েছে।[২১] অতত্রব একথা পরিস্কার যে, ছানী মেহেরুল্লাহ রচিত 'মানব জীবনের কর্তব্য ও মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর 'মানব জীবনের কর্তব্য' একই শিরোনামে হলেও দুটি সম্পূর্ণ পৃথক।

Dhaka University Institutional Repository

'ঈসাই বা খ্রীষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন' নামে মেহেরুল্লাহ রচিত একটি পুস্তিকার কথাও অনেকে উল্লেখ করেছেন। আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জী (১৪০০-১৯৮৫)' বইয়ে এ পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ১৮৯৩ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। এতে পুস্তিকা সম্পর্কে আর কোন তথ্যই উল্লেখ করা হয়নি।

'ঈসাই বা খ্রীষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন' শিরোনামে মুন্সীর কোন পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল কি-না এটি নিশ্চিত নয়। আমাদের জানা মতে, জন জমিরুদ্দীন নামে জনৈক পাদরী ১৮৯২ খৃঃ 'খ্রষ্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় 'আসল কোরান কোথায়' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এ প্রবন্ধের জবাবে মেহেরুল্লাহ্ সুধাকর পত্রিকায় 'ঈসাই বা খ্রীষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন' শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। এটি ২০ ও ২৭ চৈত্র ১২৯৯ এবং ২রা বৈশাখ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ্য ১৩০০ বঙ্গাব্দে ছাপা হয়। শেখ হবিবর রহমান তাঁর 'কম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ্' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে এবং আবু তালিব তার 'মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহঃ দেশ কাল সমাজ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে এ প্রবন্ধটি পত্রস্থ করেছেন। নাসির হেলাল সম্পাদিত 'মুন্শী মেহেরউল্লা রচনাবলী'-১ম খন্ডে এটি পত্রস্থ করেছেন। কাজী দীন মুহম্মদ-এর তথ্য মতে,এ প্রবন্ধটি পরে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।[২২]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ রচনা তালিকায় 'কারামতিয়া মাদ্রাসা' নামক একটি পুস্তিকার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন পুস্তক নয়। এটি কারমাতিয়া মাদ্রাসার কার্য-বিবরণী। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ছিলেন। ফলে তাঁর উপর মাদ্রাসার কার্য-বিবরণী তৈরীর দায়িত্ব পড়া স্বাভাবিক। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সে সময় যশোরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কার্য-বিবরণী তৈরী ও প্রকাশ করা হত। মাদ্রাসার সেক্রেটারী হিসেবে মুন্সী এরূপ একটি কার্য-বিবরণী প্রকাশ করেন। অনেকেই এটিকে তাঁর একটি পুস্তক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

উপরের আলোচনায় মুন্সীর রচনার প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি একটি বস্তনিষ্ঠ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষণে প্রস্তাবনা অনুযায়ী মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র রচিত প্রকৃত পুস্তক-পুস্তিকাগুলোর পরিচিতি, প্রতিপাদ্যবিষয়, রচনাশৈলী ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র রচনাঃপুস্তক-পুস্তিকার পরিচিতি, বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ন

১. খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা

এটি মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর রচনাসমূহের মধ্যে প্রথম। এ রচনাটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল বাংলা ১২৯৩ সন (১৮৮৬ খ্রিঃ), প্রকাশক ও মুদ্রকঃ নেপাল চন্দ্র দাস, যশোর। গ্রন্থসত্ত্ব, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, ছাতিয়ানতলা, যশোর। মূল্য এক আনা। এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় কলিকাতা রেয়াজুল ইসলাম প্রেস হতে ১৩১৮ সালে। প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ষোল। তবে কোন কোন সংস্করণে বর্ধিত কলেবরে পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪।

'খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা' বইটির রচনাশৈলী সাদামাটা। এর সাহিত্যিক মুল্য বিশেষ নেই। তবে প্রামাণিক মুল্য অনস্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকরা ইসলাম বিরোধী যে আন্দোলন পরিচালনা করছিল তাকে প্রতিহত করা এবং অদুপরি ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে এ বইটিতে।[২৩] বিশেষ করে লেখক এ বইতে খ্রীষ্টান ধর্ম, বাইবেল, বাইবেলের ঈশ্বর, ত্রিত্ববাদ এবং যীশুখ্রীষ্টের অসারত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। বইটির সুচনায় লেখক খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারকদের নিন্দা করেছেন অপরাপর ধর্মের প্রতি নিয়তই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন বলে। মেহেরুল্লাহ্‌র ভাষায়,

> ''সম্প্রতি এই পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্রই পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় বাকযুদ্ধ চলিতেছে - যথা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, ব্রাহ্ম ইত্যাদি প্রায় সকলেই স্ব-স্ব ধর্মের গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্তু তন্মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারকগণকে যেরূপ অপর ধর্মের প্রতি নিন্দা ও দ্বেষ প্রকাশ করিতে দেখা যায় সেরূপ আর কোন সম্প্রদায়কে দেখা যায় না। তাঁহারা অপর ধর্মের সামান্য দোষকে বর্ণনায় পর্বতসম ও আপন ধর্মের সামান্য গুণকে অলংকারে পবর্ত করিয়া তুলেন। -.--- বলেন এই পৃথিবীতে বাইবেল শাস্ত্র ব্যতীত ঈশ্বরদত্ত আর কোন পুস্তক নাই; আরও বলেন, এই জগতে কোন মানুষ্য নিস্পাপ নেই, সকলেই পাপাসক্ত; কেবল প্রভু যীশুই নিস্পাপ ও নিস্কলঙ্ক; সেই মহাত্ম্যা ব্যতীত পরিত্রাণ দিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। ---- কেবল যাহারা ঈশ্বরের ত্রিতত্বে বিশ্বাস করিবে তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে; প্রায়ই খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারক পাদরীগণ এরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্ত যাঁহারা কিঞ্চিত গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে

Dhaka University Institutional Repository

> পারিবেন যে, খ্রীষ্টানগণ যাহা প্রচার করেন ও যাহা শিক্ষা দেন তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক ও নিরবিচ্ছিন্ন ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন।''[২৪]

তবে লক্ষ্যনীয় যে, মেহেরুল্লাহ এ বইতে নিজেও কিন্তু এর তেমন উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান বলেছেন, ''কিন্ত ধর্ম সংশ্লিষ্ট বির্তকে প্রবেশ করে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা টিকিয়ে রাখা যে কতখানি কঠিন তাঁর প্রমাণ তিনি নিজেও নিয়েছেন।''[২৫]

মেহেরুল্লাহ এ পুস্তকে বলতে চেয়েছেন যে, খ্রীষ্টানরা অধিকাংশই ইন্দ্রিয়পরায়ণ। বাইবেল থেকে তথ্য উদ্‌ঘাটন করে তিনি বলেছেন যে, যীশু খ্রীষ্টের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অন্তঃত দুজন (পেরেষ ও বোয়ম) ছিলেন জারজ। তাছাড়া অনেকে পরনারী গমন করতেন এবং পানাসক্ত ও প্রবঞ্চক ছিলেন। তাঁর ভাষ্য মতে, ''ইন্দ্রিয়পরায়ণতার এ ধারাই পরবর্তীকালে খৃষ্টানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।''[২৬] স্বয়ং যীশুর মধ্যেও মেহেরুল্লাহ্ সাধারণ নীতিজ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করেছেন। তাঁর ভাষায়,

> ''যীশুর আগমনে জগতের শান্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং কত শত নিস্পাপ শিশুর প্রাণ হত্যা ও কত শত স্ত্রী-পুরুষের অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি বিসর্জন করাই সার হইয়াছিল। যদি ইনিই খ্রীষ্টানদের শান্তিকর্তা হন, তবে এমন শান্তিকর্তাকে আমাদের নমস্কার।''[২৭]

বাইবেলের স্রষ্টার প্রতিও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারেননি। তিনি বলেছেন,

> ''আহা, বাইবেলের ঈশ্বর কত বড় নির্দ্দয় । দেখ, আমালেকীয় নামে একজাতি পাপী হওয়াতে, ঈশ্বর সেই জাতির সর্ব্বস্ব বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিতে ও তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ ও স্তন্যপায়ী শিশু এবং গরু, মেষ, উষ্ট্র, ও গর্দ্দভ সকলকে বধ করিতে শৌল রাজাকে আজ্ঞা দিলেন। . . . বাইবেলের ঈশ্বর মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা শিক্ষাদাতা।''[২৮]

প্রসঙ্গতঃ পুনরায় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সাহিত্য সাধনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাদ্রীদের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অপপ্রচার, অপব্যাখ্যা প্রতিহত করা এবং প্রয়োজনবোধে অপরধর্মের সাথে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ইসলামধর্মকে মুসলমানদের কাছে অবজ্ঞেয় করার চেষ্টা করেছিল। মেহেরুল্লাহ্ ইসলাম ধর্মকে সত্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য অন্য ধর্মের অসারতা বা বিচ্যুতি

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে যতটুকু প্রসঙ্গক্রমে দরকার হয়েছে তিনি ততটুকুই তাঁর পুস্তকে বলেছেন। উপযাচক হয়ে ধর্ম কলহে লিপ্ত হওয়া তাঁর স্বভাব ছিল না।

২. রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল এসলাম

এ পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩০২ (১৮৮৫ খ্রিঃ) সালে। প্রকাশক ছিলেন গ্রন্থাকার নিজে। পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর দুই বছর পর ১৩১৬ (১৯০৬ খ্রিঃ) সালে। প্রকাশক ছিলেন লেখকের পুত্র মনসুর আহমেদ, মুদ্রাকর রেয়াজুদ্দিন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল এসলাম' দুই খন্ডে রচিত পুস্তক। প্রথম খন্ড 'রদ্দে খৃষ্টান', লেখক মেহেরুল্ল'াহর জীবদ্দশাতে প্রকাশিত হয়। আর্থিক সংকটের কারণে লেখকের পক্ষে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেছেন যে, আমি আপন দরিদ্রতা বশতঃ সমস্ত পুস্তক এক সঙ্গে শেষ করতে পারলাম না। মুস্তাফা নুরউল ইসলাম এর তথ্য মতে, প্রথম দুটি সংস্করণে পুস্তকের দ্বিতীয় খন্ড 'দলিলুল এসলাম' মুদ্রিত হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে পন্ডিত মহল ঐক্যমত্যে আসতে পারেননি। শেখ হবিবর রহমানের তথ্য মতে, 'দলিলুল এসলাম' এর পান্ডুলিপিটি রেয়াজুল ইসলাম প্রেস থেকে হারিয়ে যাওয়ায় পরবর্তী পঁচিশ বছরের মধ্যেও এটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মুস্তফা নুরউল ইসলামও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেননি। আনিসুজ্জামান মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর পর 'দলিলুল এসলাম' প্রকাশিত হয় বলে মন্তব্য করেছেন।[২৯] মুহম্মদ আবু তালিবও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

'মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ একাডেমী' (মাতওয়াইল, কোনাপাড়া ডেমরা রোড, ঢাকা ১৩৩৬) নামক একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৯৮ সালে 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল ইসলাম' শিরোনামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছে। ৪২ পৃষ্টার এ পুস্তকের প্রকাশনা পরিচালকের (নামোল্লেখ নেই) বক্তব্যে মেহেরুল্লাহর পুস্তকটিকে সংক্ষিপ্তাকারে সম্পাদিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মেহেরুল্লাহ্ একাডেমির মুদ্রিত এ পুস্তকটি পাঠান্তে এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প্রকাশনা পরিচালকের বক্তব্য এবং প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

পুস্তকের নামকরণ থেকে বুঝা যায় যে, 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল ইসলাম' পুস্তকের অপর নাম 'খৃষ্টান ধর্মের অসারতা'। প্রকাশনা পরিচালকের ভাষায়,

> ''মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ একাডেমী হতে ভ্রান্ত খৃষ্টান পাদ্রী ও প্রচারকদের খপ্পর থেকে রক্ষার জন্য বাংলা মুসলমানদের সামনে খৃষ্টান পাদ্রীদের আতঙ্ক বীর সন্তান মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ লিখিত 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল এসলাম' বা 'খৃষ্টান ধর্মের অসারতা' উপস্থাপন করলাম।''[৩০]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'খৃষ্টান ধর্মের অসারতা' একটি পৃথক পুস্তিকা। এটি মেহেরুল্লাহর রচিত প্রথম বই। মুহম্মদ আবু তালিব 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল এসলামকে' প্রথমোক্ত পুস্তিকার পূর্ণাঙ্গরূপ বলে অভিহিত করেছেন। 'মেহেরুল্লাহ একাডেমী' কর্তৃপক্ষের এহেন ভুল অমার্জনীয়।

জানা যায় যে, ১৯৭৬ সালে ঢাকাস্থ মুসলিম অনুশীলন সংস্থা এবং পরে তওহিদ মিশন বাংলাদেশ মুন্সীর আলোচ্য পুস্তকটি প্রকাশ করেছিল। অনেক চেষ্টা করেও এ দুটি প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশিত কপি সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কোন কপিও সংগ্রহ করা যায়নি। এমতাবস্থায় একাডেমী কর্তৃক পুনঃ মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা এবং অন্যান্য পন্ডিতদের লেখনির উপরই নির্ভর করতে হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল এসলামকে' মুন্সী কর্তৃক ইতোপূর্বে রচিত খৃষ্টান ধর্মের অসারতার একটি পূর্ণাঙ্গরূপে বলা যেতে পারে। তাঁর এ গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে মিশনারীদের প্রচারণা যে অলীক অসার তা প্রমাণ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। সমকালীন সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায় যে, মেহেরুল্লাহর এ উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল।

এদেশে খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ প্রচার করতেন যে, ''খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম, বাইবেল শাস্ত্রই একমাত্র খোদা প্রদত্ত শাস্ত্র এবং যীশু খৃষ্ট-ই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ও সমুদয় মানবের ত্রাণকর্তা।''[৩১] মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ তাঁর আলোচ্য পুস্তকে খ্রীষ্টানদের এরূপ প্রচারণাকে অমূলক জ্ঞান ও কল্পনা বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, ''তাহাদের কল্পনার মূলে যে কতদূর সারবত্তা আছে, তাহার পূঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করা সমুদয় হিন্দু-মুসলামান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের একান্ত কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।''[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য পুস্তকে লেখক খ্রীষ্ট ধর্মের অযৌক্তিক ও অসারত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজ বক্তব্যের সমর্থনে বাইবেল এবং খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। লেখকের ভাষায়, ''খৃষ্টানদিগের উক্তিও যুক্তিগুলির সমালোচনা খৃষ্টান শাস্ত্রোক্ত রচনাবলী দ্বারাই করিতে বাধ্য হইলাম।''[৩৩]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য পুস্তকটি রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে লেখক তাঁর যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সনাতন ইসলাম ধর্ম প্রতিপালনের মধ্যেই যে যথার্থ পরিত্রাণ তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। বিরোধী শক্তি কর্তৃক পবিত্র ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) প্রতি যে সকল অযথা কলঙ্কারোপ করা হয়, তার যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত উত্তর দিয়েছেন। তদুপরি লেখক পবিত্র ইসলাম ধর্ম এবং মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) যে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর তার অকাট্য প্রমাণদানে বাইবেলের উদ্ধৃতি, এমনকি নিরপেক্ষ ইংরেজ বা ইউরোপীয় মহাত্মাদিগের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।[৩৪]

পুনশ্চঃ স্মরণীয় যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ একজন স্বল্প শিক্ষিত লোক ছিলেন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটি রচনায় বিভিন্ন শাস্ত্র ও ব্যাকরণের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

৩. খৃষ্টান-মুসলমান তর্কযুদ্ধ

'খৃষ্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' মুন্সীর একটি পুস্তিকা। এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রিঃ। প্রকাশকঃ মনসুর আহমদ। ছাতিয়ানতলা, যশোর। এটি খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সাথে মেহেরুল্লাহ্‌র একটি বাহাস বা তর্কযুদ্ধের সংকলিত রূপ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় 'মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের তর্কযুদ্ধ' শিরোনামে।[৩৫]

শেখ হবিবর রহমানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পিরোজপুরের খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ এ সময় অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন। তাঁরা মহানবী ও ইসলাম সম্পর্কে নানারূপ অপব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে, পাদ্রী এ স্পার্জন এর

Dhaka University Institutional Repository

সাথে মৌলভী এব্রাহিম সাহেবের এ বিষয়ে তর্কযুদ্ধ হয়। কিন্তু বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় একটি প্রকাশ্য বাহাসে বিষয়টি নিস্পত্তির কথা স্থির হয়। এমোতাবেক 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক মুন্শী শেখ রেয়াজউদ্দীনের আমন্ত্রণক্রমে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ পিরোজপুর যান। ১২৯৮ সালের ২১, ২২ ও ২৩শে আশ্বিন ক্রমাগত তিনদিন ধরে তুমুল আড়ম্বড়ে শত শত লোকের উপস্থিতিতে তর্ক-সংগ্রাম চলে। এ বাহাসে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রশ্নের অকাট্য উওর দিয়ে মেহেরুল্লাহ্ তাদের সম্পূর্ণ পরাস্থ করে ইসলামের গৌরব-পতাকা সমুন্নত রাখেন। পাদ্রী আর এ স্পার্জন, পাদ্রী হাসান আলী ও পাদ্রী ঈশান মন্ডল মুন্সীর সাথে তর্ক সমরে ঠিকতে না পেরে ''আমাদের আর সময় নাই, আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমাদিগকে ক্ষমা করুন" এ কথা বলে ক্ষমা প্রার্থণা করাতে তর্ক সভার কার্য সমাপ্ত হয়। [৩৬]

উপরোক্ত তর্কসভার বিস্তারিত বিবরণীর সংকলিত রূপই হল মুন্সীর 'খৃষ্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' পুস্তিকা। এ পুস্তিকায় মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের যেমন জবাব দেওয়া হয়, তেমনি যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের দাবীর যৌক্তিকতার অসারত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। বিশেষ করে যীশু খ্রীষ্টকে 'ঈশ্বরের পুত্র' হিসেবে খ্রীষ্টানদের দাবীর প্রেক্ষিতে মুন্সী যে ব্যাখ্যা দেন তা নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক।

৪. মেহেরুল এছলাম

'মেহেরুল এছলাম'/ইসলাম রবি মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র একটি বহুল প্রচারিত মূল্যবান পুস্তক। আনিসুজ্জামান এর মতে, এটি তাঁর রচিত দ্বিতীয় পুস্তক।[৩৭] মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারীও পুস্তকটিকে মেহেরুল্লাহ্ প্রণীত দ্বিতীয় পুস্তক হিসেবে উলেখ করেছেন। মুহম্মদ আবু তালিব একে তাঁর ৩য় রচনা ও প্রকাশিত গ্রন্থ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে তাঁর বক্তব্যে খুব সম্ভব শব্দটি ব্যবহার করায় বলা যেতে পারে যে, এ ব্যাপারে তিনি নিজেও নিঃসন্দেহ নন। একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, পুস্তকটির রচনাকাল সম্পর্কে আবু তালিব, মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, এমন কি মুস্তাফা নূরউল ইসলামের প্রদত্ত সনটি একই। অর্থাৎ তাদের মতে, পুস্তকটির রচনকালে ১৩০২বঙ্গাব্দে। তবে পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় দুবছর পর ১৩০৪ বঙ্গাব্দে ১৮৯৭ খ্রিঃ। মুদ্রাকর রিয়াজুদ্দীন আহমদ। প্রকাশকঃ শাহানশা এ্যান্ড কোম্পানী, ৪নং কড়েয়া, গোরস্থান

Dhaka University Institutional Repository

রোড, কলিকাতা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেহেরুল এছলাম মুন্শী সাহেবের একটি বহুল প্রচারিত ও পাঠক নন্দিত পুস্তক। মুন্সীর মৃত্যুর তিন বছর পর ১৩১৭ সালে এ পুস্তকের ৫ম সংস্করণ যশোরের ছাতিয়ানতলা থেকে প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণে শেখ জমিরুদ্দীন লিখিত মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত হয়। এ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+৭৯। মূল্য চার আনা। মুস্তফা নূরউল ইসলাম প্রদত্ত তথ্য মতে, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এ পুস্তকের আরো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারীর তথ্য মতে,

> 'মেহেরুল এছলাম এর ৭ম সংস্করণ ছাতিয়ানতলা খাদেমুল ইসলাম সমিতির পক্ষ হতে মাওলানা আব্দুল জলিল কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ছাতিয়ানতলা খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা ও এতিমখানার ব্যয় নির্বাহের জন্য পুস্তকটি মেহেরুল্লাহ্‌র দুই পুত্র মোহাম্মদ মোহসেন ও মোহাম্মদ মোখলেছর রহমান তাঁর কন্যা মোছাঃ সালেহা খাতুন ও পৌত্র মাছুদ আহমেদ ১লা বৈশাখ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে ওয়াকফ্ করে দেন।''[১৩৮]

সাম্প্রতি নাসির হেলালের সম্পাদনায় প্রকাশিত মেহেরুল্লাহ রচনাবলীর প্রথম খন্ডে এ পুস্তকটি সংকলিত হয়েছে।

'মেহেরুল এছলাম' সমাজের একান্ত উপযোগী অমূল্য উপদেশপূর্ণ একটি পুস্তক। এটি বাংলা পুথি ধরনের কবিতায় লিখিত। মূল রচনার অধিকাংশ ছন্দোবদ্ধ কিছু অংশ ও পাদটীকা গদ্যে লেখা। ছন্দোবদ্ধ অংশের অধিকাংশই দোভাষী রীতিতে পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত। লক্ষ্যনীয় যে, মেহেরুল এছলামে ব্যবহৃত ভাষা বিশুদ্ধ, মধুর এবং ইসলামী ভাবপূর্ণ। এতে সহজবোধ্য আরবী, ফারসী এবং বাংলা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত, এমনকি অশিক্ষিত মুসলমান জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে মুন্সী তাঁর এ পুস্তকটি সহজে বোধগম্য ভাষা ও রীতিতে প্রনয়ন করেন। এ প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেছেন, ''বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা অনভিজ্ঞ মুসলমানগণ যাতে ভ্রমে পতিত না হন, এজন্য আমি বাধ্য হয়ে এ পুস্তকে তাদের জ্ঞানসিদ্ধ ভাষা ও অক্ষরাদি ব্যবহার করলাম।''[১৩৯]

মেহেরুল্লাহ্‌র এ পুস্তকটি রচনার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ বিভিন্ন লৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাসের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়েছিল। মেহেরুল্লাহ্‌র প্রয়াস ছিল তাঁর স্ব-ধর্মীদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস ও তাদের আচরিত ধর্মজীবনের সংস্কার সাধন করা। মেহেরুল এছলাম গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি এ সংস্কার ব্রত প্রচার করেন।

মেহেরুল এছলাম পুস্তকটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে মেহেরুল্লাহ ইসলামী তৌহিদ (পূর্ণ একেশ্বরবাদ) এর উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এসব বিষয়ে লেখক কোরআন ও হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ তাঁর এ পুস্তকে খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদের বিরোধিতা হিন্দুদের পৌত্তলিকতা এমনকি ধর্মহীন সমাজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি হিন্দু ও খ্রীষ্টনদিগকে মূল ধর্ম বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বলে গণ্য করেছেন, তাঁর ভাষায়,

"যদিও নাছারা হিন্দু আদি ছায়া
মুখে এক খোদা কয়
কাজে ও পূজায় ছাফ দেখা যায়
একজন কভূ নয়

খ্রীষ্টীয়ান দলে মূল খোদা ভুলে
হজরত ঈসার তরে
কভু পরোয়ার কভু বেটা তাঁর
জানিয়া বন্দেগী করে
হিন্দুরা সকলে মুখে মাত্র বলে
একই পরমেশ্বর
পূজার সময় ছাফ দেখা যায়
কেবল দেবতা সার।"[৪০]

খ্রীষ্টান ও হিন্দু ধর্মের বহুত্ববাদের সমালোচনা করলেও একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম সমাজ ও এর প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি সবিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

তাৎপর্যপূর্ণ,"হিন্দুদিগের মধ্যে স্বনামখ্যাত রাজা রামমোহন রায় আরবী, পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার মতাবলম্বী ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মুসলমান জাতির অনেকটা কাছাকাছি।''[৪১]

'মেহেরুল্লাহ্‌র এছলাম' গ্রন্থে লেখক মুসলামানদের অত্যবশ্যকীয় ধর্মানুষ্ঠান যেমন-নামাজ, রোযা পালনের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝাতে প্রায়ই তিনি ব্যবহারিক জীবন থেকে উপমা গ্রহণ করেছেন। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও জমিদার-রায়তের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্যের তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে সব মুসলমান ইসলামের এসব অত্যাবশ্যকীয় ধর্মানুষ্ঠান পালন করে না তাদেরকে তিনি পারলৌকিক পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া এসব ব্যক্তির প্রতি লেখকের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। কবির ভাষায়,

''যে সকল আহম্মক নামাজে নারাজ
বলে, পাঁচ ওয়াক্ত কেন পড়িব নামাজ ।।
হামেশা ইয়াদ মোরা করি পরোয়ারে ।।
ডাকিলে কি হবে তায় শুধু পাঁচ বারে ।।''[৪২]

মুন্সী বলেছেন, যখনই তিনি গ্রাম্য বেনামাজীদের নামাজের জন্য নসিহত করতেন, তখনই তিনি তাদের কাছে থেকে এরূপ উত্তর পেতেন। মুন্সীর মতে, একদল নঁড়ার ফকির ধুঁয়া গানের মত গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াত, এতে বহুলোক বেনামাজী ও গোমরাহ হয়ে যায়। তাঁর ভাষায়,

''নাঁড়ার ফকির যারা আছে গাঁয় গাঁয়।
এই ঘুরি বহুজনে ফেলিল দাগায় ।।
বহুতি আফছোছ হয় তাহাদের তরে।
বানাইল পশু তারা বহুতর নরে ।।''[৪৩]

সমকালীন এসব তথাকথিত নাড়ার ফকির ও গাইনেদের প্রতি তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ''এখনও অনেক গাইনের স্পষ্ট কাফেরী কালাম পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তাহাদের জানাজা নামাজ পড়া ঠিক নহে। ---- হে গাইনগণ তোমরা নিজেরা ডুবিলে, পরকেও ডুবাইলে।''[৪৪]

লক্ষ্যনীয় যে, মেহেরুল্লাহ গান বাজনার প্রতি বিরূপ মানাভাব ও সমকালীন নাঁড়ার ফকিরদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেও সঙ্গীত রচয়িতাদের প্রতি তার দরদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মুহম্মদ আবু তালিব লিখেছেন যে, কৌতুহলের ব্যাপার এ কালের লোক সাহিত্য ও লোক সঙ্গীত দরদীদের মত তিনিও সেকালের এইসব সঙ্গীত রচয়িতা তথা লোক কবিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করেছেন। এভাবে আমরা সমকালীন কবি পাগলা কানাই, বানু মোল্লা প্রমুখের জীবন কথার সন্ধান পেয়েছি। কবি পাগলা কানাই ও বানু মোল্লার কবর তিনি যিয়ারত করেছিলেন এবং তাদের জীবনী সংগ্রহের প্রয়াস পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, সমকালীন বাংলা গানের প্রতি তাঁর বিরূপতা থাকলেও সমাজ-উন্নয়নমূলক ও ধর্মোত্তেজিকা গান তিনি অপছন্দ করতেন না। বরং এসব গান তিনি নিজেও লিখতেন। মেহেরুল এছলাম গ্রন্থে এর প্রমাণ মেলে।

'মেহেরুল এছলাম' গ্রন্থের দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'বড় মিঞার নকল' এবং 'আত্মোপদেশ'। সত্যি বলতে কি 'বড় মিঞার নকল' কবিতায় মেহের মানসের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, বড় মিঞা কোন বিশেষ বড় মিঞা নয়। বরং সমকালের ধর্মসংশ্রবহীন ধনীর দুলালের রূপক প্রতিনিধি। বস্তুতঃ সেসময় বাংলায় এরূপ অনেক ধনী মুসলমান ছিলেন যারা নামাজ, রোজা ইত্যাদি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন না করে ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপাচারপূর্ণ বিলাসী জীবন-যাপন করতেন। গান-বাজনা, ইয়ার-মোসাহেব সমাভিব্যহারে তাঁরা জীবন অতিবাহিত করতেন। ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় আচার অনুষ্ঠানকে তারা ঠাট্টা -বিদ্রুপ করতেন। মেহেরুল্লাহর ভাষায়, ''এদেশের ধনী মুসলমানদের বিশ্বাস যে, নামাজ, রোজা ইত্যাদি কাজ কেবল কাঙাল মিছকিনদের জন্য, ভদ্র হইতে গেলে ছহলিজে ঢোলক, তবলা রাখাই আবশ্যক।''[৪৫] উপর্যুক্ত ধনী মুসলমানরা সুদের কারবারের সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মুন্সীর ভাষায়,

> ''এদেশে অনেক সুদখোর মোসলমান আছেন যাহারা সুদকে হারাম জানিয়াও লোভ বশতঃ ইহা ছাড়িতে পারিতেছে না, আবার জানিয়া হারাম খাই বলিয়া নামাজ পড়িয়াই বা কি করিব, এই

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানে অনেকেই আজ কাল করিতে করিতে মরণ পর্যন্তও তওবা করিয়া দিন কবুল করিয়া মরিতে পারিল না।''[৪৬]

অন্যত্র মুন্সী উল্লেখ করেছেন,

''যখনই তাহাদিগকে নছিয়ত করা যায় তখনই বলেন, আর কিছুদিন যাউক, একেবারে তাওবা করিব, সুদও ছাড়িব। মনে মনে আশা এই যে, ছেলেটা আরেকটু সেয়ানা হইলেই তাহার মাথায় সুদের ডালি দিয়া, আমি তওবার তাসি বাজাইব।''[৪৭]

'বড় মিঞার নকল' কবিতায় কবির বর্ণিত কাহিনীর সংক্ষেপ হল, বড় মিঞা সাহেব বড় ধনবান ছিলেন; গান বাজনা, আমোদ-ফুর্তি, ইয়ার-মোসাহেব সমাভিব্যহারে কাল কাটাতেন। মুনশী-মৌলভীদের ধর্মোপদেশ তিনি আদৌ গ্রহণ করতেন না। বরং তাদের তাচ্ছিল্য করতেন। ধন-গৌরবে লিপ্ত বড় মিঞার একদিন আকস্মিক মৃত্যু হল, তাঁর ধন-দৌলত, খাট-পালঙ্ক সব পড়ে রইল। তাঁকে একটি বাঁশের চালিতে করে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর প্রিয় ইয়ার মোসাহেব কেউ তাঁর সাথী হল না। এক অন্ধকার মাটির ঘরে (কবরে) নিতান্তই অসহায় অবস্থায় বড় মিঞাকে পড়ে থাকতে হল। কবির ভাষায়,

''মিঞা একা রহে গোরে যায় যে যাহার ঘরে,
আপসেতে করিয়া সালাম ।।
বাপেরে কবরে দিয়া পরে সে নতুন মিঞা,
দুখ মনে করিয়া মাতম।
গানবাদ্য নাহি করে আপনা বাপের তরে,
করাইল কোরআন খতম ।।
এবে ওহে দানাগণ, ভাব দেখি মনে মন,
কি ধন তোমার সে নামাজ।

গান বাজনা দেখ ভাই অসময় কেহ নাই,
আসিবে তোমার কোন কাজ
দেখ বা এবে না দেখ, শেখ বা এবে না শেখ,
শেষ কিন্তু কোরআন ও নামাজ ।।

Dhaka University Institutional Repository

আসিবে মরণ যার কেহ না এগানা তার
নেক বদ শুধু সঙ্গী সার ।।
কহিয়াছে দানাগন, দোস্ত নহে সেই জন,
মছিবতে যে জন পালায়।
দুশমন তোমার সেই সুখের সময় যেই,
আসিয়া এগানা হতে চায় ।।
দোস্ত সেই জন হয়, কাজে আসে অসময়
দুখেতে বুকেতে লবে সেই।''[৪৮]

শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনেই মুন্সী তাকিদ দেননি। মুসলমি সমাজে প্রচলিত অনেক কুসংস্কারের প্রতিও তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, বিধবা বিবাহের কথা উল্লেখ করা যায়। মুন্সী এ পুস্তকে মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। মেহেরুল্লাহ্ বলেছেন, ''যুবতী বেওয়াদিগের ইদ্দত বাদে নিকা দেওয়া হযরতে একটি প্রধান সুন্নত। মহানবী বলেছেন, (বেওয়াদিগের) নেকা দেওয়া আমার সুন্নত, যে কেহ উহার এনকার করে, সে আমার উম্মত নহে।''[৪৯]

এতদ্সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহের অপ্রচলনকে তিনি একটি 'কু-রেওয়াজ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এবং এর মূলোৎপাঠনার্থে বাংলার বিবেচক মহাত্মাদের প্রাণপন চেষ্টা করতে আহবান জানিয়েছেন। বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করণের মারাত্মক কুফলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বাংলার তৎকালীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান সমাজপতিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

> ''আপনাদের যশঃগৌরব দেশ প্রসিদ্ধ; অসংখ্য কাঙাল মিসকিন আপনাদের ধন ধান্যে প্রতিপালিত হইতেছে; দারুণ দুর্ভিক্ষ কালে দেশের আবাল-বৃদ্ধ আপনাদের দ্বারে দয়া ভিক্ষা পাইয়া সেই কঠোর ক্ষুধা পিপাসায় জীবন দান পাইয়া থাকে, কিন্তু দেশের সহস্র সহস্র নিরাশ্রয়া আবলা বিধবাগণ যে নিদারুণ বৈধ্যানলে পতিত হইয়া, আপনাদিগের মুখ পানে চাহিয়া অস্ফুট বাক্যে

Dhaka University Institutional Repository

নিরন্তর আপনাদিগের করুণা চাহিতেছে, তাহারা কি দয়ার পাত্রী নয়? বিনয় করি, সেই অনাথিনীগণকে উদ্ধারের চেষ্টা করুন।''[৫০]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'মেহেরুল এছলাম' গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'আত্মোপদেশ'। এ কবিতায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ মর্মস্পর্শী ভাষায় আত্মোপদেশচ্ছলে মানুষকে তত্ত্বোপদেশ দিয়েছেন। সংসারের অন্তর্নিহিত নির্মম চিত্র উদ্‌ঘাটন করে সৃষ্টির অনন্ত রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং সেই অনন্তের আশ্রয় খোদাতালাতে আত্মসমর্পন করতে মানবের আদি নিকেতনে অধিরোহন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কবি প্রানস্পর্শী ভাষায় মানব দেহের শোচনীয় পরিণাম, ধন-জন, বংশ মর্যাদার বিলুপ্তি, অনন্ত শয়নে পৃথিবীর সকল মানবের একাকার নিরব নিঝুম নিদ্রা ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। জগৎ সংসারের নানা বিপদ-আপদের কথা উল্লেখ করে মানুষকে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন। কবির ভাষায়,

''রে মন দেখিবি কত দুনিয়ার ঠাট যত
নিদ্রাকালে স্বপনের ন্যায়।
ঘুম যে ভাঙ্গিবে আর দেখা না পাইব তার,
শুধু সার হবে হায় হায় ।।
ভবের বাজার এই, হেন দেশ আর নেই
পায় পায় ফেরে ঠগি দল।
পাইলে বিদেশী নরে, ভুলিয়ে বেরাহা করে
লুটে তারে করে নিঃসম্বল ।।
হয়ে তুই দিক হারা, সিয়া কাটাল সারা,
বেলা কিন্তু বেশী নাহি আর।
ডুবিলে হায়াত বেলা যারে তোর ধুলা খেলা
ভাঙ্গিবে এ ভবের বাজার ।।''[৫১]

পরিশেষে কবি মানবের একমাত্র মুক্তি পথ-প্রদর্শক মহানবী (সাঃ) এর দিকে ঈঙ্গিত করে তাঁর অনুসরনের জন্য আহবান জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়,

''সেই নবী ছরোয়ারে পাঠালে পরোয়ারে

Dhaka University Institutional Repository

ডাকে তোরে চলরে ত্বরিতে
তুরীর আওয়াজ শুনে খোজ তার একমনে
এ হাটে দেখা পাবি তাঁর।
খাঁটি মাল কেনা হবে দেশী পাথ চেনাইবে
পুঁজি না হারাবে তবে আর
যে দেশ ফেলিয়া এসে ফিরিছ অনাথ বেশে
সে দেশে পৌছাব তুঝে নিয়া
যাবে যে সকল দুখ পাবি রে অনন্ত সুখ
ত্বরা সে দামন ধর গিয়া।
তবে সে মেহেরবান করিবে মেহের দান
অফুরণ আল্লাহ্‌র মেহের
লায়েলাহা ইল্লাল্লা মোহাম্মদোর রাসুলুল্লা
পর মন নোয়াইয়া ছেরা"[৫২]

'মেহেরুল এছলাম' মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সাহিত্য সাধনার একটি দিগ্‌দশর্নী নির্দশন। এ পুস্তকটির ভাষা অত্যন্ত সরল সর্বসাধারণের বোঝার উপযোগী, অথচ রচনা লালিত্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ। পুঁথি ধরনের লিখিত হলেও ভাষা বা ছন্দোগত বিশেষ কোন ত্রুটি চোখে পড়ে না। এর ভাষা ও ভাবের মধ্যে ইসলামী জাতীয়তার সম্পূর্ণ পরিস্ফুটন লক্ষ্যনীয়।

'মেহেরুল এছলাম' সম্পর্কিত উর্পযুক্ত আলোচনা এবং এতে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারা সম্পর্কে আমরা একটা সম্যক ধারণা পাই। এ গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে, তিনি কেবল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ থেকে ইসলাম এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে চাননি; প্রচলিত ধর্ম জীবনের সংস্কারও তাঁর কাম্য ছিল। সম্ভবত সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সংস্কার আন্দোলন দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমরা জানি যে, সৈয়দ আহমেদ ও তাঁর অনুসারীরা মুসলিম সমাজের প্রচলিত জীবনধারা থেকে অনেক কুসংস্কার দূর করতে চেষ্টা করলেও তাদের রক্ষনশীল মনোভাবের কারণে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে কোন আপোষ করেননি। অনুরূপভাবে,

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ও আমাদের জীবনে ধর্মবোধের যথার্থ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেও ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তাধারা এবং সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার অনুভূতির বিকাশকে প্রশয় দেননি। আনিসুজ্জামান মনে করেন যে, ধর্ম জীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা এর অনুকুল ছিল না। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উনিশ শতকে নৃত্য-গীতের বিশুদ্ধ চর্চা আমাদের দেশের অভিজাত মহলে যতটা প্রচলিত ছিল, তার চেয়ে এসবের আনুসঙ্গিক উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। মুন্সীর সঙ্গীত চর্চার বিরোধিতার এটিও সম্ভবত একটি কারণ ছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেহেরুল্লাহ্ সম্ভবত সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সংস্কার আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে সৈয়দ আহমদ অনুসারীদের সাথে তাঁর সময়গত ব্যবধানের কারণে আধুনিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তিনি তাদের মত নির্লিপ্ত হতে পারেন নি। তাই তিনি ধর্ম তত্বের সঙ্গে মুসলমানদের জাগতিক বিষয়াদি যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও বলেছেন। শুধু তাই নয়, ইসলামের পূর্ণজাগরণ চিন্তার পাশাপাশি ব্রাহ্ম সমাজের সাথে এর মূলগত ঐক্যের বিষয়টিও তাঁর নজর এড়ায় নি।

৫. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা

'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' মুন্সী মেহেরুল্লাহর অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ অনুযায়ী পুস্তকটি প্রথম প্রকাশকাল জানুয়ারি ১৮৯৬ খ্রিঃ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭, দাম, দুই আনা। এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় মার্চ ১৮৯৮ খ্রিঃ এবং ৩য় সংস্করণ নভেম্বর ১৯০০ খ্রিঃ। মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর পর ১৩১৫ বঙ্গাব্দে পুস্তকটির ৭ম সংস্করন প্রকাশিত হয়। প্রকাশক, লেখকের পুত্র মনসুর আহমদ, ছাতিয়ানতলা, যশোর। মুদ্রক রেয়াজুদ্দীন আহমদ, কড়েয়া রোড, কলিকাতা। এ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৮, দাম, সাড়ে তিন আনা।

ঢাকাস্থ মুসলিম অনুশীলন সংস্থা থেকে এ পুস্তকটি মুদ্রিত হয়েছিল। মুসলিম অনুশীলন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহর কনিষ্ঠ পুত্র মৌলভী মুখলেসুর রহমান পাকিস্তান আমলে এ বইটির পুনঃমুদ্রণ প্রকাশ করেন। কিন্তু নানা কারণে বইটি বাজার হতে উধাও হয়ে যায়। সম্প্রতি ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকাস্থ মুন্সী মোহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

মেহেরুল্লাহ একাডেমী (মাতওয়াইল, কোনাপাড়া, ডেমরা রোড, ঢাকা) থেকে পুস্তকটির পূণঃমুদ্রণ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মুন্সীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত সংযুক্ত করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১, মূল্য, ৪০ টাকা।

উল্লেখ্য যে, সেসময় বহু হিন্দু পন্ডিত, লেখক ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের কদর্যভাষায় আক্রমণ করে পুস্তক পুস্তিকা রচনা করতেন। 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' পুস্তকের ষষ্ঠ সংস্করণের উপক্রমণিকায় এ প্রসঙ্গে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ নিজেই বলেছেন,

> ''হিন্দুর অতি উচ্চ হইতে নিম্নশ্রেণীর গ্রন্থ লেখকগণ শতাধিক বৎসর পর্যন্ত পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও সমাজকে যত প্রকার কুৎসিত চিত্রে চিত্রিত ও পৈশাচিক বিশেষণে বিশেষিত করিয়া আসিতেছেন, কে তাহার ইয়াত্তা করিতে সক্ষম হইবেন? তাহারা সম্পূর্ণ অন্যায় ও বিদ্বেষ বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া অকারণে মুসলমানদিগকে যবন, ম্লেচ্ছ, পাষন্ড, পাতকী, পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা, দুরাত্মা, দূরাশয়, নরাধম, নরপিশাচ, বানর, নেঁড়ে, দেড়ে, ধেড়ে, এঁড়ে, অজ্ঞান এবং অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি অসংখ্য কর্দয্য আখ্যায় আখ্যায়িতপূর্ব্বক, অসীম আনন্দভোগ ও আত্মযোগ সমাধা করিয়া থাকেন, কিন্ত কে কোন মুসলমান কবে তাহাদের তাদৃশ ভোগের বাধা জন্মাইয়া শফরীর ন্যায় ফর-ফর করিয়াছেন? হিন্দু গ্রন্থাকারগণ সম্পূর্ণ অলীক, অসার ও মিথ্যা কল্পনার আশ্রয়ে মুসলমান বিদ্বেষিতার যে সকল চূড়ান্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমস্ত একত্রিত করিলে কয়েকখানি বিরাট গ্রন্থেও সঙ্কুলান হইবে না।''[৫৩]

উদাহরণস্বরূপ মুন্সী বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'রাজসিংহ' 'মৃনালিনী' 'কবিতাপুস্তক' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতা সংগ্রহ' দমোদর মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতাপ সিংহ' যজ্ঞেশর মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গানুবাদিত রাজস্থান' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' ইত্যাদি পুস্তকের উল্লেখ করে এসব গ্রন্থে তাঁরা কিভাবে মুসলিম বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত নমুনা তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে,

> ''আমরা তৎসমস্তের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি কথা মাত্র এই স্থলে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম; আশাকরি সুবিজ্ঞ পাঠক মন্ডলী তাহাতেই জ্ঞান গর্বিত, উচ্চ শিক্ষিত, উদারমতি হিন্দু জাতির উদারতা ও ভদ্রাচারের বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হইবেন।''[৫৪]

অনেকের ধারণা হিন্দু পন্ডিতদের উপর্যুক্ত মুসলিম বিদ্বেষী রচনার প্রতিবাদেই মেহেরুল্লাহ্ তাঁর 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' পুস্তকটি রচনা করেন। আলোচ্য পুস্তকটি রচনার পশ্চাতে মুন্সীর

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ উদ্দেশ্য হয়ত থাকতে পারে, তবে এটিই মূল কারণ ছিল বলে মনে হয় না। আমরা জানি যে, পুস্তক রচনা করে সাহিত্য রস সৃষ্টি করা তাঁর যেমন উদ্দেশ্য ছিল না, তেমনি উপযাচক হয়ে ধর্ম কলহে লিপ্ত হওয়াও তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। বলা বাহুল্য যে, মুন্সী ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ ধর্ম প্রচারক। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সত্য ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা"। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি রচনার পশ্চাতে প্রচ্ছদপত্রে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় সে উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে,

''কর কর কর সবে সত্য ধর্ম অন্বেষণ
অসার অলীক ধর্ম দাও দাও বিসর্জন
যে ধর্মে আশ্রয় নিলে,
মোক্ষ হবে পরকাল,
সে ধর্ম লভিতে ভাই হও সবে সযতন,
(তাহলে) অন্তিমে পরমপদ হইবেক দরশন।''[৫৫]

পুস্তকের ষষ্ঠ সংস্করণের 'উপক্রমনিকার' পাদটীকায় তিনি কথাটাকে আরো স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ভাষায় লিখেছেন,

> ''মুসলমান বিদ্বেষী হিন্দুগণ সম্পূর্ন মিথ্যা ও কল্পনার বলে মুসলমান ধর্ম ও সমাজকে বিবিধ কূৎসিত চিত্রিত করিয়াছেন; আমরা তৎপ্রকার মন্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া, হিন্দু ধর্ম রহস্য লিখিতে কৃতসংকল্প হই নাই। জগতে হিন্দুর ন্যায় কল্পনা প্রিয় জাতি অতি বিরল; তাহারা সত্য-সনাতন অনাদি অনন্ত পবিত্রময় খোদাতায়ালাকে বিস্মৃত হইয়া নানাবিধ অসার ও কাল্পনিক দেব-দেবী, ঘাট-মাঠ, প্রস্তর-বৃক্ষ, পশু-পক্ষী এবং শিবলিঙ্গ ইত্যাদির পূজা উপাসনা করিয়া দুর্লভ মানবজীবনটির অপব্যয় করিতেছেন; আমরা তাহাদিগেরই জানিত মানতি ধর্মগ্রন্থ সকল হইতে দেব ও দেবী কাহিনী এবং বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করত প্রকাশ করিলাম। যদি সেই সত্যময় অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার দিকে আকৃষ্ট হয় তাহা হইলেও আমাদের শ্রম ও জীবন সার্থক হইবে।''[৫৬]

পুস্তকটির সপ্তম সংস্করণের প্রকাশকের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, লেখকের পরিকল্পনা ছিল চার খন্ডে পুস্তকটি সমাপ্ত করবেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা পুস্তকের শুরুতে লেখক মানব জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর ভাষায়,

Dhaka University Institutional Repository

"ধর্মই মানবের পরমার্থিক সম্বল ও নিত্যবিধি। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মানব ধর্মোপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, অনাহার ধুলায় পতিত বা কুটিরবাসী হইলেও তাহার নরজীবনকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ; ধর্মহারা পাপাসক্ত মনুষ্য যদি সমস্ত জগতের অধিপতিত্ব লাভে সমর্থ ও মনি-মাণিক্য খচিত নীলাকান্ত বা স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েন, তথাপি তাহার মানব জীবনের প্রতি একান্ত আক্ষেপ।"[৫৭]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ সত্যধর্মানুসন্ধানী লোকদের সমস্যার কথাও তুলে ধরেছেন এবং বিভ্রান্ত ধর্মানুসন্ধানীজনকে তাঁর পরকালীন পরিত্রাণে উপযোগী ধর্মমত গ্রহণে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়,

"হিন্দু, য়িহুদী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান ইত্যাদির অসংখ্য বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকের সুমধুর মিষ্ট সম্ভাষণ তাহার কর্ণকুহরে প্রতিষ্ট হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ স্তম্ভিত করিয়া তুলে; সকলেই আপন আপন ধর্ম ও ধর্ম শাস্ত্রকে অভ্রান্ত এবং অন্যান্য ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রকে ভ্রমাত্মক বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিতেছেন।"[৫৮]

এমতাবস্থায় লেখক বিভ্রান্ত ধর্মানুসন্ধানীদের পরকালীন পরিত্রাণের উপযোগী ধর্মমত গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন,

"মানবের আয়ু সম ভবে কিছু নাহি আর
তাই বলি মহোদয়, সে ধনের বিনিময়,
চিনিয়া কিনিও ধর্ম, নিদানে যা হবে সার"[৫৯]

অতঃপর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ভারতের প্রধান দুটি ধর্মমত হিন্দু ও ইসলাম এবং এর অনুসারীদের মধ্যকার সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর ভাষায়,

"ধরিতে গেলে বর্তমান ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলামান এই দুই সম্প্রদায়ই ভারতের প্রধান অধিবাসী। বাস্তবিক আমাদের এই দুই এর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হওয়াই সর্বপ্রকার অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। আবার ধর্মের বিভিন্নতাই সে বিবাদের মূল। হিন্দু যাহাকে পূণ্য, মুসলামান তাহাকে পাপ জ্ঞানে-একজনকে ঘৃণা ও হিংসার চক্ষে দেখিতেছেন। অতএব আসুন আমরা অকপট মনে আমাদের বিবাদীর বিষয়গুলোকে সুক্ষ্মালোচনা দ্বারা মীমাংসা এবং কল্পনার অনুসরণ পরিত্যাগ পূর্বক, প্রকৃত সত্যানুরাগী হইয়া পরস্পর বিবাদ নিস্পন্ন করি।"[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে মুখবন্ধ শেষ করে মুন্সীমেহেরুল্লাহ্ মূল বিষয়ে অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম রহস্য উদ্‌ঘাটনে উদ্যোগী হয়েছেন। দুখন্ডে রচিত এ পুস্তকের প্রথম খন্ডে তিনি হিন্দু ধর্ম, বিভিন্ন দেব দেবী এবং মুনি-ঋষির কথা আলোচনা করেছেন। হিন্দু পৌরানিক দেব-দেবী ও মুনি-ঋষিদের মধ্যে তিনি ধর্মদেব, পরাশর, বেদব্যাস, বৃহস্পতি, বশিষ্ট, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, অশ্বিনীকুমার, পান্ডু, কুন্তি, গন্দা, তুলসী প্রভৃতির জন্ম ও লীলা কাহিনী শুধুমাত্র হিন্দু পুরানাদি, যথা - ব্রহ্ম, বৈর্বত পুরাণ, পরাশর সংহিতা, পদ্মপুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, ইত্যাদি থেকে হুবহু উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করেছেন।

পুস্তকের দ্বিতীয় খন্ডে 'রাধা ও কৃষ্ণ' চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার জন্য লেখক ভগবদ্‌গীতার সহায়তা গ্রহণ করেন। মেহেরুল্লাহ্ তাঁর উক্ত গ্রন্থে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র সহযোগে তাদের দেব-দেবীর ও মুনিঋষিদের সম্পর্কে যে আলোচনার অবতারণা করেছেন, তাতে অনিবার্যভাবে সে সব তথাকথিত দেব-দেবী, মুনি-ঋষিদের অবাধ যৌন-লীলা, চিত্ত অসংযম, চরিত্রহীনতা প্রকটিত হয়েছে। তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোন দিয়ে এসব অধর্মাচারী দেব-দেবীর লীলা-খেলাকে নিতান্তই জঘন্য ও অসামাজিক বিধায় যে কোন বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য বর্জনীয় মনে করে মন্তব্য করেছেন, ''এসব কাহিনী একদিকে যেমন ধর্মের পক্ষে কল্পনাতীত, বিষম কলঙ্কজনক, পক্ষান্তরে তেমনই অস্বাভাবিক গাঁজাখোরী গল্প। ইহার লেখকগণ কোন ধাতুর এবং কোন রুচির লোক ছিলেন তাঁহা বুঝা অসাধ্য।''[৬১]

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র নিরিখে তাদের দেব-দেবী, মুনি-ঋষিদের সম্পর্কে আলোচনাপূর্ব্বক মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ পাঠক সমাজকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, পাঠক! এখন বিচার করিয়া দেখুন। এই খন্ডে যে সকল দেব-দেবীর বিষয় আলোচিত হইল, তাঁহাদের কাহাকেও ধর্মের মহাজন বা পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে কিনা। অতঃপর ধর্মপ্রচারক মেহেরুল্লাহ মানুষকে সত্য সনাতন একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করার জন্য আহবান জানিয়ে কোরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন, ''হে লোক সকল, যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তোমরা আপনাদের, সেই পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা কর, তাহাতে রক্ষা পাইবা।''[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

বলা বাহুল্য যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহর 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' পুস্তকটি বিপুলভাবে পাঠক নন্দিত হয়। লেখকের মৃত্যুর পূর্বেই এর ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত হওয়ারই প্রমাণ। তবে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুসলিম সমাজে পুস্তকটি সমাদৃত হলেও হিন্দু সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পুস্তকটির ষষ্ঠ সংস্করণের উপক্রমনিকায় পরিবেশিত তথ্য মতে, ১লা আষাঢ় ১৩০৭ সালে সুধাকর পত্রিকায় ফুলকোচা নিবাসী বাবু সুরেশ্বর মুখোপাধ্যায় এ পুস্তকের সমালোচনা সূত্রে 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক ও মুসলমান সমাজকে ভীষণভাবে অক্রমন করেন। এ নিয়ে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ রীতিমত বাদ-প্রতিবাদ চলে। বর্ধমানের মুন্সী আবদুল লতিফ, নাদিয়ার মুন্শী শেখ মেহেরুদ্দিন, যশোরের কাজী দবিরুদ্দিন, বগুড়ার মুন্শী মেহেরুল্লা আহমদ, শ্রীহট্টের মোহাম্মদ আলী ডাক্তার, রেঙ্গুনের শান্তিপ্রিয় ব্রহ্মপ্রবাসী, মালদহের মুন্শী আবদুচ্ছামাদ, হেলোচাচা প্রমুখ মহাত্মাগণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনার প্রতিবাদ করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত মিহির ও সুধাকর অফিসে এ বিষয়ে আরো অনেক পত্র জমা হয়েছিল।

এসব বাদ-প্রতিবাদ সত্বেও মুন্সীর জীবদ্দশাতে বইটি বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে কোন দাবী করা হয়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মনসুর আহমদ এর ৭ম সংস্করণ প্রকাশ করলে হিন্দু ধর্মীয় নেতারা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়। তাদের মতে, এ পুস্তকটির ভাষা আক্রমনাত্মক, অশ্লীল ও রুচিহীন। এজন্য তাঁরা পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য মামলা করে।

১৯০৯ সালের ২৪শে মে যশোর কোর্টের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমন্ত কুমার দাস গুপ্ত এক রায়ে পুস্তকটির প্রকাশক মনসুর আহমদকে দুশ টাকা জরিমান অনাদায়ে তিন মাসের কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে জজ কোর্টে আপিল করা হলে জর্জ এল পালিত নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন। উপরুক্ত আপিল রায়ে মুন্সীর রচিত 'হিন্দু-ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' এবং 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' পুস্তক দুটি বাজেয়াপ্ত এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫২১ ধারানুসারে প্রকাশকের কাছে রক্ষিত পুস্তক দুটির সকল কপি ধ্বংস করার আদেশ দেয়া হয়।

আপিল আদালতের জজ গ্রন্থ দুটিকে অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট বলে অভিযোগ করেন। হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা সম্পর্কে রায়ে উল্লেখ করেন,

Dhaka University Institutional Repository

> ". . . It has been argued that the book æHidu Dharma Rahasya' is a book of religious controversy and that only incidents mentioned in the Hindu scriptures have been quoted. As regards being one for the persecution of a religious controversy, the preface above shows that it is nothing of the kind, and that the authour's intention was more to retaliate against Hindus for supposed insults to Mohammadans by Hindu writers. However, that may any book which conducts a religious controversy by compiling a series of obscene passages from the scriptures of another religion is clearly obscene publication."[63]

উপরোক্ত রায়ে বলা হয়েছে, লেখক হিন্দু লেখকের মুসলমানদের জন্য অপমানজনক লেখনীর প্রতিশোধ হিসাবে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। কিন্তু এ বক্তব্য যে সত্য নয় তা মুন্সী নিজেই ষষ্ঠ সংস্কররেণ ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। ইতোপূর্বের আলোচনায় এ বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে। তাছাড়া উপরোক্ত রায়ে মুন্সীর রচনাকে অশ্লীল ও ধর্মবিদ্বেষী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সত্যতা সম্পর্কে আমরা 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' গ্রন্থের আলোচনায় আলোকপাত করব।

৬. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার

'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ রচিত সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। পুস্তকটির প্রথম প্রকাশকাল সম্পর্কে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল সম্পর্কিত তথ্যটিও অনুমান নির্ভর। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেছেন, ''আমার দেখা বইটির আখ্যাপত্র ছিল না। প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' আখ্যার পর সীলমোহর আছে, Bengal Library/ Writers Building/31 MAR, '98.'' [64]

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ১৮৮৭-র শেষভাগে বা ১৮৯৮-র প্রথমে এটি প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধে সম্ভবতঃ মুদ্রণ প্রমাদের কারণে ১৮৮৭ উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে সনটি হবে ১৮৯৭। পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৩০শে নভেম্বর, ১৯০০ খ্রিঃ, (বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ)।

আনিসুজ্জামান মনে করেন যে, কবি আলতাফ হোসেন হালীর 'মুনাজাতে বেওয়া'র প্রভাব আছে বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি গদ্য-পদ্যে রচিত। এর ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা, স্থান বিশেষে দেশজ, দোভাষী শব্দাবলীর মিশ্রণ রহিত, সহজ সরল এবং স্পষ্ট। মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মতে, মুখ্যত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার ব্যাপারে লেখক বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন বলেই ভাষা ব্যবহারে, শব্দ প্রয়োগে তিনি সর্তকতা অবলম্বন করেন।[৬৫] গ্রন্থের উক্রমণিকায় লেখক নিজেই বলেছেন,

> ''আমি বিবিধ উপায়ে বিধবা হৃদয়ের বিষাদদোক্তিসমূহ যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা সরল, সহজ এবং সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলাম। এমনকি, স্থান বিশেষে সাধারণ মেয়েলী ভাষা ব্যবহার করিতেও লজ্জাবোধ করি নাই।''[৬৬]

উল্লেখ্য যে, 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভান্ডার'একান্তভাবেই উদ্দেশ্যমূলক রচনা। পুস্তকের আখ্যাপত্র, উপক্রমণিকা, এবং আভাষ অংশে লেখক সে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। আমরা জানি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ছিল বাঙালী হিন্দু-মুসলিম সমাজের জন্য এক বিশেষ ক্রান্তিকাল। এ সময় নানা কু-প্রথা ও সংস্কার উভয় সমাজের ভিত্তিমূলে কম্পন তুলেছিল। এসব আত্মঘাতী কুসংস্কারের মধ্যে অন্যতম বিধবা বিবাহের অপ্রচলন। হিন্দু ধর্মবেত্তারা বিধবা বিবাহ শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ বলে প্রচার করায় সাধারন্যে তা অপরিহার্য পালনীয় আচারে পরিণত হয়েছিল। ফলে প্রতিটি হিন্দু পরিবারে এক বা একাধিক বিধবা দেখা যাচ্ছিল। উল্লেখ্য যে, হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহের ন্যায় একটি কু-প্রথা সুপ্রচলিত ছিল। এর প্রভাবে বিধবাদের মধ্যে বেশীরভাগই হত অল্প বয়স্কা, বালিকা, তরুণী।

পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব কারো পক্ষে এড়ানো সহজ নয়। এদেশের হিন্দু সমাজের পাশে বসবাস করায় মুসলিম সমাজেও তাদের প্রচলিত বহু কুপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে। বিধবা বিবাহ মহানবী (সাঃ) একটি বড় সুন্নত। ক্ষেত্র বিশেষ এটি ওয়াজেব বা একান্ত কর্তব্য। এতদ্সত্বেও মুসলমানগণ হিন্দুদের অনুকরণে বহু ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ বর্জন করতে শুরু করে। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

> ''এই বিশাল বঙ্গের নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলা সমূহের স্থান বিশেষে হিন্দুগতপ্রাণ মুসলামান নামধারী বহুতর মিঞা সাহেবদিগের গৃহে, এখনও অসংখ্য তরুণ বয়স্কা বিধবা রমনী অসহ্য বৈধব্যানলে দগ্ধীভূতা হইতেছেন।''[৬৭]

বিধবা বিবাহবর্জনের বিষময় প্রভাবে হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজে ব্যভিচার, গর্ভপাত এবং নরহত্যা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অসহায় বিধবা রমনীকুল প্রায়ক্ষেত্রেই সমাজের প্রভাবশালী পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত ব্রজবিলাস গ্রন্থে এ বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যাবে। মজার ব্যাপার এই যে, বিধবা বিবাহ নিষেদ্ধের ন্যায় এরূপ আত্মঘাতী কুসংস্কার ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোথাও ছিল না। মেহেরুল্লাহ্‌র ভাষায়,

> ''অবলা রমণীকুল চির পরাধীনা,
> সেই বিধবারা থাকে পতিহীনা।
> তাও এ ভারতে কতিপয় পাপালায়
> ব্যতীত এ পৃথিবীর কুত্রাপিও নয়।''[৬৮]

উর্পযুক্ত পরিস্থিতিতে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ পন্ডিতবর্গ এগিয়ে আসেন এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য জোর অন্দোলন শুরু করেন। গোঁড়া হিন্দুগণ যথাসাধ্য এ আন্দোলনের বিরোধীতা করে। উভয়পক্ষ বাক-বিতন্ডায় অবতীর্ণ হয়ে পড়ে। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ লিখেছেন,

> ''বিধবা-হৃদয়ের জলন্ত ছবি অঙ্কন ও প্রদর্শন করিয়া একদিন প্রাতঃস্মরনীয় ---- মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ---- পন্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিপক্ষ দল কর্তৃক কত শত প্রকারে লাঞ্চিত ও অপভাষায় তিরস্কৃত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।''[৬৯]

তথাপি তারা পশ্চাদপসারন করেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহযোগীদের প্রচেষ্টা ও আন্দোলণের ফলে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বৃটিশ সরকার বিধবার পূনঃবিবাহের আইন পাস করেন। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সারা ভারতে বিধবা বিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে ঝড় বইতে শুরু করে। এ ঝড় যশোরকেও তীব্রভাবে নাড়া দেয়। 'হিন্দু ধর্ম রক্ষিনী সভা' বিধবা বিবাহ আইন ও এর পক্ষাবলম্বনকারীদের তীব্র বিরোধিতা করেন। এ সভার সভ্যগণ বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিতা প্রমাণে সচেষ্ট হন। এমনকি তারা বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাসাগরকে হত্যার পরিকল্পনা পর্যন্ত গ্রহণ করেন। হিন্দু ধর্ম রক্ষিনী সভার বক্তব্যের প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর একটি 'ব্রজবিলাস' এবং অন্যটি 'বিধবা বিবাহ ও যশোর হিন্দু ধর্ম রক্ষিনীসভা'। ১৮৮৪ সালে গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়।

এসব গ্রন্থে বিদ্যাসাগর তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু ও সমাজপতিদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন বিধবা বিবাহ না দেওয়ার ফলে প্রতিটি গৃহাভ্যন্তরে কিভাবে অনাচার, ব্যভিচার বিস্তার লাভ করেছে। বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্র পরিপন্থী নয় তা প্রমাণ করে তিনি এ ব্যাপারে সকলকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির মধ্যকার বাদ-বিস্বাদের সময়ই মুন্সী মেহেরুল্লাহর আর্বিভাব। ধর্ম প্রচারক ও সমাজ সংস্কারক মুন্সী মেহেরুল্লাহ বিধবা রমনীদের দুঃখজনক ও ভয়াবহ পরিণতি দর্শনে ব্যথিত হন। প্রধানত হিন্দু এবং ক্ষেত্র বিশেষ মুসলিম সমাজে প্রচলিত এ কুপ্রথা উচ্ছেদে তিনি মনস্থ করেন। আর এজন্যই তিনি রচনা করেন 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার'[৯]। এতে নিজেই বলেছেন,

> ''তাইত বাসনা আজ, করিয়া যতন
> বিধবা-হৃদয় চিত্র করিব অংকন
> ---
> বিধবা হৃদয়ে সেই নিদারুণ ব্যাথা।
> শুনাব উপমা ছলে, সে মরম কথা ।।''[৯০]

তিনি আশা পোষন করেছেন, ''যদি ইহা দ্বারা একজন বিধবা বিবাহ বিদ্বেষীরও সেই প্রস্তরবৎ নীরস চিত্ত ক্ষণকালে দোলায়মান ও চঞ্চলিত হয় তাহা হইলে আমার শ্রম সফল হইবে, সন্দেহ নাই।''[৯১]

'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' পুস্তকের কাহিনী প্রধান দুটি অংশে (প্রথম পরিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এবং চল্লিশটি ক্ষুদ্র অধ্যায়ে বিভক্ত)। সধবা সরলা ও বিধবা তরঙ্গিনী, প্রধানতঃ এই দুই মুখ্য চরিত্রের মাধ্যমে পুস্তকের কাহিনী পরিণতি মুখে অগ্রসর হয়েছে। এসব চরিত্রের মাধ্যমে লেখক হিন্দু সাধবাদের স্বামী সংসার নিয়ে সুখময় জীবনচিত্র এবং অন্যদিকে বিধবাদের দুর্দশাগ্রস্থ পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্হার বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, লেখক তাঁর মূল কাহিনী বিবৃত করার সাথে সাথে এতে পাদটীকার ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি যা

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছেন তা মোটেই অসত্য বা অতিরঞ্জিত নয়। বরং বাস্তব অবস্থার চিত্র আরো ভয়াবহ। লেখকের কাছে বিধবারা চিঠি লিখে তাদের শোকাবহ বিরহী জীবনের চিত্র জানিয়ে ছিলেন বলে তিনি দাবী করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়,

> ''বিবিধ শ্রেণীর যুবতী বিধবাগণের স্বহস্ত লিখিত খেদ ও শোকসূচক যে সকল পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, সময় ও সুযোগ মতে তাহা মুদ্রিত করিয়া, আমরা বঙ্গবাসী পাঠকবর্গকে উপহার দিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এই গ্রন্থের স্থান বিশেষের ফুট নোটেও নমুনা স্বরূপ তাহার কিয়দংশ দেখিতে পাইবেন।''[৭২]

বিধবা গঞ্জনার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর এটি পাঠ করে উচ্চ বংশীর হিন্দু বিধবা মুন্সীকে যে পত্র লিখেছিলেন গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণের ফুটনোটে তিনি তা উল্লেখ করেছেন,

''আমার এমনি মনে দুঃখ হইয়াছে যে, তা আপনি
ভিন্ন কেহ জানে না।
অন্তরে রহিল আমার অন্তরে ব্যাথা।
কেউ জানিবে না, রবে হৃদয়েই গাথা।''[৭৩] -স-দেবী

আসলে এ সময়ে হিন্দু বিধবাদের অবস্থা এবং তাদের কারণে সামাজিক অবস্থা এতই খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সচেতন মানুষ মাত্র গভীর উদ্বেগের মধ্যে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ অত্যন্ত বাস্তব বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেন। এমনকি বিধবা বিবাহ যে, হিন্দু ধর্মাশাস্ত্রানুযায়ী দোষনীয় নয় তা প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে আক্ষেপ করে তিনি লিখেছেন,

''হা বিদ্যাসাগর; দয়ার মূরতি;
নাই তুমি সার;
ছিলে বিধবা হৃদয়ে সারথী।''[৭৪]

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুকে তিনি বিধবা বিবাহের স্বপক্ষীয়দের জন্য অপূরনীয় ক্ষতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে একই সাথে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন,

''হীন কবি কয়, সেই মহোদয়;

Dhaka University Institutional Repository

ভারত ব্যাপীয়া,
যে বীজ রোপিয়া -
গেছে অঙ্কুরিয়া (কালে) ফলিবে নিশ্চয় ।।''[৭৫]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিধবা বিবাহ ইসলামে আইন সিদ্ধ। এটি মহানবীর একটি সুন্নত। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তা ওয়াজিব। কিন্তু ইসলামের এ মহান নীতি পরিত্যাগ করে হিন্দুদের ন্যায় বঙ্গ ভারতের বহু মুসলমান বিধবা বিবাহে অনাসক্তি প্রদর্শন করেন। বিধবা গঞ্জনায় মেহেরুল্লাহ্ প্রাসংগিকভাবে মুসলামান সমাজেও বিধবাদের দুরাবস্হার উপর আলোকপাত করেন এবং এ সমাজে বিধবা বিবাহ অপ্রচলনের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি তীক্ষ্ন ভাষায় বিধবা বিবাহ বিরোধী মুসলিম সমাজ নেতাদের অক্রমণ করেন।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন মূখ্যতঃ একজন ধর্ম প্রচারক। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার ও প্রসার ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। ইসলাম সত্য সনাতন ধর্ম। এতে মানব জীবনের পার্থিব ও পারলৌকিক মুক্তি নিহিত রয়েছে। লেখক আলোচ্য পুস্তকে বিধবা তরঙ্গিনীর বিলাপের মধ্য দিয়েও এ সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে তরঙ্গিনী বলেছেন,

''পরপতি হেরে
প্রাণ যাহা করে
প্রকাশিয়া নরে
বলা নাহি যায়
কলেমা গ্রহণ
করিলে তখন
দুঃখ বিমোচন হইবে নিশ্চয়।।''[৭৬]

তরঙ্গিনীকে ইসলাম গ্রহণে আহবান জানিয়ে লেখক বলেছেন,

''কাঙ্গাল কবি কহেন যদি বুদ্ধিমতী হও।
ও দুঃখিনী তরঙ্গিনী! কলেমা এসে লও ।।

Dhaka University Institutional Repository

ইহকালে পরকালে পরম সুখী হবে
নৈলে, একাল সেকাল দুকাল নরক মাঝেই রবে ।।''[৭৭]

'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' পুস্তকে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ করে ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর মনোভঙ্গীর প্রতিফলন লক্ষ্যনীয়। এতে তিনি বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর আস্থা প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, লর্ড বেন্টিকও বিশেষ করে মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি উচ্ছ্বাসপূর্ণ শ্রদ্ধাও প্রকাশ করেছেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি গাইতে যেয়ে বলা হয়েছে,

''ধন্য মাতা মহারানী ভারত-জননী;
তুমিই মা রমনী কুলের শিরোমনি।

করিলে মা তুমি অসম্ভবে সম্ভবিত;
পুত্র সম প্রজা তব সদা প্রফুল্লিত।

লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রাণ মন খুলে;
চাহিছে মঙ্গল তব সবে কর তুলে।
কোটি কোটি কণ্ঠ ভবে সুতান ধরিয়া;
তব স্তব গায়, তুমি ধণ্যা ভিক্টোরিয়া ।।''[৭৮]

উল্লেখ্য যে, মহারানীর প্রতি উচ্ছাস স্তব প্রকাশের পাশাপাশি বিধবাদের উদ্ধারের জন্য তাঁর প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে। ইংরেজ শাসনের প্রতি এই আস্থা প্রকাশে, মহারানীর প্রতি স্তব প্রকাশে এবং লর্ড বেন্টিকের প্রশস্তিতে তাঁর যে, মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা হচ্ছে সরকারের সমাজ সংস্কারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। আনিসুজ্জামান মুন্সীর এ মনোভাবকে তাঁর প্রাগসর চিন্তাধারার পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। স্মতর্ব্য যে, সিপাহী অভ্যুত্থানকালে সরকারের এসব প্রগতিশীল সংস্কারকর্মকে কিছুটা ভুল ব্যাখ্যা করে জনসাধারনের রক্ষণশীল মনোভাবকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। বিধবা গঞ্জনায় কিন্তু সরকারের এসব পদক্ষেপকে ভারতীয়দের ধর্মীয় জীবনের উপর খ্রীষ্টান সরকারের হস্তক্ষেপরূপে দেখা হয়নি বরং অভিনন্দিত করা হয়েছে। এতে রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদনের বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে আনিসুজ্জামান যথার্থই মন্তব্য করেছেন,

> ''মেহেরুল্লাহ্‌র ধর্মবোধ এমন একটা যথার্থ্য ও উদারতার মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল, যার ফলে কেবল স্বধর্মের ক্ষেত্রে নয়, অন্য ধর্মালম্বীর জীবনযাত্রাও সংস্কারমুক্ত হোক এবং মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক, এই আন্তরিক অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।''[৭৯]

অধিকাংশ পন্ডিতের মতে, 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' গ্রন্থটির আপত্তিজনক দিক হচ্ছে লেখকের রুচিহীনতা। এতে মেহেরুল্লাহ্‌ সুরুচির পরিচয় দেননি। মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী বলেছেন যে, বিধবাদের এবং বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যাদের দুরাবস্থার বর্ণনার মধ্যে সুরচির অভাব বেশ পরিলক্ষিত হয়।[৮০] আনিসুজ্জামানও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায়, ''বিধবাদের (এবং বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যাদের) দুরবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে - ভারতচন্দ্রীয় নারীগণের পতিনিন্দার ষ্টাইলে - তিনি যতখানি বাস্তবধর্মী হতে চেয়েছেন, সাহিত্যকর্মের পক্ষে অতটা অনুমোদনযোগ্য নয়।''[৮১] তিনি লেখকের পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অভাবকে এরূপ রুচিদোষের অন্যতম হেতু বলে উল্লেখ করেছেন।

মুন্সীর এই গ্রন্থটি তৎকালীন হিন্দু সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুরা একে অশ্লীল, অরুচিকর রচনা বলে অভিযুক্ত করে। অবশ্য মুন্সীর জীবদ্দশাতে তাদের এ প্রতিবাদ বেশী উচ্চকিত হয়নি। তাই আমরা দেখি যে, মুন্সীর জীবনকালেই এ পুস্তকের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মনসুর আহমেদ পুস্তকটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করলে বিরোধী পক্ষ 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা'র ন্যায় এ পুস্তকটির বাজেয়াপ্তি দাবী করে। আদালতে এ ব্যাপারে মামলা হলে বিচারক অশ্লীলতার অভিযোগ এনে বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। উল্লেখ্য যে রচনাটির ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে মুন্সী সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। তেমনি এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। পুস্তকটির উপক্রমণিকাতে এ বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর ভাষায়,

> ''যে বিধবা হৃদয়ে জলন্ত ছবি অঙ্কন ও প্রদর্শন করিয়া একদিন ---- মহাত্ম রাজা রামমোহন এবং ---- পন্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিপক্ষ দল কর্তৃক কত শত প্রকারে লাঞ্ছিত ও অপভাষায় তিরস্কৃত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; সেই অসীম যাতনা-গ্রস্থ ও অনন্ত, বিষাদ পূর্ণ অবলা হৃদয়ের বিষাদ কীতন করিতে যাইয়া, মাদৃশ বিদ্যা ও বুদ্ধিহীন অভাজনকেও

Dhaka University Institutional Repository

যে অনেকের চক্ষের বালি এবং বহুবিধ অভিনব বিশেষণে বিশেষায়িত হইতে হইবে, তাহাও নিঃসন্দেহ।''[৮২]

তবে নিন্দুকের অন্যায় নিন্দা, তীব্র তিরস্কার সহ্য করার মানসিক শক্তি তাঁর আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এরূপ গ্রন্থ রচনার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে সজাগ হয়েও তিনি কেন এরূপ কাজে প্রবৃত্ত হলেন? এর উত্তর সম্ভবত সত্য ও ন্যায়ের তাগিদেই তিনি এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ রচনা প্রকাশে আগ্রহী হয়েছিলেন।

'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' গ্রন্থে নারী চরিত্রগুলোর বিভিন্ন সংলাপে এবং পাদটীকায় এমন সব উক্তি ও মন্তব্য রয়েছে যাতে অশ্লীলতা আছে বৈ-কি কিন্তু পুরো গ্রন্থের মূল বক্তব্য হৃদয়াঙ্গম করলে এবং এ রচনার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে ঐ অশ্লীলতাটুকু আর বড় হয়ে দেখা দেয় না। উদাহরণস্বরূপ সধবা সরলার পুত্রকে দেখার পর বিধবা তরঙ্গিনী মনের আকুতি প্রকাশের ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য। লেখকের ভাষায়,

''সে রূপ লাবণ্য হেরি, শিরে করাঘাত করি
জোড়ে তরঙ্গিনী পতিহীন
মুখে বলে হায় হায়। দুঃখে বুক ফেটে যায়
দুঃখে মোর গেল চিরদিন।।
যদি পাইতাম পতি হইতাম পুত্রবতী
হেরিতাম দু নয়ন খুলে
যে কাঁচা কোমল মুখে, চুম্বিতাম মনসুখে,
বাছা বলে লইতাম কোলে।।
পুরিল না মনো আশ, হাসিয়া মধুর হাস,
মোরে না বলিবে কেহ মা।
মধুময় সুধা রবে, কেহ নাই কথা কবে,
আজীবন মনে রবে ঘা।।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান বিহনে হায় পরাণ ফাটিয়া যায়

সাধ হয় হেরি পুত্র মুখ।''[৮৩]

তরঙ্গিনীর এই যে কামনা এটি প্রতিটি নারীর কামনা নয়? কিন্তু তা থেকে ধর্মের নামে দেশাচারের নামে গোঁড়া হিন্দু পুরোহিতগণ লক্ষ কোটি নারীকে বঞ্চিত করেছে। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ বিধবা নারীদের এই করুণ আর্তিটাই তুলে ধরেছেন এবং এটি করতে যেয়ে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা কিছু কিছু ক্ষেত্রে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। মুন্সী গ্রন্থের উপক্রমনিকায় এ ত্রুটির কথা স্বীকারও করেছেন। একই সাথে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন যে, যেন ভাষার দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি নয় বরং এর উদ্দেশ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়।

নানা রকম ত্রুটি বিচ্যুতি সত্বেও বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার পুস্তকটির গুরুত্ব অপরিসীম। মুস্তাফা নুরউল ইসলাম বলেছেন,

> ''এ পুস্তকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সমাজচিত্র, বিশেষ করে তৎকালীন সমাজের নারীর মূল্য, বিধবা রমনীর সামাজিক অবস্থান। এসব বিষয়ে প্রমাণ্য তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে পুস্তকটি থেকে। এই বিচারে বিধবা গঞ্জনার মূল্য অপরিসীম।''[৮৪]

শুধু তাই নয়, তৎকালীন সমাজে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। শেখ হবিবর রহমানের তথ্য মতে, ''মুন্সীর চেষ্টা এবং বিধবা গঞ্জনা পুস্তকের প্রভাবে মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহের পুনঃ প্রচলন হয়। হিন্দু সমাজেও এর প্রভাব লক্ষ্যনীয়।''[৮৫]

৭. পান্দেনামা

এটি মুন্সীর একটি অনুবাদ কর্ম। এর প্রথম সংস্করণের প্রকাশ কাল সম্পর্কে কোন তথ্যই জানা সম্ভব হয়নি। লন্ডস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ক্যাটালগে বঙ্গানুবাদিত 'পান্দেনামার' দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখ আছে। এ সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। এ সংস্করণের প্রকাশক মনসুর আহমদ, ছাতিয়ানতলা, যশোর। মুদ্রকঃ মুহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬+৭১। মূল্য, ৪ আনা।

Dhaka University Institutional Repository

পান্দেনামার মূল লেখক প্রখ্যাত ফার্সী কবি শেখ সাদী। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ শেখ সাদীর এ বিখ্যাত কাব্যটির বঙ্গানুবাদ করেন। বঙ্গানুবাদিত কাব্য গ্রন্থটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। তবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, অনুবাদক তাঁর অনুবাদ পুস্তকের মূল কাব্যটি ফারসী হরফে উদ্ধৃত করেছেন এবং সেই সাথে বাংলা হরফে তার উচ্চারণ প্রদান করেছেন। মুন্সীর অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বঙ্গানুবাদিত পান্দেনামাও ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা লাভ করেছিল বলে জানা যায়।

৮. সাহেব মুসলামান

মুন্সীর পুত্র মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের তথ্য মতে, তাঁর পিতা 'সাহেব মুসলমান' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। তবে এ পুস্তিকাটিও সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুস্তাফা নুরউল ইসলাম লিখেছেন, তিনি ইসলাম প্রচারক পত্রিকার ফাইলে (১৯০৮) এই পুস্তিকার বিজ্ঞাপন দেখেছেন, 'সাহেব মুসলমান', দাম-১ আনা। তবে বিজ্ঞাপনে পুস্তিকাটির রচয়িতার নাম উল্লেখ ছিল না।[৮৬]

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে উল্লেখিত তথ্যানুযায়ী অষ্ট্রেলিয়া নিবাসী একজন সাহেব মুসলামান হয়ে লিভারপুলস্থ মোঃ আবদুল্লাহ কুইলিয়ামকে যে পত্র লিখেছিলেন তা ১২২৫ হিজরী ৫ই মহররম তারিখে 'মনসুরে মোহাম্মদী' গেজেট-এ প্রকাশিত হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ সেখান হতে এর সরল বাংলা অনুবাদ করেন। সম্ভবত অনুদিত চিঠিটি পুস্তিকা আকারে সাহেব মুসলমান সংক্ষিপ্ত নামাকরণে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল-৯।

৯. জওয়াবোন্নাছারা

'জওয়াবোন্নাছারা' মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ একটি অন্যতম আলোচিত পুস্তিকা। নামকরণ থেকেই বুঝা যায় এটি মুলত খ্রীষ্টানদের প্রশ্নের জবাব সংকলন। বস্তুত নোয়াখালীর মুসলিম বাসিন্দাদের অনুরোধে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ সেখানকার খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কতিপয় প্রশ্নের যে লিখিত জওয়াব দিয়েছিলেন, তাই 'জওয়াবোন্নাছারা' নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের প্রকাশ কাল বাং ১৩০৪ সাল/১৮৯৭খ্রিঃ। প্রকাশক- মৌলভী আবদুল জব্বার, নোয়াখালী। গ্রন্থসত্ব -গ্রন্থাকার। ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বাং ১৩১৫/১৯০৮ খ্রিঃ। প্রকাশকঃ শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন, গাঁড়ডোব, নদীয়া।

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রকঃ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা, মূল্য, দুই আনা, পৃঃ সংখ্যা ৪৫।

আবুল হাসান চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, এই পুস্তকটি মেহেরুল্লাহ্‌র নামে প্রকাশিত হলেও, রচয়িতা হিসাবে জমিরুদ্দীনের কিছু ভূমিকাও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মেহেরচরিত গ্রন্থ থেকে 'জওয়াবোন্নাছারা'র উৎস সম্পর্কে শেখ জমিরুদ্দীনের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। জমিরুদ্দীন লিখেছেন,

> ''নোয়াখালির পাদৃ সাহেবেরা তথাকার মুসলামাদিগের নিকট কতগুলি প্রশ্ন করেন। নোয়াখালির মুসলমানেরা নিরুত্তর হইয়া প্রশ্নগুলি মুনশী (মেহেররুল্লাহ্‌) সাহেবের নিকট্‌ পাঠাইয়া দেন। মুনশী সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া উহার উওর লিখিয়া দেন। নোয়াখালির মুনশী মুহম্মদ আবদুল জব্বার সাহেব জওয়াবোন্নাছার নাম দিয় পাদৃর প্রশ্ন ও আমাদের উত্তরগুলি একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করেন।''[৮৭]

হাসান চৌধুরীর মতে, এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ এককভাবে জওয়াবোন্নাছারা পুস্তক রচনা করেননি, এতে জমিরুদ্দীনের সহযোগিতা ছিল। তাই জমিরুদ্দীনকে এই পুস্তকের যুগ্ম রচনাকারের মর্যাদা দেওয়া বোধ হয় অসমচীন হবে না।[৮৮]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন শেখ জমিরুদ্দীন। এ সংস্করণে একটি বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত শেখ জমিরুদ্দীনের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,

> ''নোয়াখালির মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার মিয়ার অনুরোধে মুনশী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র মরহুম সাহেব প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন। প্রথম ইহা ১৩০৪ সালে নোয়াখালিতে ছাপা হয় বটে, কিন্তু পুস্তকে মুনশী সাহেবের স্বত্ব থাকে। যাহা ইউক, নোয়াখালির আব্দুল জব্বার মিয়া তাঁর পুস্তকখানি প্রকাশ করিবার জন্য যত্ন না করাতে, মুনশী সাহেব জীবিত থাকিতে আমাকে ইহা প্রকাশ করিতে বারংবার আদেশ করেন। কিন্তু নানা প্রকার আপদ-বিপদে জড়ীভূত থাকাতে, এতদিন আমিও প্রকাশ করিতে পারি নাই। এক্ষণে অনেক যত্ন চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করা গেল। ইহা দ্বারা সমাজে উপকার হইলেই মঙ্গল।''[৮৯]

লক্ষ্যনীয় যে, উর্পযুক্ত বিজ্ঞাপনে শেখ জমিরুদ্দীন বলেছেন প্রশ্নগুলির উত্তর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ লিখেছেন। এখানে তিনি তাঁর সহযোগিতার কথা বলেননি। তারপরেও বলা যায়, যদি তিনি

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করেও থাকেন তথাপি তিনি যেহেতু নিজে এ পুস্তক রচনায় যুগ্ম রচনাকারের কৃতিত্ব দাবী করেননি, তাহলে তাঁকে এ কৃতিত্ব দেওয়ার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি?

বাংলা ১৩৮৩/১৯৭৬ খ্রিঃ 'জওয়াবোন্নাছারা' পুস্তকটি পূনঃ প্রকাশ করেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ কনিষ্ট পুত্র মুন্শী মোখলেসুর রহমান। ঢাকাস্থ মুসলিম অনুশীলন সংস্থার অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত এ পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩২, মূল্য, ২ টাকা।

'জওয়াবোন্নাছারা' পুস্তকে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের ইসলাম ধর্ম, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ), খ্রীষ্ট ধর্ম এবং যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে উত্থাপিত ৩৩টি প্রশ্নের সারগর্ভ উত্তর প্রদন করা হয়েছে। প্রশ্নোত্তর শেষে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ প্রশ্নকারী পাদ্রীকে এই অনুরোধ করে পুস্তিকাটি শেষ করেছেন,

> ''আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলাম, প্রশ্নগুলি একান্তই অসাড় ও ধোঁকাপূর্ণ। আশাকরি, আপনি আর কখনও এরূপ ধোঁকাপূর্ণ প্রশ্নপত্র মুদ্রিত করিয়া সরলমনা খোদাভক্ত বিশ্বাসীগণকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিবেন না।''[৯০]

১০. ঈসাই বা খ্রীষ্টানী ধোঁকা ভঞ্জন

আমাদের জানা মতে, ঈসাই বা খ্রীষ্টানী ধোঁকা ভঞ্জন মেহেরুল্লাহর রচিত একটি প্রবন্ধ। এটি জন জমিরুদ্দীন নামক জনৈক খ্রীষ্টান পাদ্রীর 'আসল কোরান কোথায়' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় লেখা। তাঁর এ সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি 'সুধাকর' পত্রিকায় ৪টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। কাজী দীন মুহম্মদের তথ্য মতে, ''এটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৩ সালে এ পুস্তকাটি প্রকাশিত হয়েছিল বলে মোঃ আবদুর রাজ্জাক উল্লেখ করেছেন।''[৯১]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এটি মুন্সীর একটি প্রতিক্রিয়ামূলক রচনা। পাদ্রী জন জমিরুদ্দীন খ্রীষ্টিয় বান্ধব পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বলেন যে,

> ''আমরা যখন মুসলমানদের নিকট সু-সমাচার প্রচার করি তখন অনেক মুসলমানই কহিয়া থাকেন যে, আপনাদের ধর্ম শাস্ত্র পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্ত আমাদের কোরান কখনই পরিবর্তিত হয় নাই। ---- যিনি মুসলমান শাস্ত্রে অজ্ঞ, তিনিই বলেন যে, কোরান কখনই পরিবর্তিত হয় নাই। ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে প্রমাণ দিতেছি যে, আসল কোরান বিকৃত ও পরিবর্তিত হইয়াছে।''[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর তিনি তথাকথিত হাদিস ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ছয়টি প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন যে, অতএব ''দেখা যাইতেছে যে, নিশ্চয় আসল কোরান এখন নাই। এখনকার মুসলমানদিগের হস্তে যাহা আছে তাহা নকল এবং সংশোধিত কোরান।''[৯৩] এসব প্রমাণের ভিত্তিতে মুসলমানদের প্রশ্ন করেন তাহলে, 'আপনাদের আসল কোরান কোথায়?'

জন জমিরুদ্দীনের উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদেই মুন্সী 'ঈসাই বা খ্রীষ্টানী ধোঁকা ভঞ্জন' প্রবন্ধটি রচনা করেন। এ প্রবন্ধটি মুন্সীর প্রজ্ঞা এবং সুগভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। এতে তিনি জন জমিরুদ্দীন কর্তৃক সংশয়শূণ্য মহাগ্রন্থ আল কোরানের প্রতি অযথা আক্রমণের ও ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে এর আকৃত্রিমতা প্রমাণের অপপ্রয়াসের নিন্দা করেছেন। অতঃপর তিনি অত্যন্ত নিপূনতার সাথে পর্যায়ক্রমে শেখ জমিরুদ্দীনের উত্থাপিত ছয়টি ধোঁকার উত্তর প্রদান করেছেন। পরিশেষে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে,

> ''আশাকরি এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কোরানের আসলত্বে কোন প্রকারেই গোলমাল হয় নাই। আজ আমরা তর্করূপ রণ প্রান্তরে দন্ডায়মান হইয়া সগর্ব্বে উচ্চঃস্বরে বলিত পারি যে, যদি ঘটনাক্রমে একই সময়ে জগতের সমস্ত লিখিত কাগজপত্র, প্রস্তর ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে পৃথিবীতে অন্য কোন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ অঙ্গহীন অবস্থায় ব্যতীত পাওয়া যাইবে না। কেবল কোরান শাস্ত্রই সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ বিদ্যমান থাকিবে; তাহার আসলত্বের বিন্দু বিসর্গও ক্ষতি হইবে না। খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুগণ, ধর্ম্মতঃ বল দেখি, তোমরা বাইবেলের বলে এরূপ সাহস বাঁধিতে পার কি?''[৯৪]

১১. মানব জীবনের কর্তব্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'মানব জীবনের কর্তব্য' মুন্সী মেহেরুল্লাহর কোন পূর্ণাঙ্গ পুস্তক-পুস্তিকা নয়। এটি তাঁর প্রদত্ত একটি বক্তৃতার খসড়া। আমরা জানি যে, তিনি বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ধর্মসভায় বক্তৃতা করেছেন। এসব সভার অন্যতম হচ্ছে কুচবিহার টাউন হলের সভা। তৎকালিন কুচবিহারের মহারাজা বাহাদুর কর্নেল স্যার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূমের সভাপতিত্বে এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৬শে আষাঢ় ১৩১১ বঙ্গাব্দ। সম্ভবত মুন্সীর কোন গুরুত্বপূর্ণ সভায় বক্তৃতা দানের পূর্বে বক্তৃতার বিষয় ঠিক করে, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত খসড়া তৈরী করে নিতেন। আমাদের আলোচ্য মানব জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্য'ও তদ্রুপ একটি খসড়া। মুন্সীর স্বহস্তে লিখিত খসড়া আমাদের ব্যবহারের সুযোগ হয়েছে। এটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

১৯৮৮ খ্রিঃ নাসির হেলালের সম্পাদনায় দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় 'মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি মানব জীবনের কর্তব্য' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নাসির হেলাল সম্পাদিত মেহেরুল্লাহ রচনাবলী-১ গ্রন্থেও এ রচনাটি সংকলিত হয়েছে।

মুন্সীর মেহেরুল্লাহ্‌ তাঁর এ বক্তৃতার খসড়াটি প্রায়ক্ষেত্রেই পয়ন্টাকারে লিখেছেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচনাও করেছেন। তিনি এতে ব্যবহৃত কোরআনের আয়াত ও হাদিসগুলো আরবীতে এবং ফারসী কবিদের বয়াতগুলো ফারসীতেই লিখেছেন। তবে এসব ক্ষেত্রে বাংলা অর্থ লিখেননি।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ খসড়ায় স্রষ্টা কর্তৃক মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করে পৃথিবীতে মানব জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়,

> ''মানব বহু কর্তব্য মস্তকে লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সেই সমস্ত কর্তব্য জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা সম্পূর্ণ পালন করিতে সক্ষম হন তাহাদিগের মানব জীবনই সার্থক, আর তাহারাই দেবত্ব লাভ করেন, যাহারা আপন কর্তব্য জ্ঞন অনভিজ্ঞ ও তাহা পালন করিতে অসমর্থ, বাস্তবিক জগৎ সংসারে তাহারাই ভাগ্যহীন ও তাহারাই অসম্পূর্ণ মানব।''[৯৫]

মেহেরুল্লাহ্‌র মতে, মানুষের মধ্যে দ্বিবিধ শক্তি বীজ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে। ক) দেব বা ফেরেশ্‌তা শক্তি, এটি বেহেশতজাত, ইহা নূরের অংশ। খ) পাশবিক শক্তি, ইহা দেশজাত পঞ্চভূতাত্মা বা চারিভুতের গুণ বিশিষ্ট জীবাত্মা। তাঁর মতে এ দুপ্রকার শক্তির সংমিশ্রণে সৃষ্টিকর্তা এক লৌকিক কৌশলে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, ''এই ফেরেশ্‌তা শক্তি প্রবল হইলে মানব সৃষ্টিকর্তার দিকে অথবা কর্তব্য পথে অগ্রসর হয়। পাশবিক শক্তি প্রবল হইলে মানব উহার বিপরীত পথে ধাবিত হয়।''[৯৬] এই উভয়বিদ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল সম্পর্কে বলেছেন যে, উভয় শক্তিকে সাম্য ও সুস্থ রাখিতে হইলে উভয় দেশে নিদানোক্ত বিধান প্রয়োজন। তিনি পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, মানুষ পার্থিব মোহে ভুল পথে পা

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ায়। এটি মোটেই সুখকর নয়। অনিবার্য মৃত্যুর কথা স্মরণ রেখে তাকে অবশ্যই কু-স্বভাব পরিত্যাগ করতে হবে।

এরপর তিনি এসেছেন ইবাদত প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে তিনি কোরআন, হাদিস, এবং ভগবত ইত্যাদির উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, খোদাতায়ালার আরাধনা ও মানব সমাজের হিত সাধনাই সমুদয় মানবের জীবনে অতি কর্তব্য। ইহারই অনুকূল কর্ম ও কথা পূণ্য ও ইহারই প্রতিকুল পাপ বলিয়া গণ্য। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র মতে, কর্তব্য–পরায়ণ মানবই জগতে অমরত্ব লাভ করে থাকেন। তাঁর মতে, কর্তব্য–পরায়ণতার পূর্বশর্ত হল আত্মশুদ্ধি, আর আত্মশুদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা কু-প্রবৃত্তি দমনের বেশ কিছু উপায় পয়েন্টাকারে উল্লেখ করেছেন।

মানব জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে উপর্যুক্ত আলোচনার পর মেহেরুল্লাহ্‌ তাঁর পান্ডুলিপিতে ধর্ম ও নৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এক্ষেত্রে আলোচনার পরিমাণ একেবারেই অল্প। তাঁর মতে, এক কথায় ধর্মের কোন সংজ্ঞা হয় না। ধর্ম বলতে তিনি মানবজীবনের নানাবিধ সৎকর্মের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, আল্লাহ্‌কে জানা ধর্মের পূর্বশর্ত। আর আল্লাহ্‌কে জানা বা তাঁকে লাভ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে ধর্ম। এ ব্যাপারে তিনি উপায়ও বাত্‌লে দিয়েছেন, এবং এসব উপায়কে ১৮টি পয়েন্ট এ ভাগ করেছেন।

মেহেরুল্লাহ্‌ কৃত এ পান্ডুলিপিটির সমাপনী বক্তব্য নেই। অর্থাৎ পূর্বোক্ত বক্তব্যে উপসংহারে তিনি কিছুই লিখেননি। তবে তার বক্তব্যপাঠে বুঝা যায় যে, তিনি বলতে চেয়েছেন, পৃথিবীতে মানুষ বিনা কারনে আসেনি। আল্লাহ তাকে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সে যদি তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হয় তবে ইহকাল ও পরকালে তার সাফল্য অবধারিত।

৫.৩ সাময়িকপত্র ও সাহিত্য সেবীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান

সমকালীন পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। মুহম্মদ আবু তালিব বলেছেন, ''তিনি নিজে সাংবাদিক ছিলেন না। কিন্তু মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসেও মুন্সী সাহেবের অগ্রণী ভূমিকা ছিল।''[৯৭] জাতীয় উন্নয়ন সাধনের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করতে যেয়ে তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন যে, এই কার্যে বক্তৃতাপ্রদান, প্রতিষ্ঠান সংগঠন এবং পুস্তক রচনার পাশাপাশি সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলমান সাময়িকপত্র সাধনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। ইসলাম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে তিনি সাময়িকপত্রে নিয়মিত প্রবন্ধ রচনাই শুধু করেননি, বরং তৎকালীন মুসলিম পরিচালিত কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচারের ব্যাপারে যথাসাধ্য শ্রম স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে 'ইসলাম প্রচারক' 'সুধাকর' 'মিহির ও সুধাকর' 'সোলতান' ইত্যাদি সাময়িকপত্রের উল্লেখ করা যায়। নানাভাবে তিনি এসব পত্র-পত্রিকাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এমনকি কোন কোন পত্রিকা পরিচালনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

ইসলাম প্রচারক পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের সঙ্গে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র প্রগাঢ় সম্পর্কের কথা জানা যায়। রেয়াজুদ্দীন আহমদের অনুরোধে মুন্সী পিরোজপুরের খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ ছিলেন পৃষ্ঠপোষক ও নিয়মিত লেখক। সোলতান পত্রিকা প্রকাশে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ সম্পর্কে রেয়াজুদ্দীন আহমদ বলেছেন,

> ''সম্ভবত ১৩১২ সালে সোলতান সংবাদপত্র আমার সম্পাদকতায়, রংপুর-মহীপুরের। বিখ্যাত জমিদার খান বাহাদুর চৌধুরী আবদুল মজিদ মরহুম ও মৌলবী মীর্জ্জা মোহম্মদ ইউছুফ আলী সাব রেজিষ্টার মরহুমের অর্থানুকুল্যে বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগ্মী মুন্শী মোহাম্মদ মেহেররুল্লাহ্‌ মরহুম, এসলাম-প্রচারক মুন্শী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ ছাহেব ও মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী ছাহেবের বিশেষ সাহায্যে বাহির হয়।''[৯৮]

রওশন আলী চৌধুরী সম্পাদিত কোহিনুর (১৩০৫) পত্রিকার সঙ্গেও মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ জড়িত ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি এবং মাতৃভাষার সেবার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছিল বলে এর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক দাবী করেছিলেন। পত্রিকাটি পরিচালনার জন্য 'কোহিনূর পরিচালক সমিতি' নামে একটি কমিটি ছিল। ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট এই পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌। তাছাড়া ১৩০৫ সালের ভাদ্র-সংখ্যা কোহিনূর পত্রিকায় মাননীয় প্রতিনিধি ও হিতৈষী এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত যে সব ব্যক্তিবর্গের

Dhaka University Institutional Repository

নামোল্লেখ করা হয়েছিল তাতে কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক প্রমুখের সঙ্গে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র নামটিও ছিল।

'সুধাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা। খ্রীষ্টানদের আক্রমন থেকে ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করা এ পত্রিকার প্রধান দায়িত্ব ছিল। মুন্সী মেহেরুল্লাহ সুধাকর পত্রিকার লেখক শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। এ পত্রিকাতেই তাঁর বিখ্যাত 'ঈসাই বা খ্রীষ্টানী ধোঁকাঞ্জন' এবং 'সর্ব্বত্রই আসল কোরান' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রাহক ও পাঠক পত্র-পত্রিকার প্রাণ-স্বরূপ। উর্পযুক্ত পত্র-পত্রিকাসমূহের গ্রাহক সংগ্রহ ও পাঠক তৈরীতে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমরা জানি যে, ''প্রচারকার্য উপলক্ষ্যে তাঁকে দেশের বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ এবং অসংখ্য সভায় বক্তৃতা করতে হত। জন- সংযোগের এই সুযোগে তিনি উর্পযুক্ত পত্র-পত্রিকার জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতেন।''[৯৯]

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ ১৮৭৩-১৯০৫ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের সম্পাদনায় প্রকাশিত বাংলা পত্র-পত্রিকার যে তালিকা উল্লেখ করেছেন তাতে নূরুল ইসলাম নামে একটি বার্ষিক পত্রিকার নাম দেখা যায়। এটি যশোর থেকে প্রকাশিত হত এবং এর সম্পাদক ছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌।[১০০] পত্রিকাটি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।সম্ভবত পত্রিকাটি প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে। যশোরের ডিষ্ট্রিক ও সেশন জজ সৈয়দ নুরল হোদার পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভবত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে এরূপ ধারণা করা যায়। তাঁর ভাষায়,

> ''সুবিচারক জজ বাহাদুর (সৈয়দ নুরল হক) (মেহেরুল্লাহকে) সুমধুর ভাষায় ইসলাম মিশন স্থাপন ও মাদ্রাসায় কারামতিয়ার উন্নতি বিধান করিতে উৎসাহ প্রদানপূর্বক স্বয়ং সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ---- তাঁহার যশোহরে আগমনের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ নুরল হোদা নামের সংপৃষ্টে আমরা 'নুরোল ইসলাম সমিতি' 'নুরোল ইসলাম মিশন' 'নুরোল ইসলাম পত্রিকা'র সূত্রপাত করিলাম।''[১০১]

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

কেবল নিজে সাহিত্য চর্চা নয়, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ তাঁর সমকালীন মুসলিম সাহিত্যসেবীদের যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহিত করেন। শেখ হবিবর রহমান বলেছেন, ''তিনি যখনই কোন অঙ্কুরোন্মুখ সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন, তখনই উপযুক্ত সাহায্য ও উৎসাহে তাহাকে জাগাইয়া তুলিতেন।''[১০২]

বস্তুত তাঁর অনুপেরণা ও সহযোগিতায় সাহিত্য সাধনার জন্য একটি শক্তিশালী নিবেদিতচিত্ত মুসলিম সাহিত্য সাধকদল গড়ে উঠেছিল। এ দলের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন কবি শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ নীতিভুষন, মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, কবি ইসলামইল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ।

শেখ ফজলল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৮২-১৯০৬ খ্রিঃ)

শেখ ফজলল করিম রংপুর জেলার কাকিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলতঃ কবি, তবে তাঁর উত্তম গদ্য রচনাও রয়েছে। তাঁর সমস্ত কাব্য ভাবনা ও সাহিত্যানুশীলনের মৌল আবেদন হল ধার্মিকতা ও নৈতিকতা। ইসলাম ধর্মই ছিল তার নীতিজ্ঞান ও আর্দশ বুদ্ধির উৎস। আর এ কারণেই সম্ভবতঃ মুন্সী মেহেরুল্লাহর সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ দিকে শেখ ফজলল করিম তাঁর 'পরিত্রাণ' কাব্য রচনা করেন। এটি ছিল ইসলামী সৃষ্টিতত্বমূলক কাব্য কাহিনী। এ কাব্য রচনার মূলে ছিল ইসলাম ধর্মের মহিমা প্রচারে কবির উদগ্র কামনা। কাব্যের সুচনায় কবি নিজেই বলেছেন, ''চিরবাধ্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সাত্ত্বিক জীবনের কাহিনী, ইসলামের জন্য ও আমাদের জন্য অসাধারণ আত্মত্যাগ কবি তুলিকায় চিত্রিত করিবার আশায় পরিত্রাণ কাব্যের সৃষ্টি।''[১০৩]

পরিত্রাণ কাব্যের কতকাংশ প্রথমে 'প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তা আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত যথাযথ সুযোগের অভাব এবং আর্থিক অসুবিধার কারণে এহেন গুরুত্বপূর্ণ কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র সাথে কবি শেখ ফজলল করিমের প্রথম পরিচয় ঘটে রংপুর জেলার কাকিনার মহিষখচা গ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

একটি ধর্মসভায়। এখানে কথাপ্রসঙ্গে 'পরিত্রাণ' কাব্যের কথা উঠে। কাব্যের বিষয়বস্তুর কথা শুনে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ খুব খুশী হন এবং নিজ ব্যয়ে এটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। কলকাতাস্থ রিয়াজুল ইসলাম প্রেস থেকে কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের অবতারণিকায় তার স্বীকৃতি আছে-''বঙ্গ বিখ্যাত মিশনারী, বাগ্মী প্রবর শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ সাহেব গ্রন্থ মুদ্রাঙ্খনে যে সদশয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।''[১০৪]

দুঃখের বিষয় এই যে, মুন্সী সাহেব কর্তৃক নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত 'পরিত্রাণ' কাব্যগ্রন্থটি সমকালীন মুসলিম পাঠক সমাজে নন্দিত হয়নি। শেখ ফজলল করিম বলেছেন,

> ''মুসলমান সমাজে এই বইখানির যথোচিত আদর হয় নাই। কিন্তু হিন্দু সমাজে এবং তৎকালীন শ্রেষ্ট হিন্দু সংবাদপত্র সমূহে ইহা বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। একথা বলিলে বোধহয় অন্যায় হইবে না যে, মুসলমানদের মধ্যে 'পরিত্রাণ কাব্য' পড়িবার মত লোক তখন খুব কমই ছিল। যাহারা ছিলেন, তাঁহাদের কাছেও উপেক্ষা ছাড়া আর কিছু বিশেষ লাভ হয় নাই। দুএকজন ব্যঙ্গও করিয়াছিলেন। অবস্থা দেখিয়া মহাপ্রাণ মুন্শী সাহেব নব প্রকাশিত সোলতানের গ্রাহকদিগকে নাম মাত্র মূল্যে পুস্তকখানি উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাতে আর কিছু না হোক অন্ততঃ বাংলাদেশের অনেক স্থানে আমি কিঞ্চিত পরিচিত হইলাম এবং সাহিত্য সেবায় আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল।''[১০৫]

পরিত্রাণ কাব্যটি নিয়ে মুন্সী বিশেষ বিব্রত ছিলেন সন্দেহ নেই। তবে এর ভবিষ্যত সমন্ধে তিনি ছিলেন আশাবাদী। শেখ হবিবর রহমানকে লেখা এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, ''কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যেদিন এ জাতীয় কাব্যখানির নিশ্চয় আদর হইবে।''[১০৬]

তাঁর এ আশাবাদ সত্যে পরিণত হয়েছিল। পরিত্রাণ কাব্য এবং এর কবি পরবর্তীকালে সম্মানিত ও সমাদৃত হয়েছিলেন। শেখ ফজলল করিম কবি হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে মুন্সীর উৎসাহ অনুপ্রেরণার কথা স্বীকার করেছেন অকপট ভাষায়,

-''তোমার বিপুল স্নেহ আকুল আহবানে
হতভাগ্য এ কবি লভি নব বল
অবতীর্ণ হয়েছিল সাহিত্য সংসারে।।''[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৯৯০-১৯৩১)

মুহম্মদ আবু তালিব লিখেছেন, ''বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যথা-রীতি স্বীকৃতি না পেলেও মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুন্সী মেহেরুল্লাহর পরে ঈসমাইল হোসেন সিরাজী বিশেষ বিখ্যাত।''[১০৮] তিনি যে সাহিত্য কর্ম রচনা করেন তাঁর মূল ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও নিখিল মুসলিম ভাবনা। মুন্সী মেহেরুল্লাহর জীবনব্রতও ছিল তাই। আর এ জন্যই তিনি সিরাজীকে নানাভাবে কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেন।

১৮৯৯ সালে সিরাজগঞ্জে বানোয়ারীলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে বড়ইতলায় একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এ সভায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন বক্তা। সভায় বানোয়ারী লাল উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র ইসমাইল হোসেন 'অনল প্রবাহ' নামে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি ছিল স্বদেশ অনুরাগিতা ও ইসলামী ঐতিহ্যপ্রীতি নিয়ে রচিত। মেহেরুল্লাহ এ তরুন কবির ইসলামীভাবে উজ্জীবিত কবিতা শুণে মুগ্ধ হন, এবং কবিতাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মেহেরুল্লাহর অর্থানুকুল্যে ১৮৯৯ খ্রিঃঅনল প্রবাহ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে সিরাজী 'অনল প্রবাহ, তুর্যধ্বনি, মুর্চ্ছনা, বীরপূজা, অভিভাষণ, ছাত্রদের প্রতি, মরক্কো সংকটে, আমীর আগমনে, দীপনা, ও আমীর অভ্যর্থনা' এই ৯টি কবিতা নিয়ে 'অনল প্রবাহ' বর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। স্ব-জাতির অধঃপতন ও পরাধীনতার জন্য তীব্র ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করে জাতীয় মুক্তি ও উন্নতি সাধনের উদাত্ত আহবান ধ্বনি 'অনল প্রবাহের' প্রায় প্রতিটি কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। মুন্সী মেহেরুল্লাহর জীবন ব্রতও ছিল এরূপ। যা হোক ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' কাব্যের প্রশংসাসূচক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। আর এ জন্যই সম্ভবত তিনি নিজ ব্যয়ে এর প্রথম সংকলন প্রকাশ করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম জীবনে কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' কাব্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহকে দেখার বা তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ নজরুল ইসলামের হয়নি। মুন্সী কর্তৃক 'অনল প্রবাহ' নজরুলের জীবনে অগ্নিবীনার দাহ দিয়েছে। কবি স্বয়ং একথা স্বীকার করে বলেছেন, সিরাজী সাহেব আমার

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃতুল্য।---- তাঁহার সমগ্র জীবনই ছিল 'অনল প্রবাহ'। আমার রচনায় সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রকাশ।[১০৯] এ বিবেচনায় আমরা নজরুলের ইসলামী রচনার অনুপ্রেরণা স্থল হিসাবে মুন্সীর প্রভাব দেখতে পাই। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র প্রতি কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী ছিলেন পরম শ্রদ্ধাবনত। মুন্সীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে তিনি শোকাচ্ছ্বাস নামক একটি কবিতা লিখেন,

''একি আকস্মাৎ হল বজ্রপাত! কি আর লিখিবে কবি
বঙ্গের ভাস্কর প্রতিভা অকালে লুকালো ছবি।

ছিন্ন হল বিন কল্পনা বিলীন উড়িল কবিত্ব পাখী,
মহা শোকানলে সব গেল জ্বলে শুধু জলে ভাসে আখি।
কি লিখিব আর শুধু হাহাকার শুধু পরিতাপ ঘোর
অনন্ত ক্রন্দন অনন্ত বেদন রহিল জীবনে মোর ।।''[১১০]

বলা বাহুল্য যে, এটি শুধু গতানুগতিক শোকোচ্ছাস নয়, বরং গভীর হৃদয়ের অভিব্যক্তি।

১৬. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬১)

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সাহিত্য চর্চায় যে সব ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তন্মধ্যে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন অন্যতম। শেখ হবিবর রহমান নিজেই এ ব্যাপারে বলেছেন, ''জনাব মুন্সী সাহেব ব্যতীত আজ আর এমন একজন লোকের কথা স্মরণ করিতে পারি না, আমার প্রাথমিক জীবনে সাহিত্য সমন্ধে যাঁহার নিকট উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য বা উৎসাহপ্রাপ্ত হইয়াছি।''[১১১]

শেখ হবিবর রহমানের জন্ম যশোর জেলার ঘোষগতি গ্রামে। মুন্সী মেহেরুল্লাহর সাথে তাঁর পরিচয় ১৮৯৯ সালে। এ বছর খুলনা জেলার পয়ঃগ্রাম কসবায় আয়োজিত এক ধর্মসভায় বক্তৃতা করতে মেহেরুল্লাহ্‌ শেখ জমিরুদ্দীনসহ সেখানে আসেন। শেখ হবিবর রহমান তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তিনি উক্ত সভা উপলক্ষ্যে দুটি কবিতা লিখেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ সেই কবিতা শুনে অত্যন্ত খুশী হন এবং তাকে 'শিশু কবি' বলে অভিহিত করে উৎসাহিত করেন।[১১২] এ ঘটনার কয়েক বছর পর

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হবিবর রহমান 'শের সংহার' কবিতা গ্রন্থ রচনা করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত কবিতা গ্রন্থটি ছিল যথেষ্ট ত্রুটিযুক্ত। মেহেরুল্লাহ্ এর কিছু অংশ কবি শেখ ফজলুল করিমের দ্বারা সংশোধন করতঃ 'ইসলাম' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন, ১৩১২ সালে ২রা শ্রাবন মুন্সী তাঁকে একটি পত্র লিখেন। এতে তিনি বলেন,

> ''আমার অর্থের অভাব না হইলে আপনার সম্পূর্ণ কাব্যখানী নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিতাম। খোদাতালা আমাকে জীবনে সুস্থ্য রাখিলে যে গতিকেই হউক পত্রিকায় এবং গ্রন্থাকারে আপনার লিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। মহাপ্রলয় কাব্যও শেষ করিবার চেষ্টা করুন। শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন-আমার সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে এমন আশার বানী আর কখনো শুনি নাই।''[১১৩]

শেখ হবিবর রহমান ব্যক্তিগতভাবে মুন্সী মেহেরুল্লাহর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন। মুন্সীর প্রতি কর্তব্য পালনকে তিনি নিজের একটি পবিত্র দায়িত্ব মনে করতেন। কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, তিনি নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে নানারূপ চেষ্টা করেছেন। মুন্সী যখন মৃত্যুবরণ করেন তখনও তিনি স্কুল ছাত্র। এতদসত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'মেহের বিলাপ' নামক একটি শোকোচ্ছাসপূর্ণ কবিতা পুস্তক রচনা করেছিলেন। অবশ্য অর্থাভাবে এটি মুদ্রণ করা সম্ভব হয়নি। যশোর জেলা স্কুলে পড়ার সময় শেখ হবিবর রহমানের প্রচেষ্টায় 'মেহেরুল ইসলাম সভা' নামে একটি বক্তৃতা সমিতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করা হয়েছিল। শেখ হবিবর রহমান ছিলেন 'যশোর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতির' অন্যতম উদ্যোক্তা সদস্য। তাঁর প্রচেষ্টায় উক্ত সমিতির পক্ষ থেকে ১৯২০ সালের ৪ঠা জুলাই ছাতিয়ানতলায় মুন্সীর স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয়। যশোরের তদানীন্তন পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট মিঃ হোয়েলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ স্মৃতি সভায় স্থানীয় অস্থায়ী জেলা মেজিষ্ট্রেট মিঃ জে. কে. বিশ্বাসসহ জেলার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। তবে হবিবর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে মুন্সীর জীবনীগ্রন্থ রচনা। 'কম্মবীর মুন্শী মেহেরুল্লাহ' শিরোনামের এ পুস্তকটি মুন্সীর জীবন ও কর্মের একটি প্রামাণ্য দলিল। এটি ১৯৩৪ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক বলেছেন, ''জনাব মুন্সী সাহেবের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া যে চিন্তা ও ভাবধারা আমার মনে জাগিয়াছে, আমার

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বল লেখনীর সাহায্যে তাহাই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ---- কতদুর সফলকাম হইয়াছি তাহা সুধীমন্ডলীর বিবেচ্য।''[১১৪]

উপরোক্ত জীবনীগ্রন্থ রচনায় শেখ হবিবর রহমানের কোন বৈষয়িক স্বার্থ চিন্তা ছিল না। মুন্সীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই সম্ভবত তিনি এরূপ একটি দুরূহ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখিত একটি ঘোষণা দ্বারা এরূপ অনুমিত হয়। এতে বলা হয়েছে যে, এই পুস্তক বিক্রয়ের লভ্যাংশ মরহুমের স্মৃতিরক্ষার জন্য 'মেহেরুল্লা মেমোরিয়াল কমিটির' হস্তে প্রদত্ত হবে।

১৭. মুন্শী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩৭)

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে ও বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে বাঙালী মুসলমানের সমাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অবক্ষয়রোধে যারা সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীনের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি ছিলেন বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচারক, বাগ্মী মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র ঘনিষ্ট পার্শ্বচর। মেহেরুল্লাহ্‌র সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যে তাঁর জীবন চেতনা প্রভাবিত হয়। তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনা ও স্ব-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ও তাঁর মর্যাদা সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত হিসাবে তিনি গুরুর ন্যায় সারা দেশে বক্তৃতা প্রদান করেছেন, সাংগঠনিক কর্মে লিপ্ত থেকেছেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনের তাগিদে পূর্বোক্ত ব্রত সাধনের সক্রিয় ও ফলপ্রসু উপকরণ হিসাবে সাহিত্যচর্চা ও প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। আর এভাবেই গড়ে তুলেছেন এক বিশাল রচনা ভান্ডার। যদিও তাঁর গ্রন্থ বা রচনার সঠিক সংখ্যা নিরূপন দুরূহ ব্যাপার। আবুল হাসান চৌধুরী প্রদত্ত তথ্য মতে, তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৯টি। তাছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ নিবন্ধের সংখ্যা প্রায় ৫০টি।[১১৫] অবশ্য এসব রচনার বিশেষ কোন সাহিত্য মূল্য নেই, আছে কেবল প্রচার মূল্য। এতদ্‌সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমানদের জাগরণে ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীনের ইসলাম ধর্মে পূণঃপ্রত্যাবর্তন এবং উত্তরকালে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের মূলে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র ভূমিকা ও অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি সাহিত্য চর্চা, গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনার বিষয়ে মেহেরুল্লাহ্‌র সবিশেষ উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। জমিরুদ্দীনের রচনায়

Dhaka University Institutional Repository

মেহেরুল্লাহ্‌র রচনার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। বিষয়বস্তুগত দিক থেকে উভয়ের রচনা ছিল প্রায় একই রকম।

শেখ জমিরুদ্দীনের রচিত একটি পুস্তিকার নাম 'হযরত ইসা কে?' ৩১ পষ্ঠার এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি তিনি রচনা করেছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র অনুরোধ ও প্রেরণাতেই। পুস্তিকাটি আদোপ্রান্ত পড়ে এটি সংশোধনও করে দেন তিনি। আর এজন্যই সম্ভবত লেখক পুস্তকটি মেহেরুল্লাকেই উৎসর্গ করেন।

আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত; শেখ জমিরুদ্দীনের একটি অন্যতম রচনা। এটি রচনার পেছনেও মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র পরামর্শ ও উৎসাহ ছিল। এ বইটির প্রথম সংস্করনের প্রকাশকও ছিলেন মেহেরুল্লাহ্‌। শেখ জমিরুদ্দীনের রচিত ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য পুস্তকটির পরিকল্পনা ও প্রকাশনাতেও মেহেরুল্লাহর বিশেষ ভূমিকা ছিল।[১১৬]

শেখ জমিরুদ্দীনের রচনাসমুহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হচ্ছে 'মেহের-চরিত'। এটি মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনীগ্রন্থ। মেহেরুল্লাহ্‌র বন্ধু, সহচর, অনুগামী গুনগ্রাহী জমিরুদ্দীন কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ জীবনী গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি উল্লেখ করেছেন-

> ''হায়! আজ প্রায় ৯/১০ মাস হইল, বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মুসলমান বাগ্মী ও সমাজসেবক, মোসলমানদিগের উন্নতির পথ প্রদর্শক ও সমাজ-সংস্কারক, সু-কবি সু-লেখক ও ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারক, সর্ব্বজন প্রিয় মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব পরেলোকগমন করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গে অনেক সুলেখক, সুদক্ষ ও সুযোগ্য ব্যক্তি থাকিতেও মুন্‌শী মরহুম সাহেবের জীবনী বাহির হইল না।''[১১৭]

সম্ভবত উর্পযুক্ত ক্রটি আপনোদনের জন্যই তিনি 'মেহের-চরিত' রচনা করেন। বলা বাহুল্য যে, এ কাজে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। আর তাই আমরা দেখি পরবর্তীকালে মেহেরুল্লাহ্‌র একাধিক জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও আন্তরিকতা, তথ্য সমাবেশ ও রচনাগুণে মেহের-চরিত-ই শ্রেষ্ঠ।

মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌কে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। শেখ জমিরুদ্দীনের ভাষায়-

> ''মুসলমান সমাজে যদি কেহ আমার হিতৈষী বন্ধু থাকেন, তা হইলে আপনি। কারণ আপনি আমার যত উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, এত আর কেহ করেন নাই। এজন্য আপনাকে

Dhaka University Institutional Repository

আমি অন্তঃকরণের সহিত ভক্তি করিয়া থাকি। আপনার ঋণ জীবনেও পরিশোধ করিতে পারিব না।''[১১৮]

শেখ জমিরুদ্দীনের উর্পযুক্ত বক্তব্য নিছক বিনয় বা সৌজন্য নয়, আক্ষরিক অর্থেই সত্য।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র আকস্মিক মৃত্যুতে শেখ জমিরুদ্দীন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আর্ত উচ্চারণ এ বেদনার গভীরতাকে প্রমাণ করে - ''পাঠক, আর কি লিখিব? লিখিতে হৃদয় বিদির্ণ হয়, লেখনী অগ্রসর হয় না।''[১১৯] শেখ জমিরুদ্দীন তাঁর 'শোকানল' কাব্যগ্রন্থে মেহেরুল্লাহ্‌ স্মরণে যে শোক কবিতাটি সংকলন করেন, তাও হৃদয়পর্শী

''হায় হায় হায়! হৃদে ফেটে যায়।
অকালে সেই মহাজন।
কাঁদায়ে সবায়, চালিলেন হায়
আধারিয়া এ ভূবন।''[১২০]

১৮. মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৬৬৮- ১৯৬৮)

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর উপর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র জীবন দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। আকরাম খাঁ নিজেই বলেছেন যে, তার জীবনে ও সাহিত্যে দেশ প্রেমের যে স্ফুরণ ঘটেছিল, তার মৌল প্রেরণাস্থল মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌। তাঁর নিজের ভাষায় -

''কর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভে স্ব-সমাজের দৈন্য দুর্দ্দশার যে তীব্র অনুভূতি আমার মন ও মস্তিস্ককে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, আপনাদের যশোরেরই একজন ক্ষণজম্মা মুসলমান কর্ম্মবীরের (মুন্শী মেহেরুল্লাহর) সাধনা আর্দশ তাহার মূলে অনেকটা প্রেরণা যুগাইয়াছিল।''

নড়াইলে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক সভায় সভাপতির ভাষণে মাওলানা আকরাম খাঁ পূর্বোক্ত মন্তব্য করেছিলেন।[১২১]

মাওলানা আকরম খাঁ মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ অপেক্ষা সাত বছরের ছোট ছিলেন। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিতব্য একটা কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাবার সময় ষ্ট্রীমারে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। মাওলানা

Dhaka University Institutional Repository

আকরম খাঁ বলেছেন, ''সেই সাক্ষাতের অল্প সময়ের মধ্যেই জনাব মুন্সী সাহেব তাঁহাকে যেভাবে জাতীয় প্রেরণা দিয়েছিলেন, তাহা চিরদিন তাঁহার মনে থাকিবে।''[১২২]

মাওলানা আকরম খাঁ রচিত অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'মোস্তফা চরিত' এবং 'তাফছীরুল কোরআন'। এসব গ্রন্থে পাদ্রীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তাঁর ঘোষিত জিহাদ মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র পাদ্রী বিরোধী আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া মাওলানা রচিত 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থেও মেহেরুল্লাহ্‌র গভীর ইসলাম প্রেম মনের পরিচয় মেলে।

'আঞ্জুমান-ই-উলামায়ে বাঙালা' নামক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ। এ সংগঠনের মুখপাত্র 'আল-ইসলাম' এর সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুর অল্প দিন পর আকরম খাঁ এ পত্রিকায় ১ম সংখ্যা, ১৯১৫ মূল বাইবেল কোথায়? শিরোনামে একটি প্রবন্ধটিতেও লিখেন। এ প্রবন্ধটিও মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সুরের প্রতিধ্বনী লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া তাঁর রচিত 'যীশু কি নিস্পাপ?' ইত্যাদি প্রবন্ধও মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র ধর্মপ্রচার ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯. শাহ আবদুল্লা

শাহ আবদুল্লার পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। ডক্টর ওয়াকিল আহমদের মতে, ''তিনি ছিলেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র ভাবশিষ্য। তিনি পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন। পরে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।''[১২৩] তিনিও মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র মত বক্তৃতা দান ও পুস্তক রচনা বিবিধ উপায়ে প্রচার কার্য চালাতেন। তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় খ্রীষ্টান পাদ্রীদের ইসলাম ধর্মের প্রতি আক্রমণ ও অপবাদ অপনোদন করে ইসলামের মাহত্ম্য প্রচারের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। তাঁর রচিত 'বে-গুনাহ নবী' একখানি জীবনী গ্রন্থ।

২০. কবি মেহাম্মদ গোলাম হোসেন (১২৮০-১৭৩১, ১৮৭৩-১৯৬৪)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী কবিও লেখক হওয়া সত্ত্বেও প্রচারের অভাবে গোলাম হোসেন সাহিত্যের ইতিহাসে তেমন পরিচিত নন। তবে সমকালে তিনি চিন্তাশীল প্রবন্ধকার ও কবি

Dhaka University Institutional Repository

নামে বিশেষ পরিচিত। সম্প্রতি বাংলা একাডেমী পত্রিকায় (কার্তিক -পৌষ ১৩৮৮/১৯৮১) তাঁর যে সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, তিনি মুন্সী মেহেরুল্লাহর একজন গুণগ্রাহী ছিলেন। এ আত্মজীবনীতে তিনি মুন্সীকে সমকালীন মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ লেখক এবং বিখ্যাত বক্তা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১২৪] মেহেরুল্লাহ্ এবং কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন উভয়েই যশোর জেলার লোক ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বিশেষ গর্ব প্রকাশ করেছেন। তিনি এতে মুন্সী মেহেরুল্লাহর রচনা এর কথাও উল্লেখ করেছেন।

গোলাম হোসেনের আত্মজীবনী (১৯৪৬) থেকে জানা যায়, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উচ্চ শিক্ষিত কবি ছিলেন। তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয় বিষয়ই অত্যন্ত উন্নত শ্রেণীর রচনা। তাঁর এ রচনাসমূহের মধ্যে 'বঙ্গ বীরঙ্গনা' (১৯০৬), 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলামান' (১৯১০), পয়গামে মোহাম্মদী (১৯২১) উর্দূ গ্রন্থের অনুবাদ অন্যতম।

মুন্সী মেহেরুল্লাহর মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি 'মেহেরুল্লাহ স্মরণে' একটি কবিতা রচনা করেন। এ কবিতায় মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রতি তার শ্রদ্ধা, মুন্সী মেহেরুল্লাহর শূন্যতায় বাংলার মুসলমানের অপূরনীয় ক্ষতি, মুন্সী মেহেরুল্লাহর ক্ষুরধার বাগ্মীতা, হিন্দু বিধবাদের প্রতি তার সহমর্মীতা এবং মুন্সী মৃত্যুর পূর্ববর্তী কষ্টকর দিনগুলির কথা ফুটে উঠেছে। এতে তিনি মুন্সী মেহেরুল্লাহর 'হায়াত আব' 'কওসরে জাম' এ স্হান লাভের বাসনা পোষন করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইহা তখন অপ্রকাশিত ছিল। আবু তালিব তাঁর গ্রন্থে এ কবিতাটি সংকলন করেছেন।[১২৫]

২১. দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেহেরুল্লাহ্

মুন্সী মেহেরুল্লাহর কর্মধারা এবং জীবনব্রত আরো যেসব মনীষী সাহিত্যসেবীদের অনুপাণিত করে ছিল তন্মধ্যে দ্বিতীয় মুন্সী মেহেরুল্লা এবং তৃতীয় মেহেরুল্লাহ নাম উল্লেখের দাবী রাখে। দ্বিতীয় মেহেরুল্লাহ ছিলেন তৎকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অধিবাসী। ইনিও যশোরের মুন্সী মেহেরুল্লাহর মত নিজেকে ইসলাম প্রচারক বলে দাবী করতেন। আর এ উদ্দেশ্যেই সম্ভবত তিনি সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর একটি পুস্তিকার শেষ প্রচ্ছদে তাঁর লিখিত নয়টি বইয়ের নাম পাওয়া যায়।[১২৬] বলা বাহুল্য যে, সে সবগুলোই ছিল নিতান্তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা, সাহিত্য

রসবর্জিত মামুলী রচনা। তবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর সবগুলো রচনাই আমাদের আলোচ্য মেহেরুল্লাহর রচনার সাথে সাদৃশ্য থাকায় অনেকেই প্রথম মেহেরুল্লাহর রচনা বলে ভুল করেছেন। ইতোপূর্বে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন খুলনার বাসিন্দা। আনিসুজ্জামানের বর্ণনানুযায়ী তাঁর একমাত্র জ্ঞাত রচনা ইসলাম কৌমুদী (১৯১৪)।[১২৭] এ গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তিনিও প্রথম মেহেরুল্লাহ্র মত ইসলামকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করতেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনেক কুসংস্কার - যেগুলো ধর্মবিশ্বাস হিসেবে প্রচলিত হলেও সব ধর্মানুবর্তী নয় সেগুলো সম্পর্কে আঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম মেহেরুল্লাহর মত তাঁরও এসব কুসংস্কার ও ত্রুটি সংশোধনের ব্যাপারে ইচ্ছা ছিল আন্তরিক। কিছু সংকীর্নতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তাঁর সমাধান উপায়গুলো ছিল যযার্থ।

উর্পযুক্ত সুদীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর মুসলিম বাংলা সাহিত্যর ইতিহাসে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্র সাহিত্য কর্মপ্রয়াস বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। যদিও তার রচনার সাহিত্যমুল্য সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। আনিসুজ্জামান বলেছেন, ''রচনার সে প্রসাদগুণে ধর্মতত্ব ও ইতিহাসের আলোচনা সাহিত্য হয়ে উঠে, তা তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পায়নি।''[১২৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র সাহিত্য যশলিপ্সু ছিলেন না। মুখ্যত সাহিত্য প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কিংবা সাহিত্য সাধনার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখনী ধারণ করেননি। সাহিত্যের সৃজনশীল শিল্প প্রেরণা বা রস সৃষ্টির সতেচন প্রয়াসও তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। এর প্রমাণ তাঁর রচিত প্রবন্ধ ও পুস্তকে অত্যন্ত স্পষ্ট। এ কারণে সম্ভবত সাহিত্য সমালোচনার কষ্টি পাথরের বিশ্লেষণে তাঁর সাহিত্য কর্মের তেমন মূল্য আবিস্কার করা যাবে না। কিন্তু তাঁর রচনার মূল্য অন্যত্র পরিমাপযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ বিশেষ উদ্দেশ্য সংলগ্ন হয়েই লেখনী ধারণ করেন। খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের প্লাবনে ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় বাঙালী মুসলমানের ধর্মজীবনে যে ভাঙ্গন এসেছিল তা রোধ করে ইসলামের মহিমা প্রচার এবং মুসলিম জাগরণ তরান্বিত করা ছিল তার সাহিত্যচর্চার প্রধানতম লক্ষ্য। আর এ কারণেই সম্ভবত তিনি সাহিত্যের শৈল্পিক মানদন্ড বিবেচনা অপেক্ষা এর বক্তব্য বিষয়ের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ কারণেই বিষয় গৌরবের ক্ষেত্রে তাঁর সাধনার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করা আবশ্যকীয়। বস্তুতঃ একমাত্র বিষয়গুনেই তাঁর রচনসম্ভার মূল্যবান। বাঙালী মুসলমানের আত্মজাগরণ এবং সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মেহেরুল্লাহ্র সাহিত্য কর্ম প্রয়াস কি পরিমাণ সহায়তা করেছে তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। কেননা এটিই ছিল তাঁর সাহিত্য চর্চার মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য লাভ করে গৌরবের জয়টীকা তিনি যে ললাটে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর এটিই হচ্ছে আনন্দের ব্যাপার।

পুনশ্চঃ উল্লেখ্য যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র সমকালে বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস তেমন দ্যোতিময় ছিল না। এ সময় বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস আমাদের কাছে নিতান্তই অস্পস্ট এমনকি নেই বললেও চলে। এরূপ পরিস্থিতিতে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র আর্বিভাব মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আশীবাদ স্বরূপ। কেননা তাঁর উদ্যোগ, নেতৃত্ব ও সহায়তায় তৎকালীন মুসলিম সাহিত্য আন্দোলন বহুল পরিমাণে প্রেরণা লাভ করে। প্রসঙ্গত শেখ হবিবর রহমানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায় -

> ''একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যের সেই প্রাথমিক যুগে মুন্শী সাহেব মরহুম সমাজকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। --- এতদ্ব্যতীত যাহাতে সমাজে উপযুক্ত সাহিত্যিক ও কবির উদ্ভব হয়, সেজন্য তাহার যত্ন-চেষ্টার অবধি ছিল না। এ পর্যন্ত এমন আর কাহাকেও জানি না। যিনি সমাজের অঙ্কুরোন্মুখ প্রতিভাকে ফুটাইয়া তুলিতে তরুণ লেখক ও কবিগণকে সর্ব্ববিধ সাহায্য করিয়া উৎসাহ দিয়া গড়িযা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।''[১২৯]

মুন্সীর এরূপ চেষ্টার কারণেই আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর সাহিত্য কর্ম-প্রয়াস বিশেষভাবে স্বীকৃতি অর্জন করার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-সূত্র

১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ২৯৯।

২. তৃতীয় অধ্যায়, খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রচারক মন্ডলীর কার্যক্রম ও মুন্শীর বিদ্রোহী সত্তা, দ্রষ্টব্য।

৩. মুহম্মদ আবু তালিব, মুন্শী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহঃ দেশ কাল সমাজ, ঢাকা ১৯৮৩, পৃঃ ১০২।

৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৯।

৫. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ইসলাম প্রচারক পত্রিকা হতে উদ্ধৃত, সম্পাঃ ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ৬।

৬. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার, ৭ম সংস্করণ, ১৩৭৫ বাং, পৃঃ ৮।

৭. মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, যশোর, ১৯৮৩, পৃঃপৃঃ ১১-১২।

৮. নাসির হেলাল (সম্পাঃ) মুন্শী মেহেরউল্লাহ রচনাবলী, ১ম খন্ড, মুন্শী মেহেরউল্লাহ্ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃপৃঃ চৌদ্দ-সতের।

৯. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কর্ম্মবীর মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ কলিকাতা, ১৯৩৬, পৃঃপৃঃ ৬৮-৬৯।

১০. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০, পৃঃ ১৪।

১১. মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।

১২. মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, পৃঃ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খন্ড,পৃঃ

১৪. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃপৃঃ ৫৪০-৫৪১।

১৫. মুহম্মদ আবূ তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২।

১৬. শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃপৃঃ ৬৮-৬৯।

১৭. ঐ, পৃঃ ১২।

১৮. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত-চেতনার ধারা ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ৩১৭।

১৯. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৯।

২০. ঐ, পৃঃপৃঃ ৩০৯-৩১০।

২১. নাসির হেলাল, পূর্বোক্ত, পৃঃপৃঃ ২৬২-২৭২।

২২. কাজী দীন মুহম্মদ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, প্রেক্ষণ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা, সম্পাঃ খন্দকার আবদুল মোমেন, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ২৫।

২৩. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।

২৪. মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা, কলিকাতা, ১৩১৮, পৃঃপৃঃ ১-২।

২৫. আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন, সাহিত্য পত্রিকা সম্পাঃ মুহম্মদ আবদুল হাই, শীত সংখ্যা, ১৩৬৭, পৃঃ ৯২।

২৬. ঐ, পৃঃ ৯২।

২৭. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ পুর্বেক্ত পৃঃ ১৩।

২৮. ঐ, পৃঃ ১৬।

২৯. আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন, পৃঃ ৯৭।

৩০. মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রদ্দে-খৃস্টান ও দলিলুল ইসলাম, মেহেরউল্লাহ একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭, ভূমিকা দ্রঃ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌, রদ্দে-খৃস্টান ও দলিলুল এসলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৬, পৃঃ ৫।

৩২. ঐ, পৃঃ ৫।

৩৩. ঐ, পৃঃ ৫।

৩৪. মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, পুর্বোক্ত পৃঃ ১৬।

৩৫. ইসলাম প্রচারক, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলিকাতা, ভদ্র, ১২৯৮/১৮৯১ খ্রিঃ।

৩৬. ঐ,

৩৭. আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ্‌ ও জমিরুদ্দীন, পৃঃ ৯৩।

৩৮. মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

৩৯. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌, মেহেরুল এছলাম, মেহেরউল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৫।

৪০. ঐ, পৃঃপৃঃ ১৮৫ - ১৮৬।

৪১. ঐ, পৃঃ১৮৬।

৪২. ঐ, পৃঃপৃঃ ২১৭ - ২১৮।

৪৩. ঐ, পৃঃ ২১৮।

৪৪. ঐ, পাদটীকা, পৃঃ ২৪২।

৪৫. ঐ, পাদটীকা ২৩৮।

৪৬. উদ্ধৃতি, আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ্‌ ও জমিরুদ্দীন, পৃঃ ৯৪।

৪৭. মেহেরুল এছলাম, পাদটীকা, পৃঃ ২৩৮।

৪৮. ঐ, পৃঃপৃঃ ২৪৮-২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. ঐ, পৃঃ ২৫৫।

৫০. ঐ, পাদটীকা, পৃঃ ২৫৬।

৫১. ঐ, পৃঃ ২৫৯।

৫২. উদ্ধৃতি, শেখ হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃপৃঃ ৭৫-৭৬।

৫৩. মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, ঢাকা, ১৯৯৭, উপক্রমনিকা, দ্রষ্টব্য।

৫৪. ঐ, পৃঃ ১৬।

৫৫. ঐ, পৃঃ ১৬।

৫৬. ঐ, পৃঃ ১৬।

৫৭. ঐ, পৃঃ ১৬।

৫৮. ঐ, পৃঃ ১৬।

৫৯. ঐ, পৃঃ ১৬।

৬০. ঐ, পৃঃ ১৭।

৬১. ঐ, পৃঃ ৪৩।

৬২. সুরা বাকারা, ৩য় রুকু, আয়াত নং-১।

৬৩. উদ্ধৃতি, শাহাদত আলী আনসারী,পুর্বোক্ত পৃঃ ১৭।

৬৪. আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন, ৯৫।

৬৫. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, পুর্বোক্ত পৃঃ ২২।

৬৬. মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার, মেহেরউল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬৭. ঐ, পৃঃ ৬৬।

৬৮. ঐ, পৃঃ ৬৯।

৬৯. ঐ, পৃঃ ৬৬।

৭০. ঐ, পৃঃ ৭১।

৭১. ঐ, পৃঃ ৬৭।

৭২. ঐ, পৃঃ ৬৬।

৭৩. ঐ, পাদটীকা, পৃঃ ৯৬।

৭৪. ঐ, পৃঃ ১৩৩।

৭৫. ঐ,পৃঃ ১৩৩।

৭৬. উদ্ধৃতি, আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন, পৃঃ ৯৬।

৭৭. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার, মেহেরউল্লাহ রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৭।

৭৮. ঐ, পৃঃপৃঃ ১৩৩-১৩৪।

৭৯. ঐ, পৃঃ ১৬। আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন,পৃঃ ৯৭।

৮০. শাহাদত আলী আনসারী পুর্বোক্ত ঐ, পৃঃ ১৫।

৮১. আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন,পৃঃ ৯৭।

৮২. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার,রচনাবলী, পৃঃ ৬৬।

৮৩. ঐ, পৃঃ ভূমিকা, পৃঃ ১৬।

৮৪. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, পুর্বোক্ত ঐ, পৃঃ ২৩।

৮৫. শেখ হবিবুর রহমান, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯।

৮৬. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, পুর্বোক্ত পৃঃ ১৪।

৮৭. শেখ জমিরুদ্দীন, মেহের-চরিত, কলিকাতা ১৩১৫, পৃঃ ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

৮৮. আবুল হাসান চৌধুরী, মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ৬৮।

৮৯. উদ্ধৃতি, মুহম্মদ আবূ তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩।

৯০. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, জওয়াবোন্নছোরা, যশোর, ১৯৭৬, পৃঃ ৩১।

৯১. মোঃ আবদুর রাজ্জাক, বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থাপঞ্জী, ৩য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ৫৪।

৯২. খ্রীষ্টীয় বান্ধব, জুন, ১৮৯২।

৯৩. ঐ,

৯৪. উদ্ধৃতি, শেখ হবিবর রহমান, পুর্বোক্ত পৃঃ ১৩৯।

৯৫. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, মানব জীবনের কর্তব্য, মেহেরউল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ আটত্রিশ।

৯৬. ঐ, পৃঃ উনচল্লিশ।

৯৭. মুহম্মদ আবু তলিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।

৯৮. উদ্ধৃতি, আবুল হাসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮।

৯৯. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিনের সাহিত্য সাধনা, পেক্ষণ, মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা, পৃঃ ৫১।

১০০. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৩।

১০১. নূরুল ইসলাম, ২য় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৮।

১০২. শেখ হবিবর রহমান, পুর্বোক্ত পৃঃ ৮০।

১০৩. উদ্ধৃতি, কাজী আবদুল মান্নান, মুসলমান কবি রচিত আখ্যান কাব্য, সাহিত্য পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বর্ষা, ১৩৬৭।

১০৪. ঐ,

১০৫. শেখ হবিবর রহমান রচিত কর্ম্মবীর মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ পূর্ব্বাভাস, পৃঃ ৫।

১০৬. শেখ হবিবর রহমান, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

১০৭. মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর সোলতান পত্রিকায় প্রকাশিত শেখ ফজলল করিমের শোক কবিতা থেকে উদ্ধৃত।

১০৮. মুহম্মদ আবু তালিব, পুর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৭

১০৯. উদ্ধৃতি, ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৩।

১১০. উদ্ধৃতি, মুহম্মদ আবু তালিব, পুর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৩।

১১১. শেখ হবিবর রহমান, পুর্বোক্ত পৃঃপৃ ৮২-৮৩।

১১২. ঐ, পৃঃ ৮২।

১১৩. ঐ, পৃঃ ৮২।

১১৪. ঐ, পৃঃ / ০ - / ০।

১১৫. আবুল হাসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃপৃঃ ৫৩-৭৪।

১১৬. ঐ, পৃঃ ৯৪।

১১৭. উদ্ধৃতি, ঐ, পৃঃপৃঃ ৯৪-৯৫।

১১৮. উৎসর্গ পত্র, হযরত ঈসা কে? উদ্ধৃতি আবুল হাসান চৌধুরী, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৯৩।

১১৯. শেখ জমিরুদ্দীন মেহের চরিত, পৃঃ ৮৭।

১২০. উদ্ধৃতি, আবুল হাসান চৌধুরী,পুর্বোক্ত, পৃঃ ৯৪।

১২১. উদ্ধৃতি, শেখ হবিবর রহমান, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৯৪।

১২২. ঐ, পৃঃ ৮৩।

১২৩. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৮।

১২৪. মুহম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৯।

১২৫. ঐ, পৃঃপৃঃ ১৫১-১৫২।

১২৬. আনিসুজ্জামান,মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩১০।

১২৭. ঐ, পৃঃ ৩১১।

১২৮. আনিসুজ্জামান, মেহেরুল্লাহ্‌ ও জমিরুদ্দীন, পৃঃ ১০৪।

১২৯. শেখ হবিবর রহমান, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারার প্রতি সমকালীন প্রতিক্রিয়া

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালী মুসলমান সমাজে যে প্রবল ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ ছিলেন তার অন্যতম নেতৃপুরুষ। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রবল আক্রমণ হতে স্ব-ধর্ম ও স্ব-সম্প্রদায়কে রক্ষা এবং স্ব-ধর্মের মহাত্ম্য প্রচার ছিল তার জীবনব্রত। শুধু তাই নয়, মুন্সীর সমাজ চেনতাবোধও ছিল প্রবল। সমাজ হিত কামনা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর কর্মকান্ডের মধ্যে উপরোক্ত জীবনব্রত ও চেতনাবোধের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্যণীয়। এখানে তাঁর চিন্তাধারা ও জীবনব্রতের প্রতি সমকালীন প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

৬.১ অনুকূল সাড়া ও এর ব্যাপকতা

প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়েই মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র কর্মজীবনের সূত্রপাত। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলায় তৎপর খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচারণা ও কার্যক্রমের বিরোধীতা করে তিনি খ্যাতিমান প্রচারক ও লেখক হিসাবে আর্বিভূত হন। তাঁর পূর্বে বাংলার মুসলিম সমাজের পক্ষ হতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের মোকাবেলা করার চেষ্টা হয়নি বললেই চলে। অবশ্য মিশনারীদের মোকাবেলা করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি তৎকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজে বড় একটা ছিল না। এমতাবস্থায়, মুন্সীর আর্বিভাব এবং মিশনারীদের বিরুদ্ধে তার প্রবল সংগ্রাম তাঁর প্রতি সমকালীন মানুষের আগ্রহ ও কৌতুহলের সৃষ্টি করে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচারণার বিরুদ্ধে এতদিন বাঙালী মুসলমানদের কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেত না। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ তাদের ভয় ঙেঙ্গে দেন। তিনি হাটে-বাজারে, পল্লী-নগরে বক্তৃতা সভায়, পাদ্রীদের সাথে তর্ক-সংগ্রাম, ও পুস্তক রচনার মাধ্যমে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রচারণা ও যুক্তিতর্কের অসারত্ব প্রমাণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি ইসলামের মহিমা ও আল্লাহ রসুলের মহান গৌরব প্রচারেও

Dhaka University Institutional Repository

সাফল্য অর্জন করেন। মুসলিম সমাজে এর ব্যাপক সাড়া পড়ে। সমগ্র মুসলিম সমাজ নতুন উৎসাহে, নতুন উন্মাদনায় মেতে উঠে। মুসলমান সমাজে নবজীবনের স্পন্দন দেখা দেয়। মুন্সীর হাতে বাংলার বহু বিধর্মী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অসংখ্য পথ হারা মুসলমান সত্যপথের সন্ধান লাভ করে। মুন্সীর আহবানে সাড়া দিয়ে অনেকে পাপ কার্য ত্যাগ করে পূণ্যের পথে অগ্রসর হয়। অনেকে তওবা করে নামাজ রোজা আরম্ভ করে। মুসলিম সমাজের ব্যাপক অংশ বিশুদ্ধ ধর্মচর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র অনুকরণে একদল মুসলিম প্রচারকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। শেখ হবিবর রহমানের মতে, ''তাঁহার সমকালে বা পরে যাহারা মুসলমান সমাজে বক্তা ও প্রচারক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহাদের প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার দ্বারা অনুপাণিত হইয়াছিলেন।''[১] এ প্রসঙ্গে মুন্‌শী মোহাম্মদ কাছেম (ঘুরুলিয়া, যশোর), মুন্‌শী গোলাম রব্বানী, (ঘোপ, যশোর), মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন (মেহেরপুর), দ্বিতীয় মেহেরুল্লাহ্‌ (সিরাজগঞ্জ), ঈসমাইল হোসেন সিরাজী, মৌলভী মোহাম্মদ এব্‌রাহিম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'জন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর ঘনিষ্ট সহযোগী হিসাবে মিশনারী বিরোধী কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। অনেক সময় তারা পৃথকভাবে মিশনারীদের সাথে তর্ক-যুদ্ধ এবং ধর্মসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন।[২] এতদ্‌ব্যতীত মুন্সীর সহযোগী বক্তা হিসাবে তালতলা হরিপুরের মৌলভী আবদুল আজিজ, সুফী আবদুল বারী, মুন্‌শী মুহাম্মদ আব্বাছ আলী, হাজী মহমুদ আলী ও হাজী মেহের আলী পুমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

উনিশ-বিশ শতকে বাঙালী মুসলিম ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে শেখ জমিরুদ্দীনের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রতিও সমকালীন মানুষের যথেষ্ট আগ্রহ ও কৌতুহল ছিল। এর বড় কারণ তাঁর খ্রীষ্টান ধর্মগ্রহণ ও পুনরায় ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন। উল্লেখ করা আবশ্যক

Dhaka University Institutional Repository

যে, জমিরুদ্দীন ছিলেন পুরো'পুরি যুক্তিবাদী প্রশস্ত উদার মনের মানুষ। খ্রীষ্টান থাকা অবস্থায় 'আসল কোরাণ কোথায়' শীর্ষক প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ বির্তক হয়। এই বির্তকে তিনি মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র কাছে পরাস্ত হন। এই পরাজয় তিনি শুধু মেনেই নেননি, মেহেরুল্লাহ্‌র যুক্তি প্রমাণের সূত্র ধরে তিনি নতুন বিশ্বাস ও সত্যে উপনীত হন এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩] পরে মুন্সী মহেরুল্লাহ্‌র প্রচেষ্টায় শেখ জমিরুদ্দীন বাঙালী মুসলিম সমাজে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় কালক্রমে জমিরুদ্দীন বাংলার বিখ্যাত প্রচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা দু'জনে একত্রে বহু সভা সমিতিতে বক্তব্য রেখেছেন। মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পরও তিনি প্রচারকার্য অব্যাহত রেখেছিলেন। প্রচারক হিসেবে তাঁর সাফল্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে শেখ হবিবর রহমান বলেছেন - ''সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতায় হেদায়েত পাইয়াছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার কল্যাণে পাদ্রী সাহেবের ত্রিত্ববাদের ধোকাঁবাজী হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দীন ও ঈমান কায়েম রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।''[৪]

শেখ জমিরুদ্দীনের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম সমাজ যে সেবা ও সাহায্য লাভ করে তার কৃতিত্ব মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র অনেকটা প্রাপ্য। কেননা তাঁর সহযোগিতা ও চেষ্টাতে শেখ জমিরুদ্দীন এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আর জমিরুদ্দীনের সক্রিয় সহকারিতা মেহেরুল্লাহ্‌র মিশনকে আরো গতিময় ও ফলপ্রসু করেছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সমাজ চেতনাবোধ ছিল প্রবল। তাঁর আর্বিভাবলগ্নে বাঙালী মুসলমান সমাজ ছিল অধঃপতিত, দুর্দশাগ্রস্হ। শেখ হবিবর রহমানের ভাষায় -''তখন মুসলমান সমাজ অসাড় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্হায় হীনতার ক্লেদপঙ্কে নিমজ্জিত ছিল।''[৫] শেখ ফজলল করিমের ভাষ্য মতে, ''সমাজে তাহাদের একতা নাই, উচ্চ শিক্ষায় অনুরাগ নাই, ব্যবসায় তাহারা অনেকের পশ্চাতে।''[৬]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সমাজের এরূপ দুরাবস্হা ও অবক্ষয় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌কে ব্যথিত করেছিল। তৎকালীন মুসলিম সমাজের আলস্য, প্রাণশক্তিহীনতা, কর্মোদ্যোগের অভাব, উচ্চতর জীবনের আকাঙ্খাহীনতা, জীবিকার প্রয়োজনে নিম্ন পেশাকে গ্রহণ করে কৃতার্থমন্যতাবোধ তাঁর মানসসত্বাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। এজন্য তিনি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ হতে স্ব-ধর্ম ও স্ব-সম্প্রদায়কে রক্ষা এবং স্ব-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা ও তার মর্যাদা সংরক্ষণের প্রচেষ্টার পাশাপাশি স্ব-সমাজের কল্যাণ সাধনে প্রাণ-মন উৎসর্গ করেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র আর্বিভাব পূর্বেও বাংলায় ধর্মীয় বক্তৃতা সভা বা ওয়াজ মাহফিলের প্রচলন ছিল। তবে এসব ওয়াজ মাহফিলে সনাতন মোল্লা-মাওলানাদের বক্তৃতায় সমাজ চেতনার কোন লক্ষণ ছিল না। উর্দু-বাংলা মিশ্রিত নানা উদ্ভট গল্প সম্বলিত ওয়াজ সাময়িকভাবে শ্রোতাদের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করলেও এর তেমন কোন স্হায়ী প্রভাব দেখা যেত না। সমাজ সংসারের উন্নতি বিষয়ক কোন ওয়াজ তখন একেবারেই প্রচলিত ছিল না। তাদের মতে, প্রকৃত মুসলমান হীনতাপূর্ণ দরিদ্র জীবন-যাপন করবে। কেননা এতে সে পরকালে বেহ্‌শতে পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন লাভ করবে। এ শ্রেণীর মোল্লা-মৌলভীদের সম্ভবত বোধগম্য হয়নি যে, দ্বীন ও দুনিয়ার সর্বাঙ্গীন সম্পদ, গৌরব ও মহিমা অর্জন করাই প্রকৃত ইসলামের লক্ষ্য। ইসলামের প্রত্যেক কাজেই এই দ্বীন ও দুনিয়ার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করা হয়ে থাকে।

মুন্সীর মেহেরুল্লাহ্‌ ছিলেন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি বাংলার মুসলিম সাম্প্রদায়কে বিশুদ্ধ ধর্মীয় জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করণের সাথে সাথে সামাজিক প্রগতির পথেও ধাবিত করতে চেষ্টা করেন। 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' ছাড়া মুন্সীর সামাজিক চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ পরিচয়যুক্ত রচনা আর নেই বললেই চলে। তবে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বক্তৃতাসমুহে মুসলিম সমাজের অধোঃগতি, দারিদ্র ইত্যাদির চিত্র মর্মস্পশী ভাষায় অঙ্কিত করে এ থেকে পরিত্রাণের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেন। তিনি দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য মুসলমানদের বিদ্যা শিক্ষার্জনের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মাতৃভাষা বাংলা চর্চার উপর যেমন গুরত্বারোপ করেন তেমনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারেও সর্তক দৃষ্টি দেন। শিক্ষা বিস্তার কল্পে মুন্সীর চেষ্টা ও উপদেশে মুসলিম সমাজে অনুকূল সাড়া পড়ে। তাঁর চেষ্টায় বহু স্থানে মুসলমানরা স্কুল মাদ্রাসা স্থাপনে এগিয়ে আসে।[৭]

অলস, কর্মবিমুখ মুসলিম সমাজকে কর্মোন্মুখকরণে মুন্সী আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগের জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রাণিত করেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষি আবাদে উদ্বুদ্ধকরণেও তাঁর চেষ্টার অবধি ছিল না। শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন- ''মুসলমান মিঠাই খাইতে জানে, কিন্তু তৈয়ার করিতে জানে না; পান খাইয়া অজস্র পয়সা নষ্ট করিতে জানে, কিন্তু পানের বরজ তৈয়ার করা অপমানজনক মনে করে।''[৮] মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ মুসলমানদের মিষ্টির দোকান করতে, পানের বরজ করতে সব জায়গায় উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। তাঁর চেষ্টা বহু স্থানে সফল হয়েছিল। বস্তুত মেহেরুল্লাহ্র প্রচেষ্টায় বাংলার তৎকালীন মুসলিম সমাজে পরিবর্তন এসেছিল। তাঁর বক্তৃতা শুনে মুসলিম সমাজ নিজেদের শোচনীয় অবস্থা অনুধাবন করে কর্ম প্রেরণায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে উঠে, সাহস করে বুকে বল বেধে নতুন কর্মপথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম সমাজে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।[৯] শেখ হবিবর রহমান বলেন, ''মুন্সী সাহেব মরহুমের বক্তৃতায় বহুলোক আলস্য ও জড়তার বন্ধন কাটাইয়া উঠিয়া শিল্প, কৃষি ইত্যাদি নানা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।''[১০]

মুসলিম সমাজ জীবন হতে অনৈতিকতা ও অনাচার দুরীকরণেও মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র ছিলেন কৃত সংকল্প। এ ব্যাপারে তিনি যুগপৎ তাঁর বক্তৃতা ও লেখনীকে কাজে লাগিয়েছেন এবং এতে তাঁর সাফল্যও ছিল সবিশেষ। তাঁর বক্তৃতাশুনে বহু মুসলমান পাপ কাজ ছেড়ে পূণ্যের পথে অগ্রসর হয়েছে - একথা আগেই বলা হয়েছে। তদুপরি অনেকে সুদ ও নেশা গ্রহণ পরিত্যাগ করেছেন। বহু উচ্ছৃঙ্খল ন্যাড়ার ফকির, গাইন-বাউল তওবা করে শুদ্ধাচারী মুসলমান হয়েছেন। তাঁর রচিত বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভান্ডার গ্রন্থ পাঠে এবং সর্বোপরি তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

বক্তৃতা শুনে অনেকে বিধবাদের পূর্ণ বিবাহ দিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিহার করেন এবং ফাঁকা কৌলিন্যের অসার মোহ ত্যাগ করেন।

লেখক হিসেবেও মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ তৎকালীন সময়ে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অনুকুল সাড়া লাভ করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেহেরুল্লাহ্র লেখক জীবনের পশ্চাতে শিল্প-প্রেরণা ছিল না। বিশেষভাবে ধর্মীয় প্রেরণা ও সেই সাথে সামাজিক প্রয়োজনের অনুরোধেই মূলত তাঁকে লেখনী ধারণ করতে হয়। এক্ষেত্রে তাঁর মিশন সার্থক হয়েছিল।

মুন্সীর প্রতিটি রচনাই সে সময় ব্যাপক পাঠক নন্দিত হয়েছিল। তাঁর জীবদ্দশাতে প্রত্যেকটি পুস্তকের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া বিপুল পাঠক প্রিয়তার প্রমাণ বহন করে। তাঁর রচনাসমুহের এ ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণ বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব এবং ভাষার সারল্য। তাঁর লেখা পাঠকের মনে বিধে যেত তীব্র গতিতে। ফলে তারা সোৎসাহে এগিয়ে আসত ইসলামের পথে।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ কেবল সাহিত্যিকই ছিলেন না, একজন সফল সাহিত্য সংগঠকও ছিলেন। তিনি সাহিত্যচর্চাকে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মোকাবিলা ও মুসলিম জাগরণের অন্যতম শর্ত বলে মনে করতেন। আর এজন্য নিজে যেমন সাহিত্য রচনা করেন তেমনি সাহিত্যিক সৃষ্টিরও চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি সফল। তাঁর আহবান ও অনুপ্রেরণায় সাড়া দিয়ে মুসলিম সমাজের একদল লোক সাহিত্যচর্চায় আত্ম নিয়োগ করলেন। এসব সাহিত্যিক এবং তাঁদের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর সযত্ন সহযোগীতায় গড়ে ওঠা সাহিত্যিকদের ধর্মতত্ব ও ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কিত রচনাদি ইসলামের শত্রুদের অপপ্রচার রোধে যেরূপ কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল তেমনি মুসলিম সমাজের জাগরণ প্রক্রিয়া তরান্বিত করেছিল। আর এটিই ছিল মেহেরুল্লাহ্র স্বপ্ন সাধনা।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র আর্দশ ইসলামী জীবন গড়ার চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী আরো অনেকে। এঁদের মধ্যে অন্যতম কবি মুনশী মোহাম্মদ খাঁ রায়হানউদ্দিন বিশ্বাস। তিনি যশোরের বাঘাপাড়া উপজেলার মহিরন গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হেদায়েত নামা নামক একটি পুঁথি কাব্য রচনা করেন। ১৯৩০ সালে রচিত এ কাব্যে কবি অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শরীয়তের অনুশাসন বিচ্যুত সমাজকে খাঁটি ইসলামের পথে ফিরে আসার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। কবি এক জায়গায় লিখেছেন,

> ''হিন্দুদের মোতাবেক যে কেহ চলিবে।
> হইয়া হিন্দুর সাথী দোজখে যাইবে।।
> অতএব মানা করি মুসলমান সবে।
> ছাড়হ হিন্দুর চাল আরামে রহিবে।''[১১]

কবির এ রচনার মধ্যে আমরা মেহেরুল্লাহ্‌র আর্দশের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারা ও কর্মপ্রয়াসের প্রতি সমকালীন মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া ছিল অনুকুল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাঁর কার্যক্রমের বিরোধিতা বা প্রতিরোধের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎকালীন সাধারণ আলেম উলেমাদের কর্মকান্ডে তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইসলামের শত্রুদের বিশেষ করে খ্রীষ্টান মিশনারীদের তৎপরতার বিরুদ্ধে এসব আলেম, মোল্লা, মৌলভীদের নিষ্ক্রিয়তা এবং মুসলিম সমাজের উন্নয়ন বিষয়ে তাদের নিস্পৃহতা মুন্সীকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। এজন্য ক্ষেত্রবিশেষ তিনি এসব আলেম উলেমাদের সমালোচনাও করেছেন। তবে তাদের পক্ষ থেকে মুন্সীর বিরোধিতা করা হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে বর্তমান অনুসন্ধানে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শেখ হবিবর রহমানের বিবরণ মতে, বর্তমান কালের মত সেসময় মুসলিম সমাজে নানা দল মতের পারস্পারিক বিরোধিতা ছিল। কিন্তু মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ ছিলেন সকল দলাদলির উর্ধ্বে। সকল দলের, সকল শ্রেণীর লোকই তাঁকে ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন।[১২] সমসাময়িক

Dhaka University Institutional Repository

পন্ডিতগণ তাঁকে তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সমকালে মানুষ তাঁকে বিভিন্ন উপাধিতেও ভূষিত করেছিল। যেমন- 'জাতির ত্রাণকর্তা', 'মুসলিম বাংলার রামমোহন', 'বাংলার মার্টিন লুথার, 'কর্মবীর', 'দ্বীনের মশাল' ইত্যাদি।[১৩]

মির্জা ইউসুফ আলী মুন্সী মেহেরুল্লাহকে সর্বপ্রথম 'বঙ্গবন্ধু' বলে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য যে, মির্জা ইউসুফ আলী ছিলেন রাজশাহীর 'নুরুল ইমান' সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। এর সাথে মুন্শী মেহেরুল্লাহ্‌র গভীর সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। মির্জা ইউসুফ আলী মেহেরুল্লাহ্‌র অগ্রজ হলেও সাহিত্য ও সেবা কাজে মেহেরুল্লাহ্‌রই অনুসারী ছিলেন।[১৪] মির্জা ইউসুফ আলী রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'দুগ্ধ সরোবর'। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি মুন্সী মেহেরুল্লাহকে 'বঙ্গবন্ধু' বলে অভিহিত করেছেন।[১৫] মানুষের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে তাঁর সারা জীবনের সাধনা ও আমৃত্যু সংগ্রামের কথা বিবেচনা করে মতিউর রহমান মল্লিক মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র প্রতি আরোপিত 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিটি যর্থার্থ ও মানানসই হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[১৬]

৬.২ প্রতিরোধ প্রয়াস

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের প্রতি মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া ছিল অনুকুল। খ্রীষ্টান ও হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকেও প্রতিরোধ প্রয়াসের বেশী প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তবে তাঁর মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক সংকীর্নতা ছিল না। তিনি খ্রীষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের জাল ছিন্ন করে ইসলাম ধর্মকে সত্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এজন্য অন্য ধর্মের অসারতা বা ত্রুটি সম্পর্কে যতটুকু প্রসঙ্গক্রমে দরকার হয়েছে; তিনি তাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলীতে ততটুকুই বলেছেন। উপযাচক হয়ে ধর্ম কলহে লিপ্ত হওয়া তাঁর স্বভাব ছিলন না। মেহেরুল্লাহ্ প্রমাণ করেছেন যে, খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রচারিত তথা কথিত ধর্মমত আসলে খ্রীষ্টান ধর্মেরও অনুমোদিত নয়। তাই পাদ্রীদের বিরুদ্ধে যে সব তর্কযুদ্ধ বা অভিযান পরিচালনা এবং পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন তা আসলে খ্রীষ্টান ধর্ম বা খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে নয় বরং খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রচারিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে।[১৭] এতদ্‌সত্ত্বেও তার কার্যক্রম খ্রীষ্টান

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকে যে বিক্ষুব্ধ করেছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তাঁর কলমের ছোঁয়া পাদ্রীদের বুকে ক্রোধের আগুন প্রজ্বলিত করেছিল তা নিশ্চিত। তবে বাগ্মীপ্রবর মেহেরুল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস তাদের খুব হয়নি। যারা সাহস করে তাঁর সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছিলেন তাদের পরিণতি মোটেই সুখপ্রদ হয়নি। মুন্সীর সাথে মসিহ যুদ্ধেও খ্রীষ্টানরা সুবিধা করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে পাদ্রী জন জমিরুদ্দীনের সাথে মুন্সীর কলম যুদ্ধের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বস্তুত খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে মুন্সীর বক্তৃতা বা রচনাসমূহ নিছক ধর্মবিদ্বেষ প্রসূত বা আবেগ নির্ভর ছিল না, এগুলো ছিল অত্যন্ত প্রামাণ্য বা যুক্তি নির্ভর এবং ক্ষেত্র বিশেষে শাস্ত্রোদ্ধৃত। তাই খ্রীষ্টানরা এর প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে পারে নাই।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারা ও কর্মের প্রতি বাংলার হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র ধরণের। উল্লেখ্য যে, হিন্দু ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি মেহেরুল্লাহ্‌র কোন বিদ্বেষ ছিল না। ভারতবর্ষে প্রধান দুই ধর্ম ও জাতির (হিন্দু-মুসলমান) মধ্যকার পারস্পারিক বিরোধকে তিনি অপছন্দ করতেন। এজন্য তিনি প্রকৃত সত্যানুরাগী হিসেবে পরস্পর বিবাদ নিস্পন্ন করতে প্রয়াসী ছিলেন।[১৮]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ ছিলেন প্রকৃত অর্থেই উদার। কেবল স্ব-ধর্ম্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে নয়, অন্য ধর্মালম্বীর জীবনযাত্রাও সংস্কারমুক্ত হোক এবং মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক এ আন্তরিক অভিপ্রায় তাঁর মধ্যে ছিল। এজন্যই তিনি খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সর্বগ্রাসী প্রচারনা ও আগ্রাসন থেকে কেবল মুসলমানদেরই নয়, হিন্দু সম্প্রদায়কেও রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। এখানেই মুন্সীর শ্রেষ্ঠত্ব। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তৎকালীন সময়ে প্রায় সকল মনীষীরই সমাজহিতকামনা, স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহৎ ব্যক্তিত্বও এর উর্ধ্বে উঠতে পারেননি।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সীর বক্তৃতা-বিবৃতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, এসব বিশেষ কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর বক্তৃতা পরিচালিত হত ধর্মজ্ঞান, সমাজ গঠন ও নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নসহ জীবনের সামগ্রিক দিক বিবেচনায় রেখে। এজন্য দেখা যায় যে, তাঁর অধিকাংশ সভাতেই বহু শিক্ষিত হিন্দু লোকের সমাগম হত। তাঁরা মুক্তকণ্ঠে তাঁর বক্তৃতার প্রশংসাও করতেন। উদাহরণস্বরূপ ১৩০৫ সালের ২৮শে মাঘ তারিখে রংপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সভায় গো-হত্যা সম্পর্কে মুন্সীর সারগর্ভ বক্তব্য শুনে উপস্থিত হিন্দুগণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। সভাশেষে স্থানীয় পন্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদেবেশ্বর তর্করত্ন মুন্সীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর উচ্চকিত প্রশংসা করেছিলেন।[২০]

মুন্সী তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায়ে কারামতিয়ায় বহু হিন্দু ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। বহু হিন্দু ছাত্র মুন্সীর কাছ থেকে ব্যক্তিগত সাহায্য পেয়েছিলেল।[২১] বলা বাহুল্য যে, মুন্সীর কাছ থেকে সরাসরি উপকারপ্রাপ্ত হিন্দুগণ তাঁর প্রতি অনুকুল শ্রদ্ধা মনোভাবাপন্ন ছিলেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহর দুইটি বিখ্যাত গ্রন্থ তৎকালে হিন্দু সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। গ্রন্থ দুটি হল 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' এবং 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভান্ডার'। প্রথোমোক্ত গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন মূলতঃ হিন্দু লেখকগণের মুসলিম বিদ্বেষী রচনার পাল্টা জবাব হিসাবে। তাঁর 'বিধবা গঞ্জনা' বইটি রচনার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু বিধবাদের দুঃখ-দুর্দশা ও দুরবস্হার ছবি সমাজপতিদের সামনে তুলে ধরে তাদের পুনঃবিবাহের ব্যবস্হা করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ দুইটি গ্রন্থ হিন্দুদের একটি অংশকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। মুন্সী অনেক রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

> ''---- পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের কোন কোন হিন্দু বন্ধুর গাত্র ও অর্ন্তদাহ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ ক্রোধে একেবারে অগ্নীশর্মা করাল মূর্তি ধারণ করতঃ লেখকের প্রতি খড়গহস্ত হইয়াছেন। এমন কি দুই এক মহাত্মা প্রকাশ্য সংবাদপত্রেও লেখকের প্রতি গাল পড়িয়া ঝাল ঝাড়িয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন।''[২২]

Dhaka University Institutional Repository

'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' গ্রন্থের সমালোচনা সূত্রে ফুলকোচার বাবু সুরেশ্বর মুখ্যোপাধ্যায় সুধাকার পত্রিকায় (১লা আষাঢ়, ১৩০৭) হিন্দু মুসলমান শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। লেখক এতে হিন্দু ধর্ম রহস্য গ্রন্থের লেখক ও মুসলিম সমাজকে ভীষনভাবে আক্রমণ করেন। এ নিয়ে কয়েক সপ্তাহ প র্যন্ত তীব্র বাদানুবাদ চলেছিল।[২৩]

মুন্সীর পূর্বোক্ত দুইটি পুস্তককে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজে কিছু বাদ-প্রতিবাদ হলেও সামগ্রিকভাবে প্রতিরোধ প্রয়াস দেখা যায় না। তাঁর পুস্তকে প্রদত্ত বিবরণীসমূহ শাস্ত্রোদ্ধৃত ছিল বলে প্রতিবোধ দূরে থাক, কেউ এর জোরালো প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারে নি। উপরন্ত পৌরনিক দেব-দেবী ও তাদের লীলা খেলার প্রতি বীতশ্রদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন হিন্দুগণ বরাবর মুন্সীকে শ্রদ্ধা করতেন। এমনকি তাঁরা মুন্সীকে হিন্দু সমাজের অদ্বিতীয় সংস্কারক মহাপন্ডিত শঙ্কারাচার্য্যের সাথে তুলনা করতেও কুন্ঠিত হতেন না।[২৪]

মুন্সীর মৃত্যুর পর তাঁর উপরোক্ত দুইটি পুস্তক সম্পর্কে হিন্দু ধর্মীয় নেতারা প্রশ্ন তুলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনসুর আহমদ ১৯০৮ সালে পুস্তক দুইটি পুনঃপ্রকাশ করলে হিন্দু ধর্মীয় নেতারা লেখক কর্তৃক পরধর্মের প্রতি আক্রমণ ও অশ্লীলতার অভিযোগ এনে বই দুইটি বাজেয়াপ্ত এবং প্রকাশকের শাস্তি দাবী করে কোর্টে মামলা করেন। ২৪শে মে ১৯০৯ সালে যশোরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্যাট শ্রীমন্ত কুমার দাস গুপ্ত এক রায়ে প্রকাশককে ২০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ভারতীয় দন্ডাবিধির ২৯৩ ধারানুসারে তিনমাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫২১ ধারানুসারে আসামীর দখলে রক্ষিত 'বিধবা গঞ্জনা' এবং 'হিন্দু ধর্ম রহস্য' পুস্তকের কপিগুলো ধ্বংস করার আদেশ দেন।[২৫]

উপরোক্ত রায়ের বিরুদ্ধে জজ কোর্টে আপিল করা হলে সেশন জজ মিঃ এল. পালিত আপীল প্রত্যাখ্যান করেন এবং ১৯০৯ সালের ২৮শে জুলাই প্রদত্ত এক রায়ে মুন্সীর 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' কে ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রসুত রচনা এবং 'বিধবা গঞ্জনা' কে বিধবা বিয়ের সাথে সংযোগহীন সাংঘাতিক আশ্লীলতায় পরিপূর্ণ রচনা বলে অভিহিত করেন। এমন কি,

Dhaka University Institutional Repository

বিচারক রায়ে বিধবা গঞ্জনা কে মুন্সীর রচনা নয় বলেও উল্লেখ করেন। বিজ্ঞ বিচারকের এ রায়ে বিধবা গঞ্জনা কে মুন্সীর রচনা বলে স্বীকার না করার কারণ বোধগম্য নয়। লেখকের জীবদ্দশাতেই যেখানে এ গ্রন্থের ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত, তারপরেও এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশের কি কারণ থাকতে পারে ? তাছাড়া বিচারচক তাঁর রায়ে বইটিকে সাংঘাতিক অশ্লীল বলে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে কিছুটা সত্যতা আছে। এ গ্রন্থে বিধবা জীবনের ছবি অংকন করতে মুন্সী কিছুটা হাল্কা, চটুল বিদ্রুপাত্মক ভাষার ব্যবহার করেছেন এবং ভূমিকায় তিনি অকপটে তা স্বীকার করেছেন। তবে, ''এ গ্রন্থের বক্তব্যের সাথে বিধবা-বিবাহের কোন সংযোজন নেই'' বিচারকের এ মন্তব্য একেবারেই সঠিক নয়। বিধবা-বিবাহের সাথে লেখকের চিন্তাধারার সংযোগ না থাকলে গ্রন্থে বিধবা-জীবনের ছবি অঙ্কনের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? বস্তুতঃ বিধবাদের প্রতি মুন্সীর গভীর সহানুভূতি এবং তাদের নিয়ে সমাজে প্রচলিত নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথা উচ্ছেদে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ অভিযোগকারী এবং বিচারকদের কাছে আদৌ কোন গুরুত্ব পায়নি। তাই তাঁরা এ রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি না করেই এরূপ সিদ্ধান্ত দেন।

মুন্সীর চিন্তাধারার সমর্থক এবং তাঁর অনুসারীদের কাছে হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের অভিযোগ এবং বিচারকের এ হেন পক্ষপাতদুষ্ট রায় প্রদান সমস্ত ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক এবং গোলমেলে মনে হয়েছিল। তাই তাঁরা এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। মুন্সীর জীবনী লেখকদের বক্তব্যেও এরূপ আশংকা প্রকাশিত হয়েছে।[২৬]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারার প্রতি সমকালীন মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া ছিল অনুকূল এবং আশাব্যঞ্জক। খ্রীষ্টান এবং হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে মুন্শীর ক্রিয়া-কান্ডের বাদ-প্রতিবাদ হলেও প্রতিরোধ প্রয়াস নগণ্য, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এক রকম ছিল না বললেই চলে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-সূত্র

১. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌, কলিকাতা, ১৯৩৪, পৃঃ ৪৪।

২. ঐ, পৃঃপৃঃ ২১ -২২।

৩. আবুল হাসান চৌধুরী, মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন,জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৯, পৃঃপৃঃ ৭৭-৯১।

৪. শেখ হবিবর রহমান,পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২।

৫. ঐ, পৃঃ ৮৭।

৬. ঐ, পৃঃ ৩।

৭. ঐ, পৃঃ ৮৮।

৮. ঐ, পৃঃ ৮৭।

৯. ঐ, পৃঃ ৮৬।

১০. ঐ, পৃঃ ৪৫।

১১. নাসরীন মুস্তাফা, জাতির ধ্রুব নক্ষত্র, প্রেক্ষণ, মেহেরুল্লাহ্‌ আবদু (সাঃ) স্মরণ সংখ্যা, খন্দকার মোমেন (সম্পাঃ),ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ১৯৮।

১২. শেখ হবিবর রহমান,পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮।

১৩. নাসির হেলাল, মুন্‌শী মেহেরউল্লা এবং বৈরী স্রোত, দৈনিক সংগ্রাম, ৯ জানুয়ারী, ১৯৯৮।

১৪. মতিউর রহমান মল্লিক, বঙ্গবন্ধু মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌, প্রেক্ষণ, পৃঃ ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ঐ, পৃঃ ১০০।

১৬. ঐ, পৃঃ ১০০।

১৭. অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মতিন, ইসলাম প্রচারক ও শিক্ষানুরাগী সেই মানুষটি, প্রেক্ষণ,পৃঃ ১১৪।

১৮. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌, হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, পূনঃ মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৭।

১৯. আবুল হাসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯।

২০. শেখ হবিবর রহমান, পুর্বোক্ত পৃঃ ৫৫।

২১. ঐ, পৃঃ ৫৫।

২২. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ পুর্বোক্ত পৃঃ ১১।

২৩. ঐ, পৃঃ ১১।

২৪. শেখ হবিবর রহমান, পুর্বোক্ত পৃঃ ৯৫।

২৫. রায় সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌, যশোর, ১৯৮৩।

২৬. শেখ হবিবর রহমান, পুর্বোক্ত পৃঃপৃঃ ৭৭-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

মুন্সী মোহম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র ছিলেন তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ইসলাম প্রচারক ও অগ্রণী ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজের এক চরম সংকটকালে মুন্সীর আর্বিভাব। তাঁর জন্ম নিতান্তই এক সাধারণ পরিবারে। দারিদ্র্য ও সুযোগের অভাবে উচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জনে ব্যর্থ হলেও স্ব-উদ্যোগে তিনি ধর্মতত্ব ও বিভিন্ন ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন দর্জির কাজ। কিন্তু এখানে থেকেই ধর্ম প্রচার, ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও মুসলিম সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কর্ম সাধনার স্বাক্ষর রেখেছেন, মুসলিম বাংলার ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

সত্যিকার অর্থে মুন্সী মোহম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র ছিলেন একজন অনুতোভয় সংগ্রামী যোদ্ধা, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ন এক দুঃসাহসী সিপাহসালার। তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক, আর্দশ মুসলমান। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। শরীয়তের অবশ্য প্রতিপালনীয় বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান। তবে ইসলামের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য প্রদর্শনের মধ্যেই তিনি নিজ কর্তব্য সীমিত রাখেন নি। উনিশ শতকের শেষার্ধে বৃটিশ উপনিবেশিক আগ্রাসন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রবল আক্রমণে বাংলার মুসলমানদের ঈমান-আকিদা যখন হুমকীর সম্মুখীন, তখন নিজ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট নানা কুসংস্কার বিশেষ করে প্রতিবেশী হিন্দু ধর্ম ও সমাজ রীতির প্রভাব থেকে একে মুক্ত করাকে তিনি স্বীয় কর্তব্য বলে স্হির করেন। এসব কর্তব্য সম্পাদনে আবার তাঁকে প্রবল প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হয়।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ ছিলেন কর্তব্য পালনে দৃঢ় সংকল্প। তাই প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মুসলিম সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে তিনি ত্রিবিধ কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ক) সাংগঠনিক উদ্যোগ খ) বক্তৃতা এবং বাহাস বা তর্ক-যুদ্ধ এবং গ) সাহিত্য রচনা।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন একজন সফল সংগঠক। ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কার কাজে অবতীর্ণ হয়ে তিনি সভা-সমিতি গঠন ও পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝতে পারেন সমাজের অভ্যন্তরে বৈরী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, প্রতিকার বিধান করা এবং সংস্কার সাধন এককভাবে সম্ভব নয়। কেননা ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ এক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। সমষ্টির শক্তি ও সামর্থ সীমাহীন। কাজেই ধর্মপ্রচার ও সমাজ সংস্কার কাজে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন যুক্তশক্তির সহযোগিতা। এ সহযোগিতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তিনি নিজ উদ্যোগে বেশ কিছু ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এতদুদ্দোশ্যে অন্যদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করেন। এসব সংগঠন বাংলার মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের শুদ্ধি অর্জনে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে মুসলিম পুর্ণজাগরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন একজন নিত্য জাগ্রত, সচেতন কর্মবীর। ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং নিজ সমাজ ও জাতিকে রক্ষার জন্য তিনি বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বত্র মাঠে-ময়দানে মুখোমুখী সংগ্রাম করেছেন। ব্যাপক অর্থে তাঁর সংগ্রাম ছিল মাঠে ময়দানের প্রত্যক্ষ লড়াই। এ সংগ্রামে বাগ্মিতা, প্রজ্ঞা, শানিত বুদ্ধি, অকাট্য যুক্তি এবং প্রত্যুৎপন্নতিত্বই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। যার মোকাবেলায় সেদিন বিপক্ষ শক্তি কোনঠাসা হয়ে পড়ে এবং তাঁর কাছে পরাজয় মেনে নেয়।

পূনশ্চ স্মরণ করা যেতে পারে যে, সম কালীন বাংলায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন অনন্যসাধারণ বক্তা। তাই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে তিনি তাঁর এ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন। সে সময় তিনি বাংলা-আসামের অসংখ্য ওয়ায-মাহফিল বা ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন। তবে তাঁর বক্তৃতার ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ছিল। সমকালীন মোল্লা-মৌলভীদের মত তিনি কেবল ধর্মতত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করতেন না। তাঁর বক্তৃতা ছিল ধর্মতত্ব, সমাজোন্নয়ন ও সমাজ সংগঠনমূলক বক্তৃতা। বস্তুত তিনি বক্তৃতা করতেন ধর্মজ্ঞান, সমাজগঠন, নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের শাশ্বত কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে। প্রসঙ্গত উলে.খ্য যে, মুসলমান সমাজকে লক্ষ্য করে বক্তৃতা করলেও মুন্সীর বক্তৃতাকে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। ইসলাম সার্বজনীন

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম। আল্লাহ্ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সৃষ্ট জীবের স্রষ্টা রক্ষক ও প্রতিপালক। সেজন্যই ইসলামের অনুসারী একজন মুসলমানের কর্তব্য নিজেরও, নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনার পাশাপাশি বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করা। একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলমান হিসাবে মুন্সীর মধ্যে আমরা এ আর্দশের প্রতিফলন দেখতে পাই। এজন্যই তাঁর বক্তৃতা সভায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করতেন।

সমকালীন তথ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র বক্তৃতা শুনে বহু খ্রীষ্টান ও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, অসংখ্য মুসলমান আত্মসংশোধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, বেনামাজী নামাজ পড়া শুরু করেছেন, বেপর্দা নারী পর্দানশীল হয়েছেন, অনেক বিকৃতমনা মুসলমান ও ভন্ড-ফকির তওবা করে বিশুদ্ধ ইসলামী জীবন-যাপনে অঙ্গীকার করেছেন। মুন্সীর বক্তৃতার প্রভাবে অলস ও কর্মবিমুখ মুসলমান সমাজ অলসতা ত্যাগ করে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনায় মনোনিবেশ করেছেন, সবল ও কপট ভিক্ষুক ভিক্ষা বৃত্তি ত্যাগ করে শ্রমজীবী এবং ক্ষেত্র বিশেষ ব্যবসায়ী হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন, শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজ নিজেদের কল্যাণেই বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করেছেন। এক কথায় নির্জীব মুসলমান সম্প্রদায় জীবন্ত ও কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আর এখানেই মুন্সীর সাফলতা।

বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ধর্মতত্ব বিষয়ক সাহিত্য রচনায় মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন পুরোধা পথিকৃত। অবশ্য তাঁর রচিত সাহিত্যের গুণগত মান সম্পর্কে পন্ডিতমহলে প্রশ্ন রয়েছে। কেননা রীতি-প্রকরণের দিক থেকে যে সমস্ত রচনাকে আমরা সাহিত্য বলি সে ধরনের সাহিত্য মেহেরুল্লাহ্ রচনা করেননি। তাঁর সাহিত্যে শিল্প প্রেরণা পরিলক্ষিত হয় না। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মূখ্যত সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে, কিংবা সাহিত্য সাধনার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মেহেরুল্লাহ্ লেখনি ধারণ করেননি। যে কর্মোদ্যোগ ও কর্মপ্রেরণায় তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন তাঁর ঐকান্তিক প্রয়োজনে তিনি সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। অন্যকথায়, তাঁর সাহিত্য সাধনার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর সুগভীর আল্লাহপ্রেম, আন্তরিক স্ব-ধর্মপ্রীতি, প্রবল নীতিবোধ ও অবিচল সমাজহিতৈষনা। এর প্রমাণ তাঁর রচিত প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন পুস্তকে অত্যন্ত স্পষ্ট। এজন্যই সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনার কষ্টি পাথরে হয়ত তাঁর সাহিত্য কর্মের তেমন মূল্য আবিস্কার করা যাবে না এবং সেটি করা সংগতও হবে না। তবে তাঁর সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব অনত্র্য পরিমাপ করতে হবে।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র রচনায় তাঁর মননচেতনা, ব্যক্তিত্ব, দর্শন ও চিন্তাধারার পরিচয় মেলে। এক অর্থে তাঁর রচনাবলী তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতিভাষ। বলা বাহুল্য যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌ ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজোন্নয়নের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর রচনাবলী তাঁর সেই উৎসর্গকৃত জীবনেরই কর্মভাষ্য এর মাধ্যমে তিনি ইসলামের বিপক্ষ মহিমা কীর্তন করেছেন, ইসলামের নীতি-নির্দেশ সমুহের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে খ্রীষ্টান মিশনারীসহ বিপক্ষশক্তির সাথে ইসলামের মত ও পথের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বির্তকে অংশ নিয়েছেন। তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীরও বহিঃপ্রকাশ রয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। উদাহরণস্বরূপ বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভান্ডার গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতে ইংরেজ শাসনকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখেছেন তাঁর পরিচয় রয়েছে আলোচ্য পুস্তকে। রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি উচ্ছাসম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং লর্ড বেন্টিকের সামাজিক সংস্কার কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতি তাঁর আস্থার বহিঃপ্রকাশ।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ ভারতীয় মুসলমানদের ইংরেজ বিরোধী মনোভাবকে সুনজরে দেখেননি। এজন্য তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। তিনি মুসলমানদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন পশ্চাদপদ মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর না হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিড়ম্বনার সামিল হবে। এব্যাপারে হিন্দুদের অনুসরণ করাকে মুসলমানদের জন্য আত্মঘাতী হবে বলে তিনি মনে করতেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, মুন্সীর রচিত সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্যবান যেমনই হোক না কেন, বাঙালী মুসলমানের ধর্মীয় জীবনের ভাঙনরোধ ও আত্মজাগরণে এর ঐতিহাসিক ভুমিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যক্রম, তাঁর ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার ভাবনা সমকালীন মুসলিম সমাজকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। উল্লেখ্য যে, মুন্সীর প্রচেষ্টায় বাংলায় ধর্মীয় সম্মেলন বা ওয়ায-মাহ্ফিলের ব্যাপক প্রচলন হয়। তিনি একে বাংলার মুসলিম সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ সমাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে অধিষ্ঠিত করেন। এটি ছিল তৎকালীন বাংলার মুসমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র বিরাট ও বলিষ্ট অবদান। বস্তুতঃ এসব ওয়ায-মাহ্ফিল ইসলামী জীবন-যাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষামূলক ভাষণদানের উদ্দেশ্যে সংগঠিত ও আয়োজিত হত। এসব মাহফিল ছিল অসাধারণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণকে ধর্মীয়বোধে উদ্বৃদ্ধকরণ ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সজাগ ও সক্রিয় করে তোলার ব্যাপারে বিশেষ কার্যকর। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইসলাম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক এমন কি রাজনীতিবিদদের কাছে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই চমৎকার গণসংযোগ মাধ্যমটির সদ্ব্যবহার করে তাঁরা জনগণের ধর্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে, তাঁদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি করেন, ফলে তারা নিষ্ক্রিয়তার নিদ্রা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ তাঁর সময়কালে একটি মুসলিম তরুণ সাহিত্য ও সমাজসেবীদল সৃষ্টি ও পরিবৃদ্ধি করেছিলেন। বস্তুতঃ মেহেরুল্লাহ্র অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠা সাহিত্যকদল ও তাঁদের উত্তরসূরীদের হাতে বাংলার মুসলিম জাতি ও তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনধারা লালিত ও সমৃদ্ধ হয়। মুসলিম জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির নেশায় বিভোর এ সাহিত্য সেবীদের মধ্যে সচেতন জাতীয়তাবোধ ছিল প্রখর। তাই বাঙালী জাতির ঘোর দুর্দিনে এরা সে জাতিকে ঘরমুখো করতে ও নিজেদের চিনতে সহায়তা করেন। ফলে তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয় এবং তাঁরা নবগৌরবের সূচনা করেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ নিজে সাংবাদিক ছিলেন না, তবে মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তিনি মুসলিম সমাজ জাগরণের দিকে লক্ষ্য রেখে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের গুরুত্ব অনুভব করেন। তিনি অনেক বক্তৃতায় মুসলিম সমাজকে সংবাদপত্র প্রকাশ ও সাংবাদিকতায় সম্পৃক্ত হতে উদ্বৃদ্ধ করেছেন। মুসলিম সংবাদপত্রের গ্রাহক সংগ্রহের ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন। এ সব সংবাদ পত্র বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন পূর্ণগঠন এবং সমাজোন্নয়নে বলিষ্ট অবদান রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষে একথা বলা যায় যে, সমকালীন বাংলার ইতিহাসে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ, মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত, যুগ সচেতন সমাজ সংস্কারক, সাহিত্য সেবক। উন্নত ও সুদৃঢ় চরিত্রের অধিকারীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ব্যক্তি জীবনে ছিলেন সহজ, সরল, বিনয়ী ও পরোপকারী। তবে মিথ্যার বিরুদ্ধে, ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজের শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অসীম সাহসী, আপোষহীন এক সংগ্রামী মুজাহিদ। বাঙালী মুসলিম সমাজের চরম দুর্দিনে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাধনার বলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রবল আক্রমণের কবল হতে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজকে রক্ষা, বাঙালী মুসলমানদের ধর্ম ও জীবন বোধ এবং গৌরব ও ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিতকরণে তিনি যে কর্ম প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন, যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন বাংলার ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের হাদী বা পথ-প্রদর্শক। ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা বাঙালী মুসলমানদের পথ-নিদের্শণা ও অনন্ত প্রেরণার উৎস হিসাবে যুগযুগ ধরে উদ্দীপ্ত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

----- □ -----

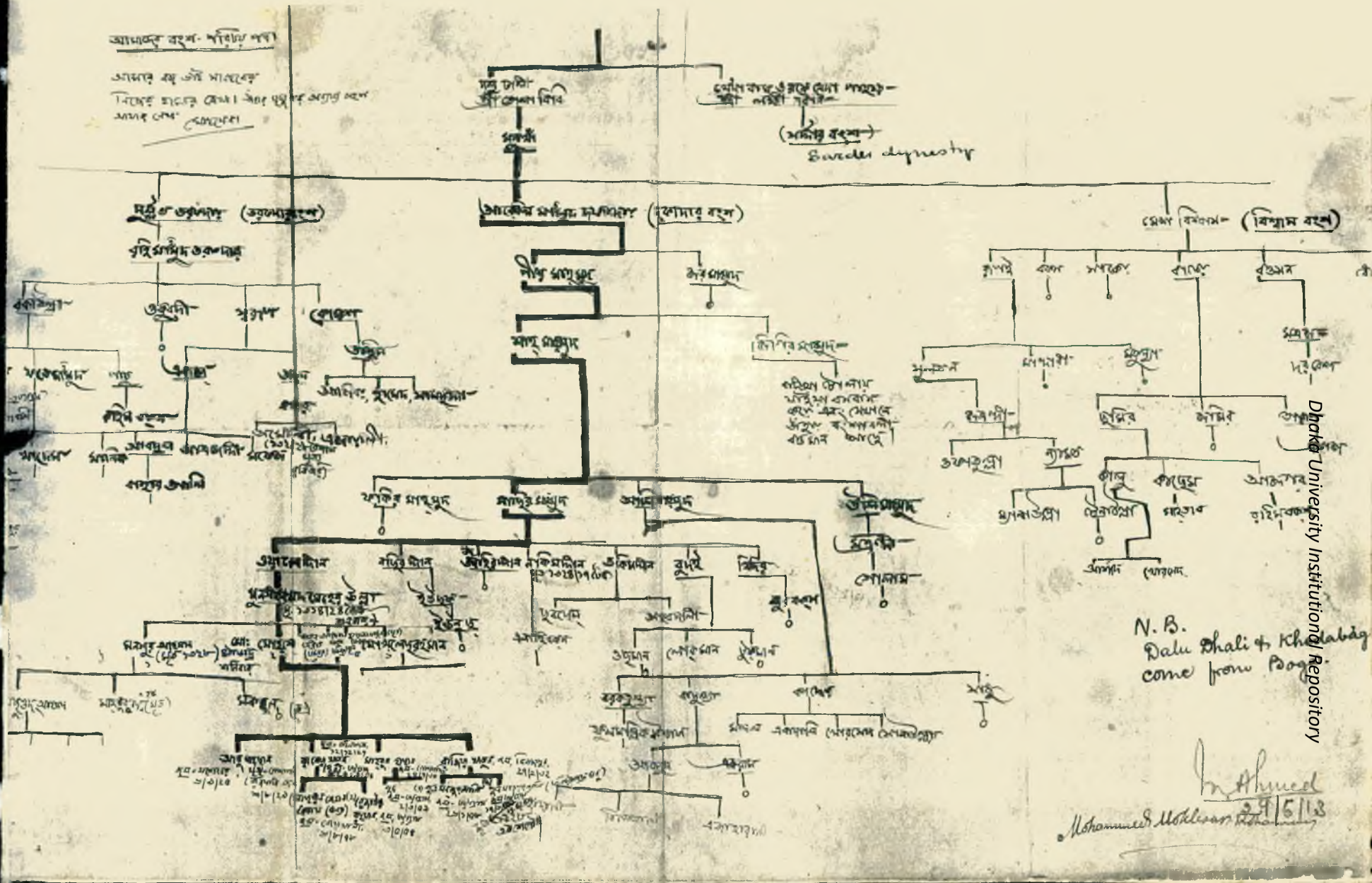

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -১

মুন্সী মেহেরুল্লাহর বংশ তালিকা

Copy of this is sent to Dr. Md. Abul Kasem Shahityaratna (79/1C Machua Bazar Street) for incorporating in my father's life to be written by him.

[illegible]

২৭শে আষাঢ়, রবিবার ১২/৭/৮১
১৩৮৮ সাল

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -২

মেহেরুল্লাহর জীবনপঞ্জী

১৮৬১/১২৬৮	ঃ মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর (১২৬৮ বাংলা, ১০ ই পৌষ) যশোর জেলার ঘোপ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।
১৮৬৬/১২৭৩	ঃ স্থানীয় পাঠশালায় ভর্তির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু।
১৮৬৮/১২৭৫	ঃ মুন্সীর পিতা ওয়ারেস উদ্দিনের মৃত্যু ।
১৮৭৫/১২৮২	ঃ শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ।
১৮৭৫-৭৮/১২৮২-৮৫	ঃ কয়ালখালীতে অবস্থান এবং মৌলভী মোসহাব উদ্দিনের নিকট কোরআন, হাদিসসহ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা লাভ।
১৮৭৮-৮১/১২৮৫-৮৮	ঃ করচিয়া গমন এবং মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাইলের গৃহে অবস্থান করে তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ।
১৮৮০/১২৮৭	ঃ চান্দুটিয়ার মুন্‌শী আজিমুদ্দিনের কন্যার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন।
১৮৮১/১২৮৮	ঃ যশোর ডিস্ট্রিক বোর্ডে চাকুরীতে যোগদান।
১৮৮২/১২৮৯	ঃ চাকুরিতে ইস্তফা দান এবং স্বাধীন দর্জি পেশায় আত্মনিয়োগ।
১৮৮৬/১২৯৩	ঃ মুন্‌শীর প্রথম পুস্তক'খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের অসারতা' প্রকাশ।
১৮৮৯/১২৯৬	ঃ 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা' সংগঠন প্রতিষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯১/১২৯৮ ঃ বরিশালের পিরোজপুরে পাদ্রী স্পার্জন, পাদ্রী ঈশান চন্দ্র মন্ডল ও পাদ্রী হাসান আলীর সাথে বাহাস বা তর্কযুদ্ধ এবং এতে মুন্‌শীর জয় লাভ।

১৮৯২/১২৯৯ ঃ পাদ্রী রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীনের সাথে কলম-যুদ্ধ। 'খ্রীস্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত পাদ্রীর 'আসল কোরাণ কোথায়?' শিরোনামের প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় 'সুধাকর' পত্রিকায় মুন্‌শীর 'ঈসায়ী বা খ্রীষ্টীনী ধোঁকা ভঞ্জন' ও 'সর্বত্রই আসল কোরাণ' শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৮৯৫/১৩০২ ঃ'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম' গ্রন্থ প্রকাশ
'মেহেরুল এছলাম' গ্রন্থ রচনা
দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ মোহসেনের জন্ম গ্রহণ।

১৮৯৬/১৩০৪ ঃ 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৮৯৭/১৩০৪ ঃ 'মেহেরুল এছলাম' ও 'বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' গ্রন্থ প্রকাশ।
কুষ্টিয়া পান্টিতে অনুষ্ঠিত ধর্ম সভায় শেখ জমিরুদ্দিনের সাথে প্রথম সাক্ষাত, পাদ্রী মনরোর সাথে বাহাসের উদ্দেশ্যে জমিরুদ্দীনসহ রানাঘাট গমন এবং একটি ধর্ম সভায় বক্তৃতাদান।
ঃ কন্যা খাতুনের জন্ম, ২৫ শে ডিসেম্বর

১৮৯৮/১৩০৫ ঃ জমিরুদ্দীনসহ নোয়াখালী গমন এবং বেশ কয়েকটি ধর্ম সভায় বক্তৃতা প্রদান।
'জওয়াবোন্নাছারা' পুস্তিকা প্রকাশ।

১৮৯৯/১৩০৬ ঃ বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য বিষয়িনী মুসলিম সমিতি গঠন। মেহেরুল্লাহ এ সমিতির অন্যতম উদ্যোক্তা সংগঠক ছিলেন।

যশোরের কেশবপুরে হানাফী ও মোহাম্মদীদের মধ্যকার বাহাসে যোগদান এবং বিরোধ মিমাংসা।

Dhaka University Institutional Repository

পাবনার বড়ই তলা সভায় ইসমাইল হোসেন সিরাজির সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়।

খুলনার পয়গ্রাম-কসবা ও দৌলতপুরে বিভিন্ন ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা প্রদান।

১৯০০/১৩০৭ ঃ মুন্সীর নিজ ব্যয়ে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ।
কবি শেখ ফজলল করিমের সাথে প্রথম সাক্ষাত ও পরিচয়।

১৯০১/১৩০৮ ঃ মনোহরপুরে মাদ্রাসা-ই-কারামতিয়া প্রতিষ্ঠা।
'নূরুল ইসলাম' নামক প্রতিবেদন পুঞ্জিকা প্রকাশ।
বগুড়া টমসন হলে বক্তৃতা
পাবনা টাউন হলে বক্তৃতা
মুন্শী অন্যতম জীবনীকার শেখ হবিবর সাথে সাক্ষাত, তাঁকে 'শিশু কবি' উপাধি দান।

১৯০৩/১৩১০ ঃ রাজশাহীর বোয়ালমারীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ।
কনিষ্টপুত্র মোহাম্মদ মুখলেসুর রহমানের জন্ম।

১৯০৫/১৩১২ ঃ কুমিল্লার পশ্চিম গাঁও এ অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে অংশ গ্রহণ।
আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন ধর্ম সভায় বক্তৃতাদান।

১৯০৬/১৩১৩ ঃ ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান। উল্লেখা যে, এ সম্মেলনের শেষে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাব অনুযায়ী 'সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ' নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৭/১৩১৪ ঃ ২৪ ও ২৫ শে বৈশাখ রংপুরের দরাজগঞ্জ সভায় যোগদান। এখানেই তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। পরে তাঁর নিউমনিয়া হলে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন।

২১ শে জ্যৈষ্ঠ শেখ জমিরুদ্দীন মুন্‌শীকে দেখতে তাঁর নিজ বাড়ীতে আসেন।

২৪ শে জ্যৈষ্ঠ বেলা দ্বিপ্রহরে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে মুন্‌শী ইন্তেকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -৩

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র হস্তাক্ষরের নমুনা ও আলোকচিত্রে তাঁর স্মৃতি

মুন্সীর হস্তাক্ষরের নমুনা

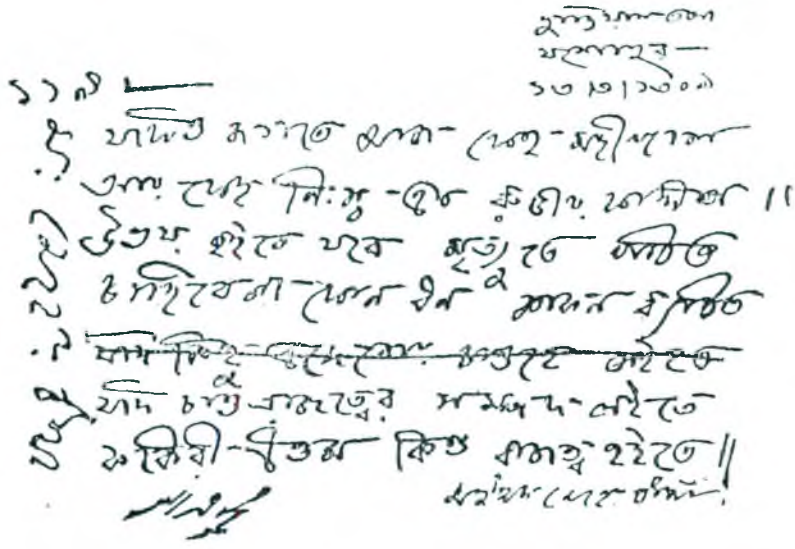

সূত্র: কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ

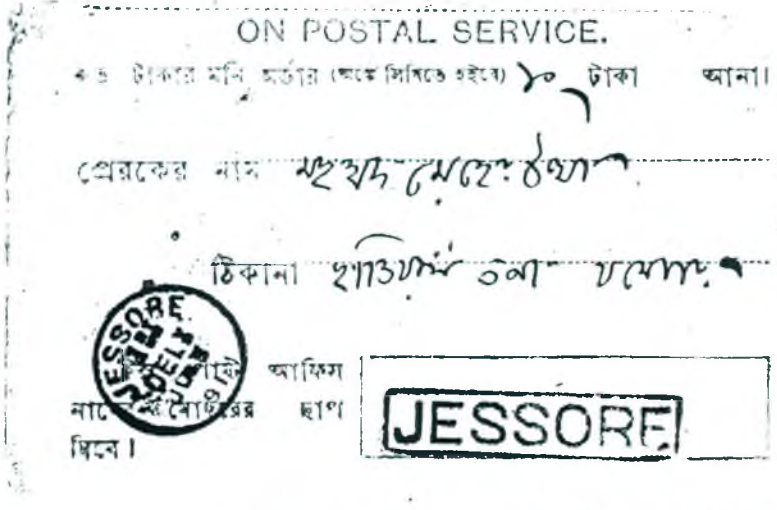

সূত্র: পনচাতের পথ (পাণ্ডুলিপি)

Dhaka University Institutional Repository

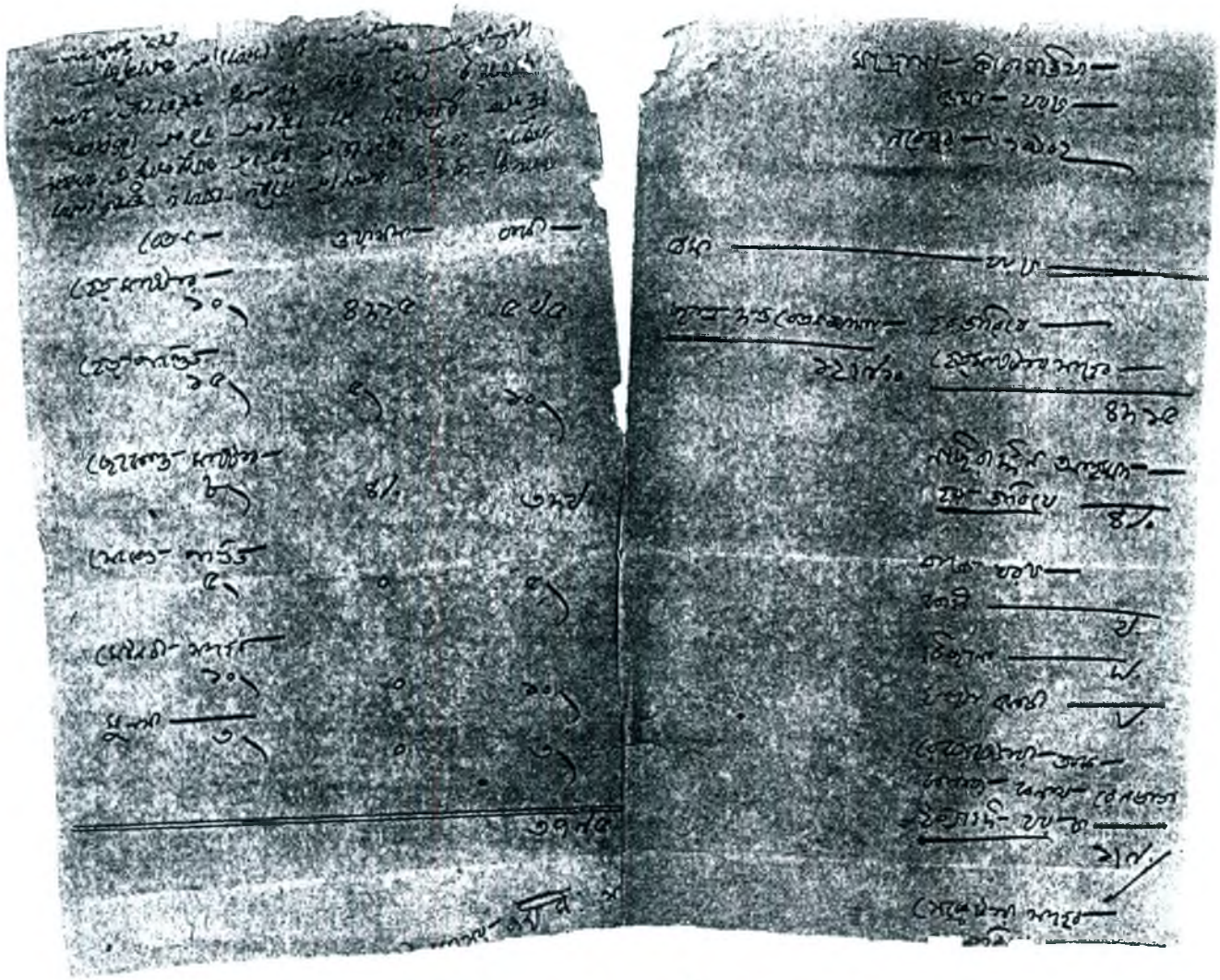

মুন্সীর স্বহস্তে লিখা মাদ্রাসা-ই কারামতিয়ার ·

আয়-ব্যয়ের হিসাব

সূত্র: পশ্চাতের পত্র

Dhaka University Institutional Repository

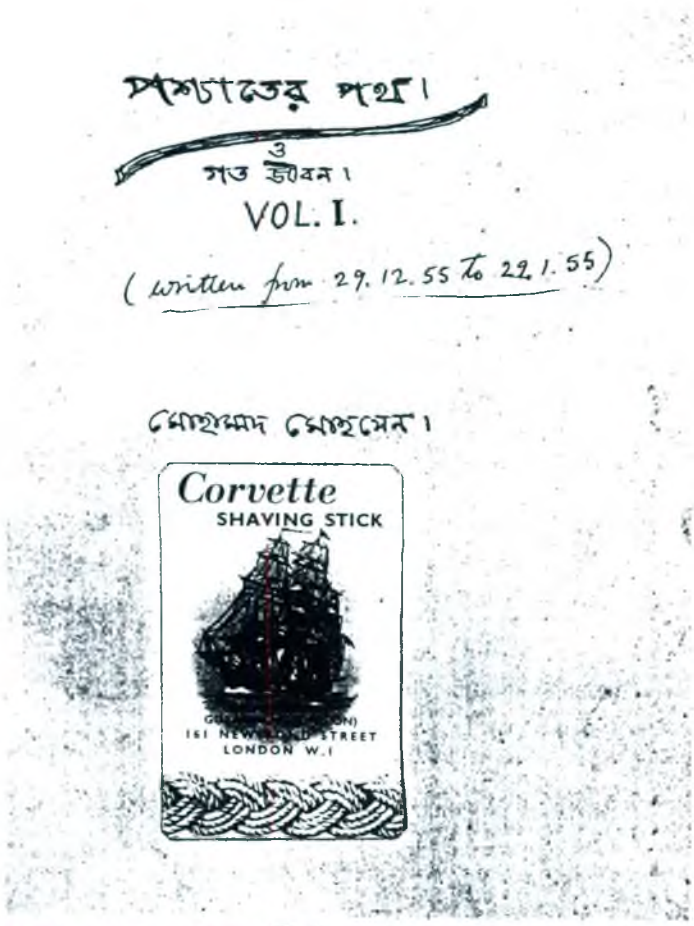

পশ্চাতের পথ পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদ পত্র

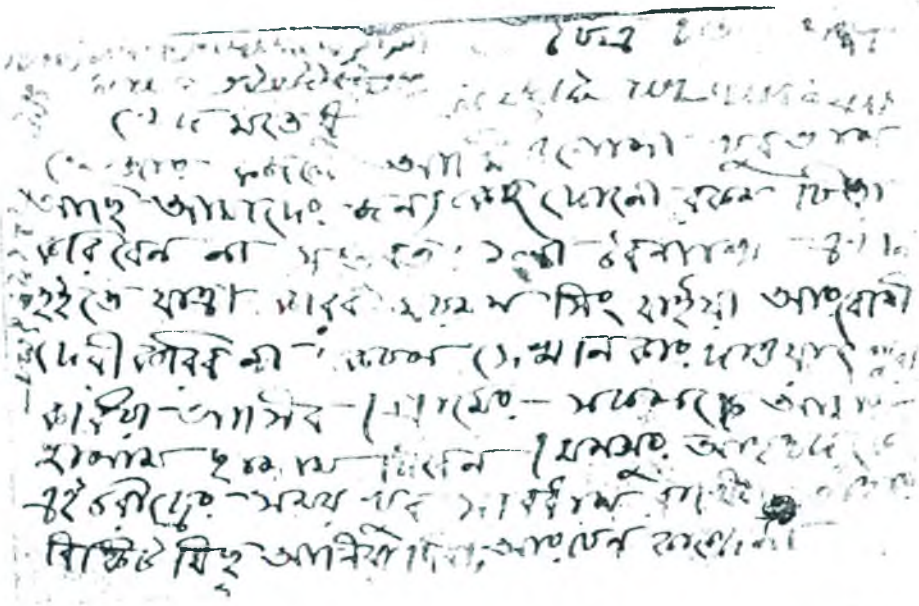

ছাতিয়ান তলার জনৈক আফাজ উদ্দিন বিশ্বাস কে লিখা খুসীর চিঠি —— সূত্র: পশ্চাতের পথ

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্রে মেহেরুল্লাহ্‌র স্মৃতি

ছবিতে ডান পাশে বসা কর্মবীর যশোরের চেরাগ মুন্সী মেহেরুল্লাহ।

সূত্র : প্রেক্ষণ, মেহেরুল্লাহ স্মরণসংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী মেহেরুল্লাহর স্ত্রী, সূত্র: পশ্চাতের পথ

মেহেরুল্লাহর স্ত্রী ও কন্যা
সূত্র: পশ্চাতের পথ

আবু এহছান
মোহাম্মদ মোহসেনের পুত্র
সূত্র: কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

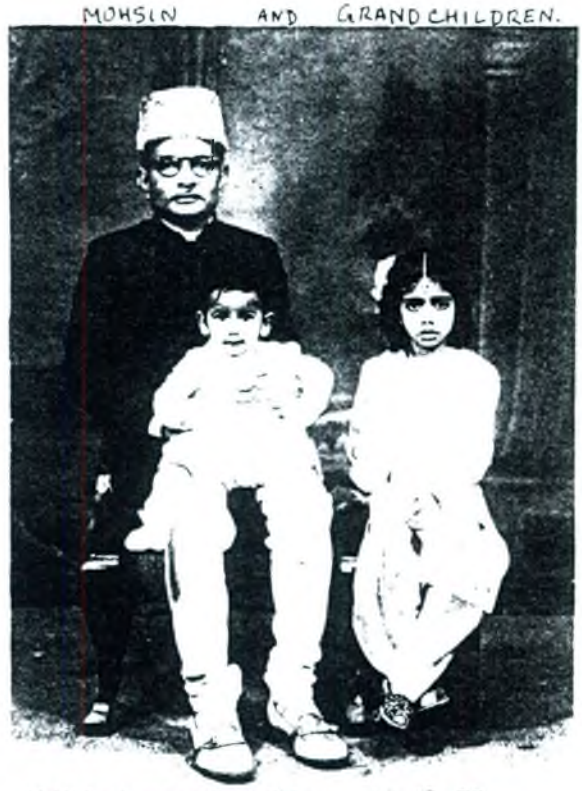

MOHSIN AND GRANDCHILDREN.

MOHSIN WITH GRANDCH... 24.5.55.

সূত্র: পাশ্চাত্যের পথ

মুন্সীর সহচর 'শেখ জমিরুদ্দীন'
সূত্র: কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন
'কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ' গ্রন্থ গ্রন্থকার

Dhaka University Institutional Repository

সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব

ঝাতিয়ানতলায় অবস্থিত মুন্সী মেহেরুল্লাহর এই বাড়ীটির আসল চেহারা এখন আর নেই। সময়ের পরিবর্তনে সংস্কার হয়ে এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে

সূত্র: গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী সাহেবের নিজ গ্রামের উপর দিয়ে চলে যাওয়া খুলনা-বাগেরহাট রেললাইন। মেহেরুল্লাহ নগর রেল স্টেশনটি তাঁর নিজ গ্রামের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

সূত্র: প্রেক্ষন,

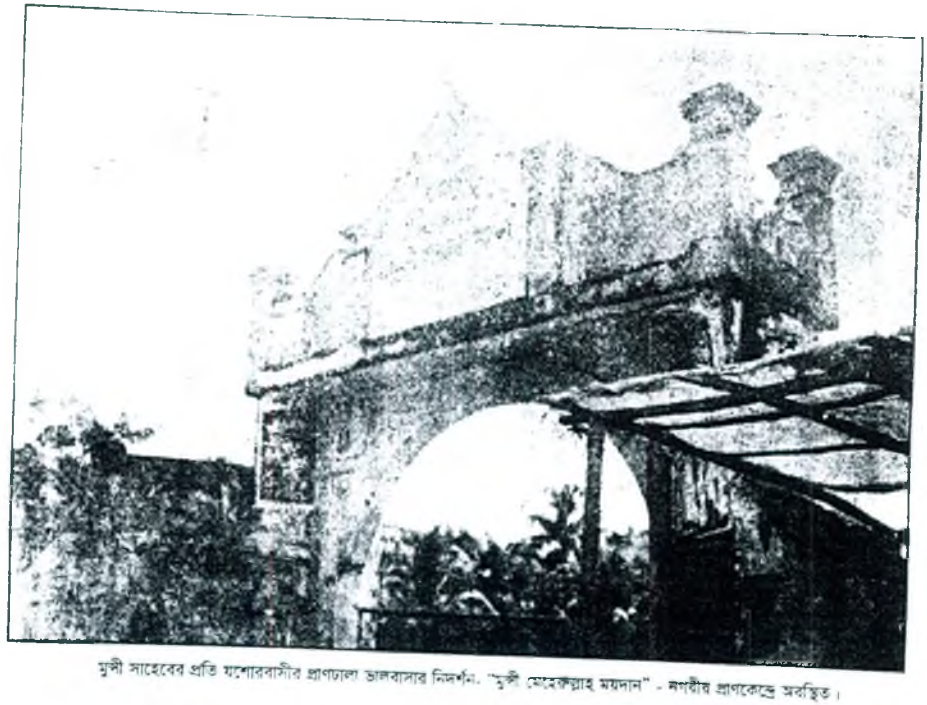

মুন্সী সাহেবের প্রতি যশোরবাসীর প্রাণঢালা ভালবাসার নিদর্শন, "মুন্সী মেহেরুল্লাহ ময়দান" - নগরীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।

সূত্র: প্রেক্ষন

Dhaka University Institutional Repository

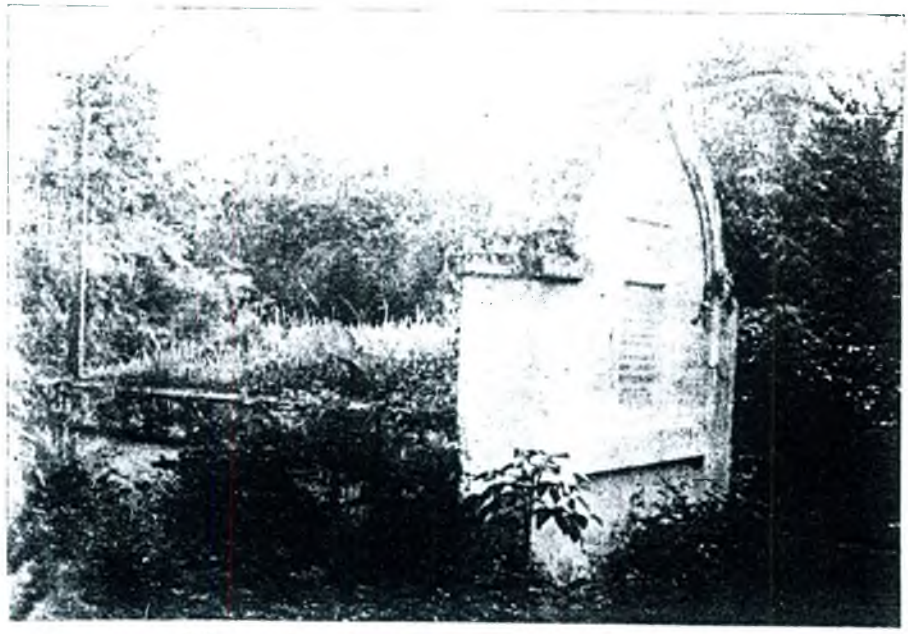

এক সগ্রামী জীবনের সমাপ্তিরেখা ছাতিয়ানতলার এই সমাধিস্থলে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ।

সূত্র : প্রেক্ষণ

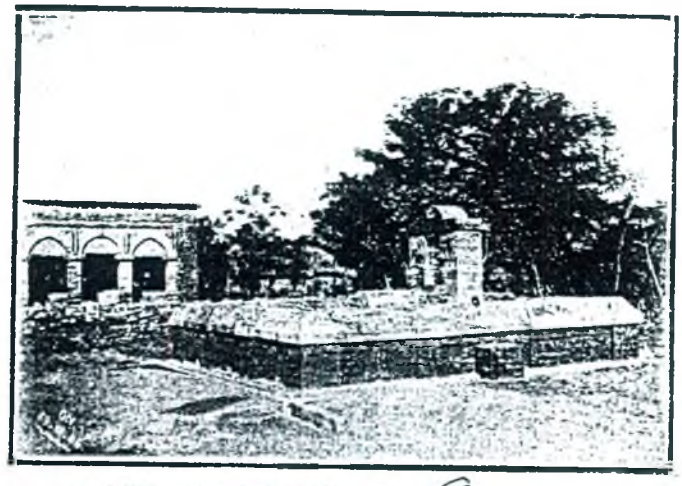

আবু এহছানের সমাধি
সূত্রঃ কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র

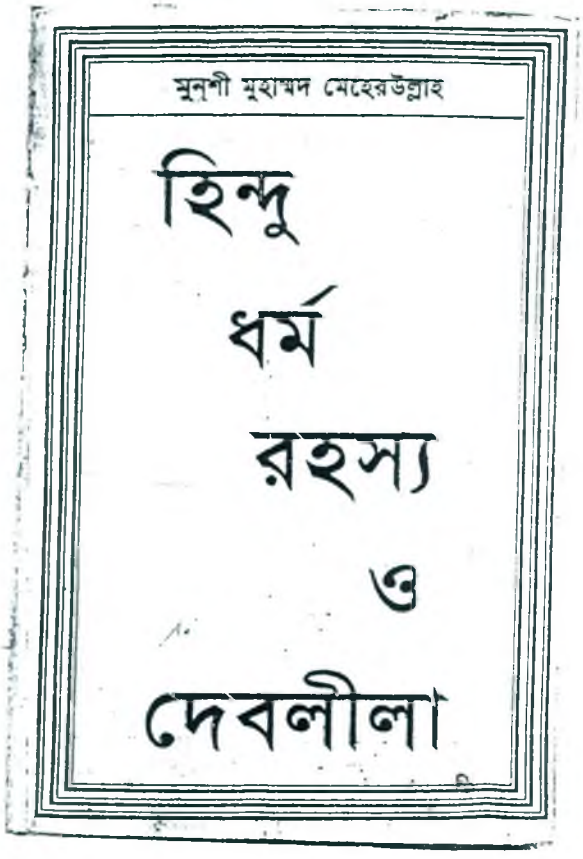

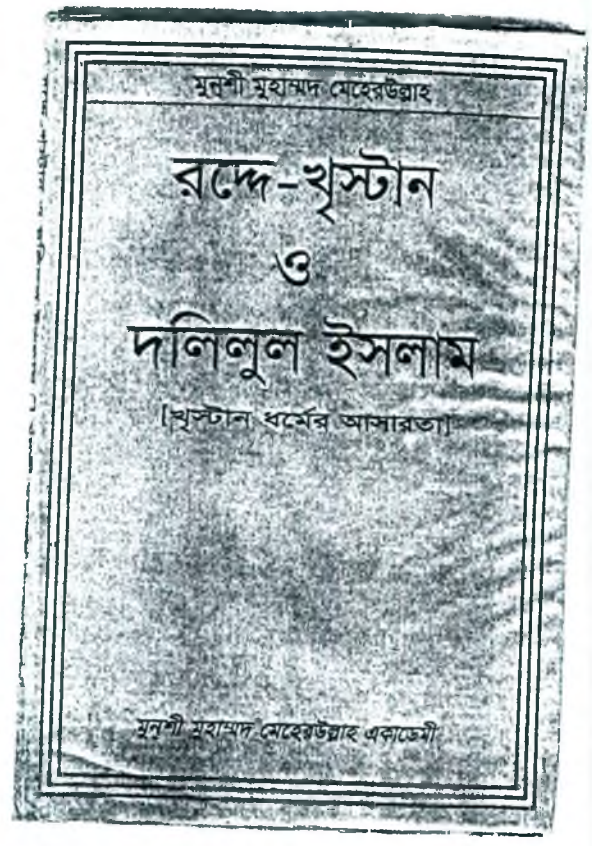

Dhaka University Institutional Repository

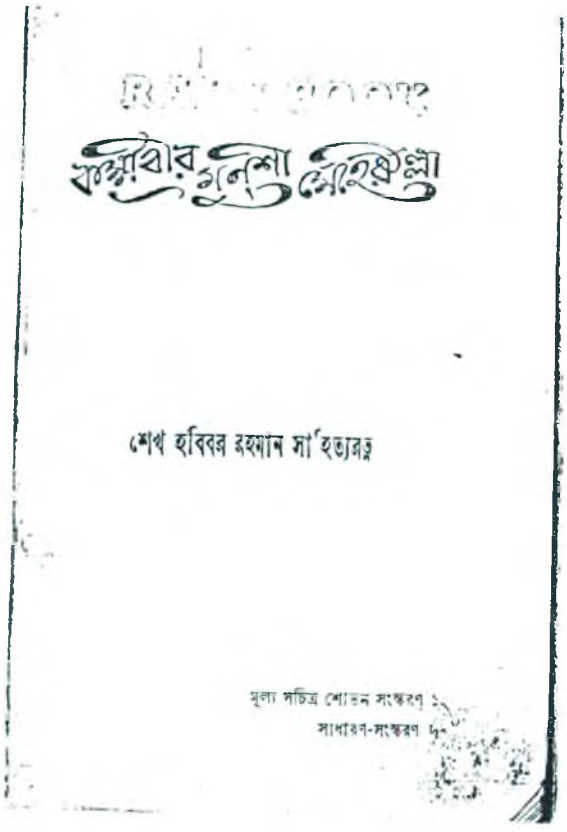

Dhaka University Institutional Repository

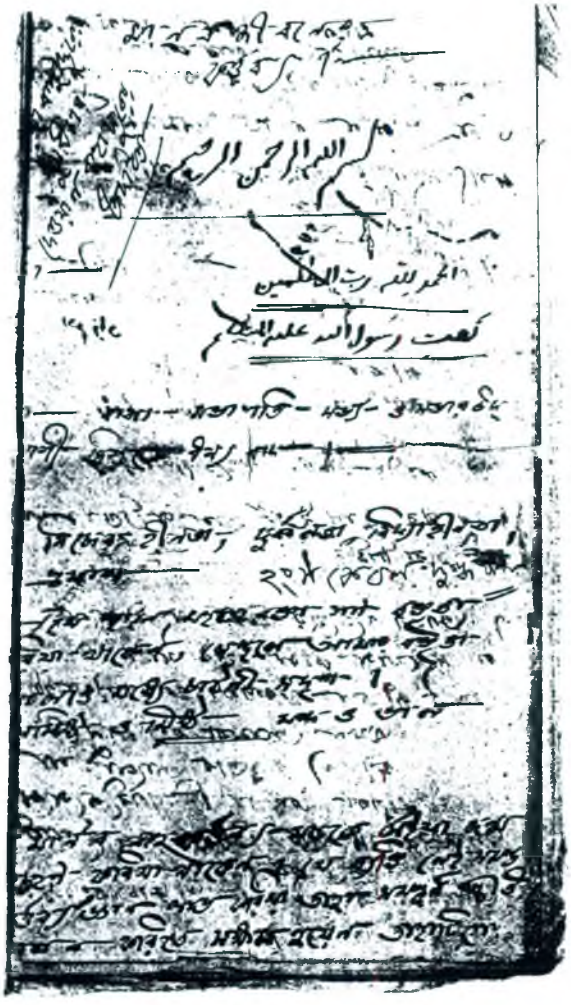

মেহেরুল্লাহর নিজের হাতে লিখা 'মানব জীবনের কর্তব্য' শীর্ষক বক্তৃতার খসড়া
সূত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

"মোহাম্মদী" ২৮।৬।৩৫
তা ১৩ই আষাঢ়, শুক্রবার—১৩৪২

মেহেরুল্লা স্মৃতি-সভা

বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবারে রামানন্দ কাটী যুবক সমিতির উদ্যোগে যশোহর জেলার অন্তর্গত পুলুম আহম্মদপুরে মওলবী সেখ মতিয়র রহমান ছাহেবের সভাপতিত্বে মেহেরুল্লা স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পুলুম, মধুখালী, আড়ুয়া কাটিগ্রাম, ঘোষগাতি, সোনাকুড় সাবেক খাটর, রামানন্দকাটি ইত্যাদি গ্রাম সমূহের বহু ভদ্রলোক এবং স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মুন্সী মোজাফফর হোছেন ছাহেব এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। আছরের নমাজের পর কোরআন শরীফ পাঠান্তে সভার কাজ আরম্ভ হয়। স্থানীয় ছাত্রগণ সময়োপযোগী অনেকগুলি কবিতা পাঠ করিয়াছিল। মওলবী সেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, মওলবী সেখ ফজলর রহমান পণ্ডিত ছাহেব, ডাক্তার খোন্দকার তোজম্মল হোছেন ছাহেব, যুবক সমিতির অন্যতম কর্ম্মী মোহাম্মদ মোহ্ছিন ছাহেব এবং সভাপতি ছাহেব এই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় মিলাদ শরীফ পাঠ ও মরহুমের রুহ পাকের উপর ছওয়াব রেছানীর পর সভাভঙ্গ হয়।

ঐ দিন ঘোষগাতি মছজেদে জুমার নমাজ অন্তে উক্ত মছজেদের এমাম মওলবী সেখ ফজলর রহমান ছাহেব মোহাম্মদ মেহেরুল্লা মরহুমের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। সমবেত মুছল্লীগণ ফাতেহা পড়িয়া মরহুমের রুহ পাকের উপর ছওয়াব রেছানী করিয়াছিলেন।

—খোন্দকার কেরামত আলি, বেহইল যশোহর।

সূত্র: ঢা. বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

Dhaka University Institutional Repository

মেহের-লাইব্রেরী-র বিজ্ঞাপন
সূত্র: ঢাকা বিশ্ব: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

মেহের-লাইব্রেরী।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সংকলিত গ্রন্থাবলী।
(ডাকমাশুল সহ মূল্য লিখিত হইল)

১। বিধবা গঞ্জনা ।৶০; ২। হিন্দুধর্ম-রহস্য বা দেবলীলা (১ম ও ২য় খণ্ড) ।১০; ৩। মেহেরুল ইস্লাম ৶১০; ৪। পন্দেনামার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ (বর্দ্ধিত আকারে ২য় সংস্করণ) ।১০; ৫। মুসলমান-খৃষ্টানের তর্কযুদ্ধ /১০; ৬। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা /১০; ৭। সাহেব মুসলমান /০; ৮। রদ্দে-খৃষ্টান ও দলিলোল এস্লাম (যন্ত্রস্থ); ৯। শ্লোক মালা (যন্ত্রস্থ)।

অন্যান্য পুস্তক।

অগ্নি কুক্কুট ।১০; পরিত্রাণ কাব্য ।৶০; [illegible] ৶০; মানসিংহ ৶০; [illegible] ও ইউনান ৸০; আবির খানের খরকষা /০; জোবেদা খাতুনের রোজ নামচা /০; হক নছিহত /০; উপদেশ রত্নাবলী /০; ইস্লামী বক্তৃতা ৶১০; ইস্লামের সভ্যতা ৶১০; হজরত ইসা কে? ৶০; উচ্চ শিক্ষক ।৶০; আরবী পড়া শিক্ষা ৶০; হজরত আমির হামজার ধর্ম-জীবন লাভ ৶১০; হজরত ওমরের ধর্ম-জীবন লাভ ৶১০; খাজা মইনুদ্দীন চিশ্তীর জীবনী ।/০; হারুনিট বা উদাসীন /১০; বিলাতী মুসলমান /০; ধর্ম্ম গ্রহণ ৶১০; ইস্লাম গ্রহণ /১০; স্বর্গে ইউনাহ ৶১০; কুমন শীরের বার ৶০; সরল নামাজ /১৫; তবলিগল এস্লাম ৶০; [illegible] আদম ৶০; তফ্সিল মোকদ্দেমিন ।/৫; মোহাম্মদীয় ধর্ম-সোপান নবাব খণ্ড ।১০; ঐ রোজা ও হজ্জ খণ্ড ।৶১০; ঐ জাকাত খণ্ড ।৶১০; রেসালে এলাহি /১০; তহজান //১০; হজরত এমাম হাসান মোহাম্মদের আল্কোরানী ৶১০; ইস্লাম প্রদীপ ।/০; পারসী [illegible] ।১০; [illegible] ৸/০; বঙ্গ বীরাঙ্গনা কাব্য //০ আনা।

ডাকমাশুল সহ মূল্য লিখিত হইল। ভিঃ পিঃ ডাকে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত /০ আনা ও ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত ৶০ আনা বেশী খরচ লাগিবে। ৫৲ টাকা অপেক্ষা বেশী টাকার পুস্তকের অর্ডার দিলে অন্যূন ১৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

মোহাম্মদ মোহসেন—ম্যানেজার।
পোঃ চুড়ামনকাটি—(যশোহর)।

পুস্তকের "ইস্তাহার"।
মাশুল সহ মূল্য।

১। খোদা-প্রাপ্তি-তত্ত্ব ...
২। সৌভাগ্য-স্পর্শমণি ৪ খণ্ড ...
৩। পাপত্রাণ-কাব্য ... ।৶০
৪। খাজা-মইনুদ্দীন চিশ্তি সাহেবের জীবনী ।/০
৫। বিধবা-গঞ্জনা ... ।৶০
৬। হিন্দু-ধর্ম্ম রহস্য ... ৶১০
৭। অগ্নি-কুক্কুট ... ।১০
৮। মেহেরুল ইস্লাম ... ৶১০
৯। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা /১০
১০। ধর্ম্ম-গ্রহণ ... ৶০
১১। অনল প্রবাহ /১০
১২। উপদেশ সংগ্রহ ।৶১০
১৩। খ্রীষ্টয়ানি ধোকা ভঞ্জন /১০
১৪। ইসলাম গ্রহণ ... /০
১৫। হজরত ইসা কে? ... ৶০
১৬। বক্তৃতা ও মন্তব্য ... /০
১৭। বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা ৶১০
১৮। গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ ... ১।/০
ভিঃ পিঃতে /০ আনা বেশী।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—
মোহাম্মদপুর মেহের ডিপো,
পোঃ ডাঙ্গিয়ানতলা, পোঃ চুড়া-
মনকাটি, জেলা যশোহর।

ইস্লামিয়া
পোস্টকার্ড।
১০০ শত ।৶০।

মুন্সীর নিজের প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপনের চিত্র
সূত্র: ঢা. বি. কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

পরিশিষ্ট -৪

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থাবলী

১. অধর চন্দ্র তরফদার ঃ নদীয়া খৃষ্ট-মন্ডলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভাগলপুর, ১৯৩৩।

২. আছির উদ্দিন প্রধান ঃ মেহেরউল্লার-জীবনী, জলপাইগুড়ি, ১৯০৯।

৩. আজহার ইসলাম ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রসঙ্গ (আধুনিক যুগ), আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৮।

৪. আনিসুজ্জামান ঃ ক) মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯।
খ) মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ৩য় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩।

৫. আবদুল কাদির (সম্পাঃ) ঃ শিরাজী রচনাবলী, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৭।

৬. আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পাঃ) ঃ যশোর জেলার ইতিহাস, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯০।

৭. আবু জাফর (সম্পাঃ) ঃ মাওলানা আকরম খাঁ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬।

৮. আবদুল মওদুদ ঃ ওয়াহবী আন্দোলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৫।

৯. আবদুর রাজ্জাক ঃ মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জী(১৪০০-১৯৮৫), মতিহার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮।

১০. আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঃ দৃষ্টিকোন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৩৭৪।

১১. আবুল হাসান চৌধুরী ঃ মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা, খন্ড-২৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০।

১২. আলী আহমদ ঃ বাংলার মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. ওয়াকিল আহমদ ঃ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম-২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

১৪. ওয়াহিদুল আলম ঃ বাঙালা জীবনী কোষ, আলমবাগ প্রকাশনী, চট্রগ্রাম, ১৯৮৬।

১৫. কাজী দীন মুহাম্মদ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (৩য় খন্ড), স্টুডেন্ট ওয়েজ ঢাকা, ১৯৬৮।

১৬. খোন্দকার সিরাজুল হক ঃ মুসলিম সাহিত্য, সমাজঃ সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

১৭. নাসির হেলাল ঃ ক) মুন্সী মহম্মদ মেহেরউলাঃ জীবন ও কর্ম, ঢাকা, ২০০১।
খ) মুন্সী মেহের উল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৯৯।
গ) মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা, সুহৃদ প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯।
ঘ) যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার, সীমান্ত প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২।

১৮. ফজলে রাব্বি (প্রকাশক) ঃ শেখ হবিবর রহমান গ্রন্থাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০।

১৯. মাহবুবুল আলম ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান ব্রাদার্স, ঢাকা, নবম সংস্করণ, ১৯৯৮।

২০. মির্জা ইউসুফ আলী ঃ দুগ্ধ সরোবর, ৩য় সংস্করণ, রাজশাহী।

২১. মোজাম্মেল হক ঃ বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭), বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৭৬।

২২. মোতাহার হোসেন সুফী ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পুঁথিঘর, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮।

২৩. মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মুছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৫।

২৪. মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাঃ) ঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৮

২৫. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ ঃ শেখ হবিবর রহমান, জীবনী গ্রন্থমালা-৩৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০।

২৬. মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী ঃ মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ, ঢাকা, ১৩৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. মুন্‌শী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন ঃ ক)মেহের চরিত, কলিকাতা, ১৩১৫।
খ)মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী, (ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্‌যাম সম্পাদিত) হা-মীম পাবলিকেশনস্, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮।
গ)আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, নতুন সংস্করণ, রাজশাহী, ১৯৬৭।

২৮. মুন্‌শী মনিরুদ্দীন আহমদ ঃ আখলাকে জমিরিয়া ও রদ্দে নাছারা, কলিকাতা, ১৩০৮।

২৯. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ঃ ক)খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা, ৩য় সংস্করণ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৮।
খ) রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল এসলাম, ২য় সংস্করণ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৬
গ) হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, ৭ম সংস্করণ, ছাতিয়ানতলা, যশোর, ১৩১৫।
ঘ) মেহেরুল এছলাম, ৫ম সংস্করণ, ছাতিয়ান -তলা, যশোর, ১৩১৭।
ঙ) বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার, পূনঃ মুদ্রন মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ রিচার্স একাডেমী, মাতুয়াইল, ঢাকা, ১৯৯৮।
চ) জওয়াবোন্নাছারা, দ্বিতীয় সংস্করণ,গাঁড়াডোব, নদীয়া, ১৯০৮।
ছ) পান্দেনামা, (মূল শেখ শাদী (রহঃ)),দ্বিতীয় সংস্করণ, ছাতিয়ানতলা, যশোর, ১৯০৮।
জ) সাহেব মুসলমান (সংকলিত) ।প্রকাশকাল ১৯০৮, প্রকাশক ও প্রকাশণীর স্থান অজ্ঞাত।
ঝ) খৃষ্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ,দ্বিতীয় সংস্করণ, ছাতিয়ানতলা, যশোর, ১৯০৮।

৩০. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ঃ মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

৩১. মুহম্মদ আবু তালিব ঃ ক) মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহঃ দেশ কাল সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩।
খ)উপেক্ষিত সাহিত্য সাধকঃ সাতজন, খুলনা, ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

গ) রেভারেন্ড জন জমির উদ্দীনের ইসলাম গ্রহণ (সম্পাদিত), ইসলামী মজলিশ, রাজশাহী, ১৯৬৭।

৩২. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান (সম্পাঃ) ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (আধুনিক যুগ) ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৩।

৩৩. মুহম্মদ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৬৮।

৩৪. মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী ঃ মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৩।

৩৫. মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন আহমদ ঃ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্য সাধনা, ঢাকা, ১৩৭১।

৩৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড (আধুনিক যুগ), কলিকাতা, ১৯৭৪।

৩৭. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ কর্ম্মবীর মুন্শী মেহেরুল্লাহ্, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৯৩৪।

৩৮. সিরাজুল ইসলাম ঐ (সম্পাঃ) ঃক) বাংলার ইতিহাসঃ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।
খ)বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ১ম ও ৩য় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলা সংস্করণ, ১৯৯৩।

৩৯. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত) ঃ বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬।

ইংরেজী গ্রন্থাবলী

১. A.R.Mallick : The British Policy and the Muslims of Bengal, Dacca, 1966.

2. B.D.Basu : History of Education in India. Under the East India Company, Second edition. Calcutta. 1935.

Dhaka University Institutional Repository

3. E.Carey : A Missionary in India. A memoir by Mrs. E. Carey. London. 1855.

4. James Wise : Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London, 1884.

5. J.N. Farquhar : Modern Religious Movements in India, New Delhi, 1977.

6. J.W.Kaye : Christianity in India. London, 1859.

7. M.A.Rahim : a) The Muslim Society and politics in Bengal, 1754-1947.The University of Dacca, Dacca. 1978.
b)Social and cultural History of Bengal, vol.II, (1516-1757), Karachi, 1967.

8. Muhammad Mohar Ali : The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities 1833-1857, The Mehrub publication, Chittagong, 1965.

9. Muin-Ud-din Ahmad khan : a) History of the Faraidi Movement, Islamic Foundation, Dhaka, 1984.
b) Titu Mir and his Followers. Dhaka, 1980.

10. W.W.Hunter : The Indian Musalmans. Calcutta, Bangladesh Edition, Reprint. 1999.

প্রবন্ধাবলী

১. আতাউল হক ঃ ইসলাম প্রচারক মুন্সী মেহেরুল্লাহ, প্রেক্ষণ,সম্পাঃ খোন্দকার আবদুল মোমেন, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ স্মরণ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৬।

২. আনিসুজ্জামান ঃ মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন, সাহিত্য পত্রিকা,

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাঃ), বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শীত সংখ্যা, ১৩৬৭.

৩.আ.ফ সালাহ উদ্দীন ঃ উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্ম-কান্ড, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, ১ম খন্ড, সম্পাঃ সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

৪. কাজী দীন মুহাম্মদ ঃ মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ ও তৎকালীন সমাজ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ মার্চ, ২০০১.
ঃ মুন্সী মেহেরুল্লাহ্, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

৫. জুলফিকার আলী কিসমতি ঃ মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র অবদান, দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ ডিসেম্বর, ২০০১।

৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

৭. নাসরীন মুস্তাফা ঃ জাতির ধ্রুব নক্ষত্র, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

৮. নাসির হেলাল ঃ মুন্‌সী মেহেরউল্লাহ এবং বৈরী স্রোত, দৈনিক ইনকিলাব, জানুয়ারী, ১৯৯৮।
ঃ মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লাহ, দৈনিক সংগ্রাম, ৫ ও ১২ মে, ২০০১।
ঃ মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি, মানব জীবনের কর্তব্য, দৈনিক সংগ্রাম, ডিসেম্বর, ১৯৮৯।

৯. ডি.এফ.আহমদ ঃ মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ এক অবিস্মৃত মনীষী, দৈনিক সংগ্রাম, ২০ জুন, ১৯৯৭।

১০. মতিউর রহমান মল্লিক ঃ বঙ্গবন্ধু মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

১১. মোশাররফ হোসেন খান ঃ প্রদীপ্ত এক সূর্য, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

১২. মোহাম্মদ আবদুল মতিন ঃ ইসলাম প্রচারক ও শিক্ষানুরাগী সেই মানুষটি, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

১৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ঃ খ্রিষ্টান মিশনারী তৎপরতা, মুন্সী মেহেরুল্লাহ ও

আজকের প্রেক্ষিত, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

১৪. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ঃ শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে মনীষী মেহেরুল্লাহ, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

১৫. মোহাম্মদ শাহ ঃ বাঙালী জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, ঢাকা, ১৯৯৩।

১৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ঃ মুনশী জমিরুদ্দীন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৬।
ঃ মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দীনের সাহিত্য সাধনা, প্রেক্ষণ,পূর্বোক্ত
ঃ ইসলাম প্রচারক, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, গ্রীস্ম, ১৩৭৬.

১৭. শেখ জমিরুদ্দীন ঃ আসল কোরাণ কোথায় ? খ্রীষ্টীয় বান্ধব, জুন,১৮৯২।

১৮. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, ঃ ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন, সুধাকর, ২০ শে, ২৭ শে চৈত্র, ১২৯৯ এবং ২রা বৈশাখ, ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০।
সর্ব্বত্রই আসল কোরাণ, সুধাকর।

১৯. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান ঃ ক) মুসলিম ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ৩য় খন্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ), ঢাকা, ১৯৯৩।
খ)ফরায়েযী ও ওয়াহাবী আন্দোলন, বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাঃ), ঢাকা, ১৯৮৬।

২০. মুহম্মদ আবু তালিব ঃ বাংলার নবজাগরণ ও ইসলাম প্রচারক, মুন্সী সাহেব, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।
ঃ গোলাম হোসেনকৃত আত্মজীবনী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৮৮/১৯৮১।

২১. মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী ঃ হিন্দু-বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে যশোর এবং প্রসঙ্গত "বিধবা গঞ্জনা", প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

২২. শাহেদ আলী ঃ সুবহে সাদেকের মুয়াজ্জিন, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

২৩. সৈয়দ আলী আহসান ঃ সে সময়কার পরিপ্রেক্ষিত, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. হাসান আবদুল কাইয়ুম ঃ যশোরে ইসলাম প্রচার, যশোর জেলার ইতিহাস, আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৯০.
ঃ হাদিয়ে কওম মুন্সী মেহেরুল্লাহ্, প্রেক্ষণ, পূর্বোক্ত।

২৫. হাসান শরীফ ঃ মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ ও তৎকালীন সমাজ, দৈনিক সংগ্রাম, ৫ ও ১২ মে ২০০০।

26. Syed Mumtaz Ali : Munshi Meherullah, The Social reformer, Pakistan Observer, 30th July 1951.

27. Muin-uddin Ahmed Khan: The Islamic Reform Movement in Bengal in Ninetheenth Century: Meaning and Significance, Islam in Bangladesh, Refiuddin Ahmed (ed.), Bangladesh Itihas Samiti, Dhaka, 1983.

পাণ্ডুলিপি

১. মোহাম্মদ মোহসেনঃ ঃ পশ্চাতের পথ' (মুন্সীমেহেরুল্লাহ্‌র দ্বিতীয় পুত্রের রচিত আত্মজীবনী)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত।

২. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ঃ মানব জীবনের কর্তব্য, (মুন্সীর স্বহস্তে লিখিত একটি বক্তৃতার খসড়া)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত।

বিবিধ রচনা

১. কথা মালা'র মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ঃ ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ টেলিভিশনে কবি আবদুল হাই শিকদারের উপস্থাপনায় 'কথা মালা' ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে মুন্শী মেহেরুল্লাহর উপর বিশেষ প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। প্রতিবেদনটি পরে উপস্থাপক লিখিত আকারে প্রেক্ষণ পত্রিকা মেহেরুল্লাহ্ স্মরণ সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

২. মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র কনিষ্ঠ পুত্র মুন্শী মোখলেসুর রহমানের বিশেষ সাক্ষাতকারঃ ১৯৮৮ সালের ২৪ শে মে এ সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেন নাসির হেলাল। গৃহিত সাক্ষাতকারটি 'অন্তরঙ্গ আলোকে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র কনিষ্ঠ পুত্র মুন্সী মোখলেসুর রহমান' শিরোনামে প্রেক্ষণ পত্রিকায় মেহেরুল্লাহ্ স্মরণ সংখ্যায় সংকলন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মেহেরুল্লাহ্ঃ এটি একটি নাটক। জিলহজ আলী রচিত এ নাটকটিও মেহেরুল্লাহ্ স্মরণ সংখ্যা প্রেক্ষণে ছাপা হয়েছে।

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

ক) ঐতিহ্য,সম্পাঃ হাসান আবদুল কাইয়ূম, বাংলা পঞ্চদশ শতাব্দী সূচনা সংখ্যা, ১৪০১, এবং মার্চ-জুন সংখ্যা, ১৯৯৬।

খ) পালকি, সম্পাঃ নাসির হেলাল, বর্ষা সংখ্যা, শ্রাবন, ১৪০৩, এবং শরৎ-হেমন্ত সংখ্যা, ১৪০৩।

গ) অগ্রপথিক, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মুন্শী মেহেরুল্লাহ্র জন্ম-মৃত্য উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন সংখ্যা।

ঘ) 'স্মরণিকা' মুন্শী মেহেরুল্লাহ্র ১১৬ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে যশোহর জেলা প্রশাসনের সহায়তায় রবিবাসরীয় সাহি ত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত।